বেদান্তদর্শন।

অর্থাৎ

পূজ্যপাদ শঙ্করাচার্য্যের শারীরকভাষ্য ও অন্যান্য শাস্ত্রের
অভিপ্রায় অনুযায়ী

পরমারাধ্য মহর্ষি ব্যাসদেবকৃত সুবিখ্যাত
শারীরক সূত্রাখ্য ব্রহ্ম মীমাংসার
তাৎপর্য্য

প্রথম খণ্ড।

১ অধ্যায়ের প্রথম পাদের প্রথমাবধি একাদশ সূত্র

শ্রীচন্দ্রশেখর বসু কর্ত্তৃক ব্যাখ্যাকৃত ও
প্রকাশিত।

কলিকাতা

আদি ব্রাহ্মসমাজ যন্ত্রে

শ্রীকালিদাস চক্রবর্ত্তী দ্বারা মুদ্রিত।

সন ১২৯১ সাল।

VEDANTA PHILOSOPHY

OR

An exposition of the Sáririka Aphorisms of the
very adorable great Rhishi Vyasa Deva
according to the Commentary of
pujyapada Sankaracharya
and agreeably to the import
of several other Sástras.

Part 1.

First to eleventh aphorisms of section 1. Book 1.

Rendered and published

BY

CHANDRA SEKHARA BASU.

ভূমিকা।

বেদশাস্ত্র অতি বিস্তীর্ণ। মানবের ভিন্ন ভিন্ন অধিকার অনুসারে তাহাতে প্রবৃত্তি ও নিবৃত্তি এই দুই প্রকার ধর্ম্ম উপদিষ্ট হইয়াছে। সেই কারণে তাহার অন্তর্গত শ্রুতি সকল দ্বিবিধ। প্রবৃত্তি বিভাগে তাহার শ্রুতি সমূহ ক্রিয়াসাধনোপযোগী বিধি, নিষেধ, মন্ত্র এবং শাখানুযায়ী আচার প্রতিপাদক এবং নিবৃত্তিভাগে তাহার শ্রুতি সমূহ মোক্ষের অভিন্ন স্বরূপ ব্রহ্মপ্রতিপাদক। 'পূর্ব্বমীমাংসা' নামক দর্শনে মহর্ষি জৈমিনি তাহার ক্রিয়াসাধক শ্রুতিবাক্য সমূহের সিদ্ধান্ত করিয়াছেন এবং 'উত্তর মীমাংসা' নামক দর্শনে মহর্ষি ব্যাসদেব তাহার ব্রহ্মপ্রতিপাদক শ্রুতি সমূহের মীমাংসা করিয়াছেন। যদিও ব্রহ্মপ্রতিপাদক শ্রুতি সমূহ বেদের মন্ত্র ও ব্রাহ্মণবর্গে সর্ব্বত্রেই বিক্ষিপ্ত আছে, কিন্তু বেদশিরোভাগস্বরূপ, ব্রহ্মরহস্যপরিপূর্ণ উপনিষৎ শাস্ত্র সমূহই তাহার বিশেষ ভাণ্ডার। নিবৃত্তির অধিকারে ঐ সমস্ত শ্রুতি বৈদিক্ ক্রিয়ার অন্তক অর্থাৎ বিনাশক বিধায় উপনিষৎ শাস্ত্র সাধারণতঃ 'বেদান্ত' নামে কথিত হয়। সেই জন্য ব্যাসোক্ত 'ব্রহ্মমীমাংসা' শাস্ত্রকে 'উপনিষৎ মীমাংসা' ও 'বেদান্ত দর্শন' কহে।

এই বেদান্তদর্শনের চারি অধ্যায়। বেদান্তবাক্যের ব্রহ্মেতে সমন্বয় প্রমাণ করায় প্রথম অধ্যায়ের নাম 'সমন্বয়'। অন্যান্য শাস্ত্রের সহিত সৃষ্টিবিষয়ক বেদান্তবাক্য সকলের বিরোধ পরিহার করায় এবং জীব ও সূক্ষ্মদেহ বিষয়ক শ্রুতিসমূহের পরস্পর বিরোধ ভঞ্জন করায় দ্বিতীয় অধ্যায়ের নাম "অবিরোধ"। বৈরাগ্য, জীবব্রহ্মের ঐক্য, উপাসনা, ও ব্রহ্মজ্ঞানের সাধন উপদিষ্ট হওয়ায় তৃতীয় অধ্যায়ের নাম "সাধন"। এবং জীবন্মুক্তি, মৃত্যুর পর ভিন্ন ভিন্ন উপাসকের শুক্লা কৃষ্ণা প্রভৃতি বিশেষ বিশেষ গতি, সগুণ ব্রহ্মোপাসকের উত্তরমার্গে গতি, নির্গুণ ব্রহ্মজ্ঞানির নির্ব্বাণমুক্তি প্রভৃতি ফলের বিচার থাকায় চতুর্থ অধ্যায়ের নাম "ফলাধ্যায়"।

প্রত্যেক অধ্যায়ে চারি চারিটী পাদ আছে। তাহার যে যে পাদে যে বিষয় বিবৃত হইয়াছে তাহা নিম্নে প্রদর্শিত হইল

প্রথম।

সমন্বয় অধ্যায়।

১ম-পাদ।—স্বরূপতঃ ব্রহ্মবোধক সুস্পষ্ট শ্রুতি সকলের ব্রহ্মেতে সমন্বয়।

দ্বিতীয় ।

অবিরোধ অধ্যায় ।

তৃতীয় ।

সাধন-অধ্যায় ।

চতুর্থ ।

ফলাধ্যায় ।

৪র্থ-পাদ।—মৃত্যুর পর নির্গুণ-ব্রহ্মজ্ঞানির নির্ব্বাণমুক্তি ও সগুণ-ব্রহ্মোপাসকের ব্রহ্মলোকের আনন্দভোগাদি।

বেদান্তদর্শন কেবল ব্রহ্মপ্রতিপাদক শ্রুতিরই মীমাংসা। তাদৃশ শ্রুতিত্যাগ করিয়া তাহাতে কোন বিষয়ের বিচার প্রদত্ত হয় নাই। ফলতঃ ব্রহ্মপ্রতিপাদক শ্রুতিসমূহের মধ্যে এমন অনেক শ্রুতি আছে যাহা ব্রহ্মাশ্রিত নানা পদার্থকে প্রতিপাদন করে যথা কাল, প্রকৃতি, মহত্তত্ত্ব, পঞ্চভূত জীব, সূক্ষ্মদেহ, স্থূলদেহ, বেদ, হিরণ্যগর্ভ, স্বর্গনরকাদি ভোগ, অদৃষ্ট, জন্মান্তর, উপাসনা, ব্রহ্মজ্ঞান, মুক্তি ইত্যাদি। এই সকল পদার্থ বেদের মধ্যে স্বতন্ত্র ও স্বয়ম্ভূরূপে কুত্রাপি কথিত না হওয়ায় এবং তৎসমূহের বর্ণনের আদ্যন্ত মধ্যে ব্রহ্মই তাহাদের মূলাধার ও আশ্রয়রূপে কীর্ত্তিত হওয়ায় সে সমস্ত পদার্থ ব্রহ্মাশ্রিত পদার্থরূপে পরিগণিত হইয়াছে এবং তাহাদের প্রতিপাদক বেদবাক্য সকল ব্রহ্মপ্রতিপাদক শ্রুতি বলিয়াই গৃহীত ও মান্য হইয়াছে।

অতএব এই বেদান্ত দর্শন শাস্ত্র যেমন একদিকে ব্রহ্মপ্রতিপাদক শ্রুতির মীমাংসা অন্যদিকে সেইরূপ ব্রহ্ম জীব প্রকৃতি, সৃষ্টি, প্রলয়, পরলোক, উপাসনা, অদৃষ্ট, ব্রহ্মজ্ঞান ও মোক্ষের দর্শন। সেই সমস্ত তত্ত্ব ইহাতে আদ্যোপান্ত প্রণালী শুদ্ধরূপে বিবৃত হইয়াছে। ইহার সমস্ত উপদেশের সারমর্ম্ম এই যে এই বিশ্বসংসারের মধ্যে সকলই অনিত্য এবং অসার, কেবল এক মাত্র ব্রহ্মই সার। যে ব্রহ্ম স্বয়ম্প্রকাশ প্রেমসূর্য্য বা শান্তিরস-কিরণপুঞ্জ জ্ঞানার্করূপে জীবাত্মার আত্মবুদ্ধি স্বরূপিনী পদ্মিনীকে বিকশিত করেন, যাঁহার জ্ঞান রূপ পরমজ্যোতিঃ হৃদয়ে দর্শন মাত্রে হৃদয়স্থ অপার সংসার বাসনার সহিত কর্ম্মময়ী প্রকৃতিবিরচিত মায়ানিশার সুখ দুঃখ-সঙ্কুল স্বপ্নরাজ্য বিনষ্ট হইয়া যায়, যাঁহাকে লাভ করিলে সুখপূর্ণ স্বর্গভোগ ও যোগৈশ্বর্য্য সম্পন্ন ব্রহ্মলোকে বাস পর্য্যন্ত তুচ্ছ বোধ হয়, সেই পরাৎপর ও সারাৎসার ব্রহ্মকে জীবের হৃদয়ে সাক্ষাৎ দর্শন করিয়া দেওয়া এই শাস্ত্রের উদ্দেশ্য। জীবের স্থূল দেহ অতি অকিঞ্চিৎকর এবং তাহার ভোগ সমূহ অনিত্য। জীবের মনোবুদ্ধি ইন্দ্রিয়াদি যাহা সূক্ষ্ম শরীর শব্দে উক্ত হয় তাহা অতি চঞ্চল, পরিবর্ত্তনশীল এবং মায়া-মোহে জড়ীভূত। জীবের হৃদয়কন্দরস্থ অনাদি বাসনাময়ী প্রকৃতি যাহা জীবের বীজ দেহ বা কারণশরীর নামে উক্ত হয় তাহা জীবের ভববন্ধনের মূলহেতু। জীব স্বয়ং এই ত্রিবিধ শরীররূপী নহেন। তিনি তাহা হইতে স্বতন্ত্র, ব্রহ্মপরতন্ত্র, ব্রহ্মজ্যোতিঃসম্পন্ন রত্নকল্প নির্ম্মল পদার্থ। অজ্ঞানবশতঃ ঐ ত্রিবিধ শরীরকে তিনি আত্মপদে গ্রহণ করেন বলিয়া তাঁহার নাম শারীর। এই শাস্ত্র তাঁহাকে সেই সর্ব্বপ্রকার দেহ ও দেহভাবনা হইতে স্বতন্ত্র পূর্ব্বক তাঁহার শরীরাতীত নির্ম্মল তত্ত্বজ্ঞান প্রদান করিয়াছেন। পরমাত্মজ্ঞানরূপ অঞ্জন-শলাকা দ্বারা তাঁহার হৃদয়-

নেত্র বিকশিত করিয়া ব্রহ্মকে তাঁহার আত্মারূপে দেখাইয়া দিয়াছেন। সেই জন্য ইহার আর এক নাম শারীরক দর্শন। এই দর্শন দেহাদি অনাত্ম পদার্থের প্রতি আত্মবোধ, জগদাদি অনিত্য পদার্থের প্রতি মমত্ব বোধ তিরস্কার পূর্ব্বক একমাত্র ব্রহ্মেতে জীবের আত্মতা ও মমতা সাধনের উপদেশ করিয়াছেন।

এই বর্ত্তমান কালে ঘোরতর বিষয় সেবা ও বিজাতীয় আচার ব্যবহার দিন দিন বৃদ্ধি পাইতেছে কিন্তু আনন্দের বিষয় এই যে তাহারই মধ্যে থাকিয়া তৎসমস্তকে তুচ্ছ পূর্ব্বক অনেক সাধু বঙ্গসন্তান সজাতীয় শাস্ত্র, জ্ঞান ধর্ম্ম ও ভাব রক্ষা করিতেছেন। তাঁহাদের মধ্যে যাঁহারা উপনিষৎ শাস্ত্র অথবা গীতা, পঞ্চদশী, বেদান্তসার প্রভৃতি শাস্ত্র সকল অল্প বিস্তর পাঠ করিয়াছেন; কিম্বা শ্রীমদ্‌ভাগবদাদি পূরাণ নিহিত পারমার্থিক অংশ সমূহ দৃষ্টি করিয়াছেন; তদতিরিক্ত, যে সকল মহাত্মার হৃদয়ে কিয়ৎপরিমাণ ভগবৎপ্রীতি, ব্রহ্মজ্ঞান ও বৈরাগ্য জন্মিয়াছে; ভরসা করি তাঁহারা সকলেই এই বেদান্তদর্শন পাঠে বিশেষ রসানুভব করিতে পারিবেন। এই আশার উপরি নির্ভর করিয়া আমি এই গ্রন্থখানি বঙ্গীয় সাধু সমাজে উপস্থিত করিলাম। ইতি।—

খড়্গপুর—মুঙ্গের
১ চৈত্র ১৮০৬ শকাব্দ।

শ্রীচন্দ্রশেখর বসু।

নির্ঘণ্ট।

প্রথম অধ্যায়।

প্রথমপাদ।

প্রথম অধিকরণ।

প্রথম সূত্র।

ব্রহ্মজিজ্ঞাসা।

দ্বিতীয় অধিকরণ।

দ্বিতীয় সূত্র।

ব্রহ্ম নিরূপণ।

তৃতীয় অধিকরণ।

তৃতীয় সূত্র।

ব্রহ্ম বেদের যোনি ও বেদ প্রতিপাদ্য।

(১)

চতুর্থ অধিকরণ।

চতুর্থ সূত্র।

বেদ বেদান্ত ব্রহ্মপর।

পঞ্চম অধিকরণ।

পঞ্চমাবধি একাদশ সূত্র।

সাংখ্যোক্ত প্রকৃতি জগৎকারণ নহে।

পঞ্চম সূত্র।

ষষ্ঠ সূত্র।

সপ্তম সূত্র।

অষ্টম সূত্র।

নবম সূত্র।

দশম সূত্র।

একাদশ সূত্র।

ইতি গ্রন্থ সমাপ্ত।

ক্রম	সংক্ষেপ মর্ম্ম			পৃষ্ঠা।
	এই খণ্ডের উপসংহার	...	...	১৭০

অতিরিক্ত পত্র।

বেদান্ত দর্শন।

প্রথম অধ্যায়।

প্রথম পাদ।

প্রথম অধিকরণ।

প্রথম সূত্র।

সূত্র। অথাতোব্রহ্মজিজ্ঞাসা। ১।

অর্থ। চিত্তশুদ্ধিই ব্রহ্মজিজ্ঞাসার হেতু। ১।

তাৎপর্য্য

১। চিত্তশুদ্ধি ব্যতীত আর কিছুই ব্রহ্মজিজ্ঞাসায় অপেক্ষিত নহে। বেদের দাসত্ব, প্রাকৃতিক তত্ত্বনির্ণয়, নানা শাস্ত্রের বিচার, দেবতাবিষয়ক সংবাদ, লৌকিক শৌচাচার, শাস্ত্রীয় ফল-শ্রুতি, দৈব ও পিতৃকার্য্য প্রভৃতি কোনরূপ জ্ঞান বা অনুষ্ঠান ব্রহ্মজিজ্ঞাসার অব্যবহিত হেতু নহে। এমত লোক অনেক আছেন যাঁহারা ব্রত পূর্ব্বক বেদাধ্যয়ন এবং শ্রদ্ধা পূর্ব্বক বেদের প্রামাণ্য স্বীকার করেন অথচ তাঁহারা ব্রহ্ম-জিজ্ঞাসু নহেন—প্রাকৃতিক তত্ত্বানুসন্ধানে কৃত-কার্য্য হইয়াছেন অথচ ব্রহ্ম-জিজ্ঞাসায় উপনীত হইতে পারেন নাই—বিধি-নিষেধ-প্রদ স্মৃতি সমূহের ও তর্ক, তত্ত্ব, ধর্ম্ম, ব্রহ্ম-প্রতিপাদক দর্শনরাশির পারদর্শী হইয়াছেন কিন্তু ব্রহ্মজিজ্ঞাসায় মতি জন্মে নাই—দেবগণ-সম্বন্ধে সকল সংবাদ অবগত আছেন,

অহরহ গঙ্গাস্নান, জপ, তর্পণ, ও দান করেন, পিতৃ ও দেবগণের উদ্দেশে হব্য কব্য প্রদান না করিয়া জল-গ্রহণ করেন না অথচ ব্রহ্মজিজ্ঞাসা তাঁহাদের হৃদয়কে স্পর্শও করে নাই। অতএব একমাত্র চিত্তশুদ্ধিই ব্রহ্মজিজ্ঞাসার অব্যবহিত হেতু। ঐ সমস্ত শাস্ত্রাদির আলোচনা ও ধর্ম্ম-ক্রিয়ার আচরণ দ্বারা অপরা বিদ্যা ও ব্রহ্মভিন্ন ফললাভ হইয়া থাকে, কিন্তু ব্রাহ্মী মতির উদয় হয় না। শাস্ত্র-দৃষ্টিতে, সাধুসঙ্গে, অথবা তাদৃশ বিদ্যা ও ধর্ম্মক্রিয়ার অনিত্য ফলসমূহকে ভোগের দ্বারা পরীক্ষা করিয়া যখন তাহাতে বৈরাগ্য উপস্থিত হয়, তখনই চিত্ত বিশুদ্ধাবস্থা লাভ করে। ফলকামনা বা ফলভোগরূপ জঞ্জাল চিত্ত হইতে অপসারিত হইলেই ব্রহ্মভিন্ন বিষয় হইতে তাহা ব্যাবৃত্ত হইয়া ব্রহ্মজিজ্ঞাসায় রত হয়। তাহারই নাম শুদ্ধ চিত্ত। আর বেদাধ্যয়ন ও ধর্ম্মক্রিয়া দ্বারা যে আত্মপ্রসাদ বা চিত্তপ্রসন্নতা অনুভব হয় তাহা ব্রহ্মজিজ্ঞাসার অনুকূল নহে। তাহা কেবল শুভানুষ্ঠানের ফলমাত্র, সেই ফলই ব্রহ্মজিজ্ঞাসার বাধস্বরূপ। ফলে পুনঃ পুনঃ ভোগ বা পরীক্ষা দ্বারা তাহাতে নির্ব্বেদ উপস্থিত হইয়া চিত্তশুদ্ধি হয়। সেই শুদ্ধ চিত্তই অব্যবহিতরূপে ব্রহ্মজিজ্ঞাসার হেতু। বিদ্যা ও ধর্ম্মক্রিয়াকে যে যে স্থলে ব্রহ্মজিজ্ঞাসার কারণ কহিয়াছেন সেই সেই স্থলে তদুভয়ের ফল-সঙ্গ-বিহীনত্ব প্রতিপাদন করিয়াছেন ; কেন না চিত্তশুদ্ধি-সম্পাদনে উহাদের যে হেতুত্ব তাহা জাতাঙ্কুর-বিনষ্ট-বীজবৎ উহাদের অনুষ্ঠান ও ফলের বিনাশেই উৎপন্ন হয়। এতাদৃশ তাৎপর্য্যে ধর্ম্মক্রিয়া প্রভৃতিকে গৌণপরম্পরা ব্রহ্মজিজ্ঞাসার হেতু বলিতে চাহ বল, কিন্তু বেদান্ত-শাস্ত্রের সিদ্ধান্ত এই যে, চিত্ত-শুদ্ধিই সেই শুভ-জিজ্ঞাসার একমাত্র অব্যবহিত কারণ।

২। গার্গীকে আচার্য্য এইরূপ উপদেশ দিয়াছিলেন,

"যোঽএতদক্ষরং গার্গ্যবিদিত্বাস্মিন্ লোকে জুহোতি যজতে তপস্তপ্যতে বহূনি বর্ষসহস্রাণ্যন্তবদেবাস্য তদ্ভবতি।"

হে গার্গি! এই অক্ষর পরমেশ্বরকে না জানিয়া কোন ব্যক্তি ইহলোকে বহুসহস্র বর্ষ হোম, যাগ, তপস্যা করিলেও তিনি অস্থায়ী ফলমাত্র লাভ করেন। মুণ্ডক শ্রুতিতে "তত্রাপরা ঋগ্বেদোযজুর্ব্বেদঃ' ইত্যাদি বচনে বেদাদি সমস্ত শাস্ত্রকে ও তন্নিস্পন্ন ধর্ম্মকর্ম্ম ও ফল-শ্রুতিকে নিন্দা পূর্ব্বক মোক্ষসাধন পরা বিদ্যার প্রতিষ্ঠা করিয়াছেন এবং পুনশ্চ "প্লবাহ্যেতে" ইত্যাদি শ্রুতিতে পরমার্থ-জ্ঞান-বিবর্জ্জিত কাম্য-কর্ম্ম-যাজক ষোড়শ ঋত্বিক, যজমান ও তৎপত্নীকে অনিত্য-কর্ম্ম-সম্বন্ধাধীন বিনাশশীল কহিয়াছেন। পশ্চাৎ সমাহার করিয়াছেন,

"পরীক্ষ্য লোকান্ কর্ম্মচিতান্ ব্রাহ্মণোনির্ব্বেদমায়ান্নাস্ত্যকৃতঃ কৃতেন।
তদ্বিজ্ঞানার্থং স গুরুমেবাভিগচ্ছেৎ।"

বেদবাদ-বিরত, ফলাকাঙ্ক্ষা-বর্জ্জিত ব্রহ্মজ্ঞানী ব্যক্তিই ব্রাহ্মণ শব্দের বাচ্য।

"ব্রাহ্মণস্যৈব বিশেষতঃ অধিকারঃ সর্ব্বত্যাগেন ব্রহ্মবিদ্যায়াং ইতি ব্রাহ্মণগ্রহণং।"

তাদৃশ ব্রাহ্মণ বেদ স্মৃতি আগমাদি শাস্ত্রের সিদ্ধান্তযোগে সংসার-গতি-ভূত শতসহস্র-অর্থ-সঙ্কুল কদলীগর্ব্ভবৎ অসার জলবুদ্‌বুদ্-ফেণ-সমান প্রতিক্ষণপ্রধ্বংসমান বৈদিক কর্ম্ম সকল ও সেই কর্ম্ম-নিস্পাদিত-ফল-স্বরূপ পিতৃ দেব ও স্বর্গলোক সকল পরীক্ষা পূর্ব্বক এবং এই সংসারে কিছুই নিত্য নহে ও তৎসমুহ দ্বারা নিত্য বস্তু প্রাপ্তি হয় না জানিয়া বৈরাগ্য আশ্রয় করিবেন। পরে তিনি যাগ-যজ্ঞাদি ক্রিয়া কর্ম্মে ও ফল-প্রার্থনায় সন্ন্যাস পূর্ব্বক অভয়, শিব, অকৃত, নিত্য, পরম পদের জ্ঞানলাভার্থে শমদমাদিসম্পন্ন শ্রুতির মর্ম্মজ্ঞ গুরুর নিকটে গমন করিবেন। অতএব ধর্ম্মক্রিয়া ও তাহার ফলকে অনিত্য জ্ঞান করা ও তাদৃশ ক্রিয়া দ্বারা নিত্য পদার্থকে লাভ করা যায় না জানিয়া তৎসমস্ত ত্যাগ করাই চিত্তশুদ্ধির নামান্তর। অর্থাৎ বাসনা ও বাসনা-জন্য ক্রিয়ার ত্যাগেই চিত্ত বিশুদ্ধ হয়। অথবা

ইহাই বল যে, ক্রিয়া যদি ফল-কামনা-বর্জ্জিত হয় তাহাতেও চিত্তশুদ্ধি প্রতিষ্ঠিত থাকে। কিন্তু নাস্তিকতা করিয়া কর্ম্মত্যাগ করিলে অথবা অন্ত্যজ লোকের ন্যায় কৃতাকৃত শাস্ত্রজ্ঞানের অভাবে ক্রিয়ায় বিমুখ থাকিলে যে চিত্তশুদ্ধি হইবে এমত উক্ত হয় নাই। কেননা সেই সকল মূঢ়েরা ধর্ম্ম-কার্য্যই ত্যাগ করে, কিন্তু বাসনা ত্যাগ করিতে হয় তাহা জানে না। বাসনা ত্যাগই চিত্ত-শুদ্ধির মূল।

৩। এইরূপ বাসনা-ত্যাগ-জন্য যে কর্ম্ম-সন্ন্যাস তাহা ত্রিবিধ। প্রথমতঃ ধর্ম্ম-ক্রিয়া সকল করিতে করিতে পরীক্ষা দ্বারা তাহার ফল সুখভোগ অথবা স্বর্গাদিকে অনিত্য ও মোক্ষের বাধক জ্ঞান করত তাহা হইতে নিবৃত্ত হইয়া, মোক্ষের অনাবৃত-দ্বার-স্বরূপ, নিত্য-তত্ত্ব-স্বরূপ ধ্রুব-সত্য-স্বরূপ, অভয়-মঙ্গল-স্বরূপ, শান্তির নিকেতন-স্বরূপ, নিরঞ্জন ব্রহ্মের লাভে মগ্ন হওয়া। দ্বিতীয়তঃ ধর্ম্মকার্য্য সমূহকে লোকশিক্ষার নিমিত্তে বা তাহাতে ঈশ্বরের আবির্ভাব আছে এই বোধে পালন করা অথচ স্বীয় বাসনার অন্ত হওয়ায় তাদৃশ ক্রিয়ার ফল ঈশ্বরে সমর্পণরূপ ত্যাগ করা। তৃতীয়তঃ জন্মাবধি কোন ক্রিয়া-কর্ম্ম না করিয়া, পূর্ব্ব জন্মের কর্ম্ম-সন্ন্যাস অথবা ইহজন্মের সৎসঙ্গ জন্য বেদান্ত-বিজ্ঞান লাভ পূর্ব্বক একেবারেই ক্রিয়াহীন থাকা এবং লোক-শিক্ষার নিমিত্ত অথচ ঈশ্বরার্থে কর্ম্ম করা উচিত জানিয়াও ব্রহ্মজ্ঞানালোচনায় ক্রিয়া-সম্বন্ধাধীন বিক্ষেপের ভয়ে ক্রিয়া না করা। এই ত্রিবিধ কর্ম্মসন্ন্যাসের মধ্যে ব্রহ্মনিষ্ঠ গৃহস্থের পক্ষে যথাসম্ভব দ্বিতীয় প্রকার সন্ন্যাস অবলম্বনই শ্রেষ্ঠ কল্প বলিয়া অভিহিত হইয়াছে। গীতা, স্মৃতি প্রভৃতি মহা মহা শাস্ত্রে তাহারই প্রশংসা করিয়াছেন। জনকাদি রাজর্ষিগণ সেই পক্ষই অবলম্বন করিয়াছেন। ঈশ্বরের জগৎপালনের নিয়মও তাহাই উপদেশ দিতেছে। নিজ-গৃহের ও স্বদেশের বিভিন্নাধিকারি ব্যক্তিদিগকে নাস্তিকতা ও আলস্য হইতে ত্রাণ করিবার নিমিত্তে যুক্তি ও বিচার তাহারই অনুমোদন

করিতেছে। "ব্রহ্মনিষ্ঠোগৃহস্থঃ স্যাৎ তত্ত্বজ্ঞানপরায়ণঃ। যদ্যৎ-কর্ম্ম প্রকুর্বীত তদ্ব্রহ্মণি সমর্পয়েৎ" গৃহস্থ ব্যক্তি ব্রহ্মনিষ্ঠ ও তত্ত্বজ্ঞান-পরায়ণ হইবেন, যে কোন কর্ম্ম করুন তাহা পরব্রহ্মেতে সমর্পণ করিবেন। অর্থাৎ ফলাভিলাষী হইয়া ক্রিয়া করিবেন না, ঈশ্বরার্থে করিবেন, অতএব একথা ক্ষণকালের নিমিত্তে বিস্মৃত হওয়া উচিত নহে যে, সাক্ষাৎ সম্বন্ধে যাগ যজ্ঞ দেবার্চ্চনা প্রভৃতি ধর্ম্ম-কার্য্য সকল ব্রহ্মজিজ্ঞাসার হেতু নহে। কেবল নিষ্কাম কর্ম্মের মূলে যে চিত্তশুদ্ধি থাকে বা কাম্য কর্ম্ম ত্যাগেতে যে চিত্তশুদ্ধি প্রতিষ্ঠিত হয় সেই চিত্তশুদ্ধিই ব্রহ্মজিজ্ঞাসার হেতু।

৪। ক্রিয়া কখনও ব্রহ্মজিজ্ঞাসার হেতু নহে। যাগ-যজ্ঞাদি ক্রিয়ার সহিত ব্রহ্মজ্ঞানের কোন সম্বন্ধ নাই। চিত্তশুদ্ধি দ্বারা যে নিষ্কাম কর্ম্মের আচরণ হয় তাহা কর্ম্মাচরণের অনুরোধে নহে। কেন না সে কর্ম্মে ফল হয় না। তাহা কেবল কর্ত্তব্য-বুদ্ধিতে, লোক-শিক্ষার্থে, ঈশ্বরার্থে আচরিত হয়; অথবা তাহাতে পরমেশ্বরের আবির্ভাব আছে এই দৃষ্টিতে তাদৃশ ক্রিয়াতে ব্রহ্মজ্ঞানী যোগ দিতে পারেন। ব্রহ্মই তথায় লক্ষ্য! কর্ম্ম লক্ষ্য নহে, ফলও লক্ষ্য নহে। তাহাতে যে পরিমাণে কর্ম্ম-ভাগ আছে তাহা ব্রহ্মজ্ঞানের হেতু নহে। কাম্য কর্ম্মের তো কথাই নাই। সুতরাং কর্ম্ম কখনই জ্ঞানের অঙ্গ বা হেতু নহে। ঋষি আচার্য্য প্রভৃতি কোন শাস্ত্রকারই জ্ঞান ও কর্ম্মের সমুচ্চয় সংস্থাপন করিতে পারেন নাই। গীতা-স্মৃতিতে ক্রিয়া-যোগের বিস্তীর্ণ উপদেশ থাকাতে লোকের পাছে ভ্রম হয় যে, যজ্ঞাদি ক্রিয়ার অনুষ্ঠানই ব্রহ্মজিজ্ঞাসার হেতু, অথবা ক্রিয়ার ফলই ব্রহ্মলাভ, এই জন্য পূজ্যপাদ শঙ্করাচার্য্য তদ্ভাষ্যের উপক্রমণিকায় কহিয়াছেন,

"গীতাশাস্ত্রে ঈষন্মাত্রেণাপি শ্রৌতেন স্মার্ত্তেন বা কর্ম্মণাত্মজ্ঞানস্য সমুচ্চয়োন কেনচিৎ দর্শয়িতুং শক্যঃ।"

গীতা-শাস্ত্রে লেশমাত্রও শ্রৌত বা স্মার্ত্ত কর্ম্মের সহিত জ্ঞানের সমুচ্চয় কেহ প্রতিপাদন করিতে সমর্থ হইবেন না।

"তস্মাদ্‌গীতাসু কেবলাদেব তত্ত্বজ্ঞানান্মোক্ষপ্রাপ্তিঃ ন কর্ম্মসমুচ্চিতাদিতি নিশ্চিতোঽর্থঃ।"

অতএব কেবল তত্ত্বজ্ঞানেই মুক্তি হয় তাহাতে শ্রৌত ও স্মার্ত্ত কর্ম্মের সহায়তা অপেক্ষা করে না। ইহাই গীতা-শাস্ত্রের নিশ্চিত অর্থ। শ্রীমান্ শঙ্করাচার্য্য এই "অথাতোব্রহ্মজিজ্ঞাসা" সূত্রের ভাষ্যেও ঐরূপ মীমাংসা করিয়াছেন "নন্বিহ কর্ম্মাববোধানন্তর্য্যং বিশেষঃ" ব্রহ্মজিজ্ঞাসার পূর্ব্বে ধর্ম্মজ্ঞান অর্থাৎ শ্রৌত ও স্মার্ত্ত কর্ম্মের জ্ঞান অথবা জৈমিনী-প্রণীত কর্ম্ম-মীমাংসার অধ্যয়ন অপেক্ষিত বলা ন্যায্য হয় না, কেন না

"ধর্ম্মজিজ্ঞাসায়াঃ প্রাগপ্যধীতবেদান্তস্য ব্রহ্মজিজ্ঞাসোপপত্তেঃ।"

ধর্ম্ম-জিজ্ঞাসা অর্থাৎ ক্রিয়াকর্ম্মের জ্ঞান না থাকিলেও অধীত-বেদান্ত ব্যক্তির ব্রহ্মজিজ্ঞাসা জন্মে, অর্থাৎ পূজা, অর্চ্চা, অনশন, তীর্থসেবা, ব্রত যজ্ঞাদি ক্রিয়া কিছুমাত্র করে নাই অথচ কেবল বেদান্তের মর্ম্মাবধারণ পূর্ব্বক ব্রহ্মজিজ্ঞাসু হইতে পারে। তাহাতে পূর্ব্বজন্মে ক্রিয়া-সাধনানন্তর বিধিপূর্ব্বক তাদৃশ ব্যক্তির কর্ম্ম-সন্ন্যাস অবলম্বন করা হইয়াছে বরং এমত নিশ্চয় করা উচিত, কিন্তু কখনই এমত নিশ্চয় করা উচিত নহে যে, ঐহিক কর্ম্ম সাধনাভাবে চিত্ত-শুদ্ধি হয় না। যজ্ঞাদি ক্রিয়া কর্ম্ম যে কোন মতেই ব্রহ্মজিজ্ঞাসার সহায়, হেতু, অধিকারোৎপাদক বা অঙ্গ নহে তাহা সুস্পষ্টরূপে দেখাইবার নিমিত্ত শ্রীমান পূজ্যপাদ কএকটি যুক্তি গ্রহণ করিয়াছেন।

৫। প্রথমতঃ

"যথাচ হৃদয়াদ্যবদানানামানন্তর্য্যনিয়মঃ ক্রমস্য বিবক্ষিতত্বাৎ ন তথেহক্রমো-বিবক্ষিতঃ।"

যেমন যজ্ঞেতে মাংস দানে নৈবেদ্য দানে ক্রম বিহিত আছে; যথা প্রথমে পাদ্য, পরে অর্ঘ্য, পরে আচমনীয়, পরে গন্ধপুষ্প, পরে ধূপদীপ, পরে ভোজ্য, পরে পুনরাচমনীয় দিতে হয়, এই ব্রহ্মজিজ্ঞাসার পূর্ব্বে ক্রিয়া-কর্ম্ম করা সেরূপ অপরিহার্য্য ক্রম নহে। দেবতাকে পাদ্য না দিলে যেমন অর্ঘ্য দিতে পারা যায় না সেইরূপ পূজা অর্চ্চা প্রভৃতি ক্রিয়া অগ্রে না করিলে যে ব্রহ্মজিজ্ঞাসু হইতে পারিবে না সেরূপ বিবক্ষিত হয় নাই। অতএব ব্রহ্মজিজ্ঞাসা ধর্ম্ম-ক্রিয়ার ক্রম নহেন। দ্বিতীয়তঃ

"শেষশেষিত্বেঽধিকৃতাধিকারে বা প্রমাণাভাবাৎ"

ধর্ম্মকর্ম্ম ও ব্রহ্মজ্ঞান এ উভয়ের মধ্যে অঙ্গাঙ্গিভাব বা অধিকৃতাধিকার বিষয়ে কোন প্রমাণ নাই, অর্থাৎ যেমন মন্ত্রগ্রহণ করিয়া জপের অধিকারী হয় ও কৃতোপনয়ন-সংস্কার হইয়া গায়ত্রী-পাঠে অধিকার জন্মে, ধর্ম্মকর্ম্ম সকল সেরূপ ব্রহ্মজ্ঞানের অধিকার-প্রদ নহে। তৃতীয়তঃ

"ধর্ম্মব্রহ্মজিজ্ঞাসয়োঃ ফলজিজ্ঞাস্যভেদাচ্চ ;
অভ্যুদয়ফলং ধর্ম্মজ্ঞানং তচ্চানুষ্ঠানাপেক্ষং ;
নিঃশ্রেয়সফলন্তু ব্রহ্মজ্ঞানং নচানুষ্ঠানান্তরাপেক্ষং।"

ধর্ম্ম-জিজ্ঞাসা ও ব্রহ্মজিজ্ঞাসা এ উভয়ের ফল ও জিজ্ঞাস্যের ভেদ আছে। ধর্ম্মকার্য্যের ফল অনিত্য-স্বর্গাদি ভোগ-যোগে ক্রমোন্নতি—সে সকল কার্য্য বিধিপ্রদ ও ক্রিয়াপর শাস্ত্রানুসারে বিহিত বিধানে অনুষ্ঠান-সাপেক্ষ। কিন্তু ব্রহ্মজ্ঞানের ফল নিঃশ্রেয়স-মোক্ষ। তৎসাধনে কোন প্রকার অনুষ্ঠান অপেক্ষিত নহে। চতুর্থতঃ

"ব্রহ্মজিজ্ঞাস্যং নিত্যবৃত্তত্বাৎ ন পুরুষব্যাপারপারতন্ত্র।"

ব্রহ্মমীমাংসা-শাস্ত্রের জিজ্ঞাস্য যে ব্রহ্ম তিনি নিত্য-সিদ্ধ।

পুরুষ যেমন ধ্যানযোগে আকাশের সূর্য্যকে ক্রিয়াবিশেষে মনেতে দৃষ্টি করেন, ব্রহ্মজ্ঞান সেরূপ ক্রিয়া নহে। ব্রহ্ম যথার্থ সূর্য্যের ন্যায় স্বতঃসিদ্ধ। তিনি প্রকারান্তরে অনুভবনীয় নহেন। তিনি পুরুষের ধ্যান সাধনা প্রভৃতি কর্ত্তৃত্ব-পরতন্ত্র নহেন, কিন্তু নিত্য-সিদ্ধ বস্তুপরতন্ত্র। তিনি নিত্য সম্পত্তি-স্বরূপে জীবের সহ এক হইয়া আছেন। তিনি কূটস্থ ও চিদাভাসরূপে * জীবাত্মাতে মিশ্রিত হইয়া বাস করেন। সুতরাং চিত্ত-শুদ্ধি-জনিত ব্রহ্ম-জিজ্ঞাসার দ্বারা জীব তাঁহাকে স্বতন্ত্র জন্য বস্তুর ন্যায় অর্থাৎ ধ্যানকৃত দেবাদি বা স্বর্গাদি ফলের ন্যায় লাভ করেন না; কিন্তু "অবিভাগেন দৃষ্টত্বাৎ" এই ব্যাস-সূত্রানুসারে আপনা হইতে অস্বতন্ত্র-রূপে অবিভাগে ভোগ করেন। অতএব ব্রহ্ম নিত্য-সিদ্ধ; স্বতন্ত্র-রূপে লব্ধ ধর্ম্মোজিজ্ঞাস্যোৎপন্ন অনিত্য ফলবৎ নহেন।

পঞ্চমতঃ "প্রবৃত্তিভেদাচ্চ" বিধিরও ভেদ আছে।

ধর্ম্মবিধি পুরুষকে অনুভবী না করিয়া, ধর্ম্ম-কার্য্যে কেবল দাসের ন্যায় নিয়োগ করে, ফল-শ্রুতি বর্ণন পূর্ব্বক কেবল অনিত্য স্বর্গাদি সাধনার্থ কর্ম্মানুষ্ঠানে প্রবৃত্তি দেয়, কিন্তু ব্রহ্মবিদ্যা পুরুষকে প্রত্যক্ষ-রূপে ব্রহ্মজ্ঞান হৃদয়ঙ্গম করান মাত্র, তদ্ভিন্ন কোন অপ্রত্যক্ষ ফলের আশা দিয়া তল্লাভার্থ কোন রূপ ক্রিয়া-সাধনের প্রবৃত্তি দেন না। এতাবতা ধর্ম্মক্রিয়া ব্রহ্মজিজ্ঞাসার হেতু নহে।

৬। এস্থানে প্রশ্ন এই যে, যাঁহাদের কর্ম্মফলকামনা নাই এবং সর্ব্বত্রে ব্রহ্মদর্শন প্রতিষ্ঠিত হইয়াছে, তাঁহারা যদি ফলসঙ্গ-ত্যক্ত হইয়া, কোন যজ্ঞে বা দেবার্চ্চনায় জাজ্বল্যমান রূপে ভগবানের আবির্ভাব অনুভব পূর্ব্বক তাদৃশ ক্রিয়া সম্পন্ন করেন—সেরূপ ক্রিয়া ব্রহ্ম-জিজ্ঞাসার হেতু কি না? ইহার উত্তর এই যে, সেরূপ ভাবে উপনীত হওয়ার পূর্ব্বে তাঁহাদের নৈষ্কর্ম্মরূপ চিত্তশুদ্ধি হইয়াছে।

* অতিরিক্ত পত্র সংখ্যা ১ দ্রষ্টব্য।—

তাদৃশ অনুষ্ঠানে ক্রিয়া নাম মাত্র, তথা ব্রহ্মজ্ঞানই প্রতিষ্ঠিত এবং উক্ত চিত্তশুদ্ধিই সেই ব্রহ্মজ্ঞানের মূল। সুতরাং সে নামমাত্র ক্রিয়াতে ব্রহ্ম-জিজ্ঞাসার হেতুত্ব নাই। এস্থলে মীমাংসা করিবার অভিপ্রায়ে রামমোহন রায় এই পূর্ব্বপক্ষ করিয়াছেন যে, ক্রিয়া দ্বারা যদি ব্রহ্মজিজ্ঞাসা না জন্মে তবে মহর্ষি যাজ্ঞবল্ক্য স্বীয় স্মৃতি-নিবন্ধে কেন কহিলেন,

"ন্যায়োর্জ্জিতধনস্তত্ত্বজ্ঞাননিষ্ঠোঽতিথিপ্রিয়ঃ।
শ্রাদ্ধকৃৎ সত্যবাদীচ গৃহস্থোপি বিমুচ্যতে॥"

যে ব্যক্তি ন্যায়ানুগত হইয়া অর্থোপার্জ্জন করেন, তত্ত্বজ্ঞাননিষ্ঠ হন, অতিথিপ্রিয় হন, শ্রাদ্ধ করেন এবং সত্যবাদী হন এমত গৃহস্থও মুক্তিলাভ করেন। মহাত্মা রামমোহন রায় ইহার যে উত্তর দিয়াছেন, তাহার মর্ম্ম এই যে, ইহার একটি ধর্ম্মও কাম্য কর্ম্ম রূপে উদ্দিষ্ট হয় নাই। সমস্তই নিষ্কাম ও ঈশ্বরার্থ। তাদৃশ তত্ত্বজ্ঞাননিষ্ঠ পুরুষ যে প্রবৃত্তি ও বেদের দাস হইয়া ঐ সকল কর্ম্ম করেন না তাহা স্পষ্টই বুঝা যাইতেছে। সুতরাং এ সকল কেবল নামে ক্রিয়ামাত্র—অভ্যুদয়-ফল-প্রদ বেদ ও স্মৃতি-বিহিত ক্রিয়া নহে। তাদৃশ নিষ্কাম ক্রিয়াতে একমাত্র ফলভোগ-বিরাগই প্রতিষ্ঠিত। যদি ইহ জন্মে তাদৃশ ফলভোগ-বিরাগ না জন্মিয়া থাকে—যদি জ্ঞানী ইহজন্মে কাম্য কর্ম্ম একেবারেই না করা জন্য বিধিপূর্ব্বক তৎত্যাগের প্রমাণ না দিতে পারেন তবে শাস্ত্রানুসারে বুঝিতে হইবে যে, সেরূপ বিধিপূর্ব্বক ত্যাগ পূর্ব্বজন্মে হইয়াছে। পূজ্যপাদ বিজ্ঞানেশ্বর উক্ত যাজ্ঞবল্ক্য-বচনের এইরূপ তাৎপর্য্য দিয়াছেন যে,

"ভবান্তরানুভূতপারিব্রজস্য ইত্যবগন্তব্যং"

যে গৃহস্থ পূর্ব্বজন্মে কর্ম্মসন্ন্যাস অবলম্বন করিয়াছেন অর্থাৎ কাম্য কর্ম্ম করিতে করিতে তাহার ফল অনিত্য বুঝিয়া, নিশ্রেয়স

মোক্ষমার্গ আশ্রয় করিয়াছেন তিনি পরজন্মে আর কাম্য কর্ম্মে ব্রতী হন না। তাঁহারই উদ্দেশে ঐরূপ বচন যুক্ত হয়। নতুবা বাসনাবদ্ধ গৃহস্থ ঐ সকল ধর্ম্মের যাজন করত কেবল নানাবিধ ভোগ সুখ, স্বর্গ ও বিদ্যানন্দ প্রভৃতি ফলই পাইতে পারেন—মুক্তি প্রাপ্ত হন না। অতএব বাসনা-বিনিবৃত্ত শুদ্ধ চিত্তই ব্রহ্ম জিজ্ঞাসার এক-মাত্র হেতু।

৭। ঐ প্রকার চিত্তশুদ্ধিকে পূজ্যপাদ শঙ্করাচার্য্য চারি প্রকারে বিভক্ত করিয়া বুঝাইয়াছেন।

নিত্যানিত্যবস্তুবিবেকঃ। ১।
ইহামুত্রার্থফলভোগবিরাগঃ। ২।
শমদমাদিসাধনসম্পৎ। ৩।
মুমুক্ষুত্বং। ৪।

যখন মানবের বুদ্ধি হইতে সংসারের সমুদয় বস্তুরূপ জঞ্জাল অনিত্য জ্ঞানে দূরীভূত হইয়া বুদ্ধি নিত্য পরব্রহ্মকে আশ্রয় করে তখন সেই বুদ্ধিকে "নিত্যানিত্যবস্তুবিবেক" বলে। মনুষ্য যে ভাবের বশবর্ত্তী হইয়া, ঐহিক সুখভোগে বিরত হন ও পর-লোকে স্বর্গ ভোগের বাসনা পর্য্যন্ত পরিত্যাগ পূর্ব্বক পরব্রহ্মে মগ্ন হন সেই ভাবের নাম "ইহামুত্রার্থফলভোগবিরাগ।" যে পরম সম্পৎ লাভ হওয়াতে মনুষ্যের মতি সংসারের বিষয় সকল হইতে ব্যাবৃত্ত হইয়া, পরমেশ্বরের কথা শ্রবণে মননে নিদিধ্যাসনে উৎসাহিত হয় তাহাকে "শম" বলে। যে সম্পদের প্রভাবে মনুষ্য চক্ষু কর্ণাদি ইন্দ্রিয়গণকে বহির্বিষয় হইতে আকর্ষণ পূর্ব্বক তত্ত্বকথা শ্রবণাদিতে একনিষ্ঠ হয় তাহার নাম "দম"। তদ্রূপে আকর্ষিত ইন্দ্রিয়গণকে আর বহির্বিষয়ে মুগ্ধ হইতে না দিয়া ব্রহ্মৈকনিষ্ঠাকে প্রতিষ্ঠা করাকে "উপরতি" কহে। জীব যখন একান্তে তদ্রূপে ব্রহ্মনিষ্ঠ হন, তখন শীত, উত্তাপ, সুখ দুঃখ প্রভৃতিতে মৃতের ন্যায়

কাতর হয় না। এই রূপ সহিষ্ণুতাকে "তিতিক্ষা" কহে। এই রূপে যে একাগ্রতা সম্পূর্ণ রূপে বিক্ষেপ-শূন্য হইয়া ব্রহ্মকে ধারণ করে তাহার নাম "সমাধান"। কিন্তু মনেতে সন্দেহ ও তর্ক থাকিলে ঐরূপ সংযম সম্ভব নহে। অতএব বেদান্ত ও আচার্য্য-বাক্যে অবিচলিত বিশ্বাস উহার অঙ্গ। সেই বিশ্বাসকে "শ্রদ্ধা" কহে। এই শম, দম, উপরতি, তিতিক্ষা, সমাধান ও শ্রদ্ধাকে সাধারণতঃ "শমদমাদি" কহে। আর ব্রহ্ম-লাভের ব্যাকুলতার নাম "মুমুক্ষুত্ব" কি না মোক্ষ-ইচ্ছা। এতাবতা নিত্যানিত্যবস্তু-বিবেক, ইহামুত্রার্থফলভোগবিরাগ, শমদমাদি ও মুমুক্ষুত্ব চিত্ত-শুদ্ধির এই চারি প্রকার বিভাগকে "সাধন-চতুষ্টয়" কহে। ইহাদের কোন একটির অভাব থাকিলেই সংসার, তর্ক, বা ফলকামনা তাহার স্থান গ্রহণ করিবে। তাদৃশ চিত্ত শুদ্ধচিত্ত নহে। শুদ্ধচিত্তে তর্ক ও বিষয়-মলা স্থান পায় না। তাহা কেবল ব্রহ্মেরই জিজ্ঞাসু। শ্রীমান্ শঙ্করাচার্য্য শারীরক সূত্রের ভাষ্যে লিখিয়াছেন,

"তেষু হি সৎসু প্রাগপি ধর্ম্মজিজ্ঞাসায়া ঊর্দ্ধঞ্চ শক্যতে ব্রহ্মজিজ্ঞাসিতুং জ্ঞাতুঞ্চ ন বিপর্য্যয়ে।"

এই সকল সাধন-চতুষ্টয়সহকারে চিত্তশুদ্ধি হইলেই, ধর্ম্ম * জিজ্ঞাসা হউক বা না হউক, দেব ও পিতৃক্রিয়া প্রভৃতি সাধন থাকুক বা না থাকুক ব্রহ্মজিজ্ঞাসায় অধিকার জন্মে। তাদৃশ চিত্ত-শুদ্ধি ভিন্ন ব্রহ্মজিজ্ঞাসার উদয় হয় না।

"তস্মাদথশব্দেন যথোক্তসাধনসম্পত্ত্যানন্তর্য্যমুপদিশ্যতে।"

৮। অতএব যথোক্ত সাধন-সম্পত্তি নামক চিত্তশুদ্ধিই ব্রহ্মজিজ্ঞাসার হেতু। তাহারই অনন্তর ব্রহ্মসাধন হইয়া থাকে। যাগ যজ্ঞের বা দেবার্চ্চনার অনন্তর নহে। এই উদ্দেশ্যে মহর্ষি বেদ-

* ধর্ম্ম শব্দের অর্থ এস্থলে কর্ম্মকাণ্ড।

ব্যাস বেদান্ত সূত্র নামক শাস্ত্রারম্ভ ও তাহার এই প্রথম সূত্রে "অথ" শব্দ ব্যবহার করিয়াছেন। "অতঃ" শব্দের অর্থ "হেতু"। কিসের হেতু? না ব্রহ্মজিজ্ঞাসার হেতু। চিত্ত-শুদ্ধির ঐরূপ আনন্তর্য্যই উহার হেতু। সুতরাং ঐ আনন্তর্য্যেতেই ব্রহ্মজিজ্ঞাসার হেতু সমন্বিত আছে। অতএব ইহা নিশ্চয় হইল যে, চিত্তশুদ্ধিই ব্রহ্মজিজ্ঞাসার হেতু। কিন্তু "ব্রহ্মজিজ্ঞাসা" বাক্যের তাৎপর্য্য কি? তাহার মীমাংসা করিতেছেন। "জ্ঞাতুমিচ্ছা জিজ্ঞাসা" জ্ঞানের ইচ্ছাকে জিজ্ঞাসা বলে। কেন সর্ব্বত্যাগী হইয়া লোকে ব্রহ্মজ্ঞানলাভে ইচ্ছুক হয়? ইহার উত্তর এই যে, মনুষ্যের আত্মা এ সংসারে কিছুতেই তৃপ্ত হয় না। তিনি পুত্র কন্যা দাসদাসী পরিবৃত ও রাশীকৃত-সম্পত্তি-সম্পন্ন হইয়া সংসার-ভোগেও সুখী হন না। তাঁহাকে ধর্ম্মকর্ম্মের ফল-স্বরূপ সুরপুরী হইতে হিরণ্যগর্ব্ভ-লোক পর্য্যন্ত উত্তরোত্তর স্বর্গভোগের আশা প্রদর্শন কর, হয় ত তিনি যাজ্ঞবল্ক্যপত্নী মৈত্রেয়ীর ন্যায় কহিবেন,

"যেনাহং নামৃতা স্যাং কিমহং তেন কুর্য্যাং যদেব ভগবান্ বেদ তদেব মে ব্রূহীতি।"

যে ধনের দ্বারা আমার মুক্তি হইবে না, অমৃতত্ব লাভ হইবে না, তাহা লইয়া কি করিব; অতএব মুক্তির সাধন যাহা আপনি জানেন তাহা আমাকে বলুন—অথবা তিনি নচিকেতার ন্যায় বলিয়া উঠিবেন "নাবিত্তেন তর্পণীয়োমনুষ্যঃ" বিত্তেতে মনুষ্যের তৃপ্তি হয় না। অতএব ব্রহ্মই পরম পুরুষার্থ। ব্রহ্মজ্ঞানের দ্বারা

"নিঃশেষসংসারবীজাবিদ্যাদ্যনর্থনির্ব্বহণাৎ"

অশেষ সংসার-বীজরূপ অবিদ্যা নিবারিত হয়। এই কারণে চিত্তশুদ্ধি-সম্পন্ন জীব নির্ম্মলা ভাগবতী মতির শরণাপন্ন হয়েন। বাল্যলীলা-জনক বাসনা সকল যেমন যৌবনে বিগত হয়, যৌবনের বাসনা সকল যেমন প্রৌঢ়ে থাকে না, প্রৌঢ়ের ঘোরতর উপার্জ্জন-

স্পৃহা যেমন বার্দ্ধক্যে হ্রাস হয়, সেই রূপ ইহকালে বা পরকালে জীবের বাসনা-লীলা-কলুষিত অবস্থার অন্ত হইলেই ব্রহ্মজ্ঞানোপার্জ্জনে মতি জন্মিবে।

"তস্মাৎ ব্রহ্ম জিজ্ঞাসিতব্যং"

অতএব চিত্ত-শুদ্ধির অপরিহার্য্য ফলস্বরূপ ব্রহ্মই জিজ্ঞাসার বিষয় হইতেছেন এবং ব্রহ্মপর বেদ-বেদান্ত জীবকে ব্রহ্ম-বিজ্ঞান প্রদানার্থ উত্তর-সাধকতা করিতেছে। এস্থলে যদি কেহ এমত পূর্ব্বপক্ষ করেন যে, চিত্তশুদ্ধির অনন্তর ব্রহ্মজিজ্ঞাসা উপস্থিত হয় বটে, কিন্তু এমত অনেক তত্ত্ব ও গুণ আছে যে, চিত্তশুদ্ধির পরই তৎসমূহের বিচার ও সাধন না করিলে ব্রহ্মজিজ্ঞাসা উত্তমরূপে আরম্ভ হয় না। এ কথার উত্তর এই যে, ব্যক্তিতে ব্রহ্ম-জিজ্ঞাসার উদয় দেখিলেই তাহার ইহজন্মে বা পূর্ব্বজন্মে সে সকল বিচার ও সাধন হইয়া গিয়া চিত্তশুদ্ধি হইয়াছে ইহাই বুঝিতে হইবে। সে জন্য যথোক্ত নির্ম্মলচিত্তে যখন ব্রহ্মজিজ্ঞাসা আরম্ভ হয় তখন তন্মধ্যে সকল তত্ত্বের সিদ্ধান্ত ও সকল গুণের সাধনফল ব্রহ্মজিজ্ঞাসার অন্তরঙ্গ-রূপে সামান্যতঃ সংস্কারবৎ নিহিত থাকে। সুতরাং বিশেষরূপে তত্ত্ববিচারে ও সে সকল গুণ-সাধনে আর ইচ্ছা হয় না। শ্রীমান্ শঙ্করাচার্য্য কহিয়াছেন,

"প্রধানপরিগ্রহে তদপেক্ষিতানামপ্যর্থাক্ষিপ্তত্বাৎ।
ব্রহ্ম হি জ্ঞানেনাপ্তুমিষ্টতমত্বাৎ প্রধানং।"

ব্রহ্মজিজ্ঞাসাতে ব্রহ্মই প্রধান—অতএব প্রধান বস্তু গৃহীত হইলে তদপেক্ষিত পদার্থ সকল তদঙ্গরূপে সুতরাং পরিগৃহীত হয়।

"তস্মিন্ প্রধানে জিজ্ঞাসাকর্ম্মণি পরিগৃহীতে যৈর্জিজ্ঞাসিতৈর্ব্বিনা ব্রহ্ম জিজ্ঞাসিতং ন ভবতি তান্যর্থাক্ষিপ্তান্যেবেতি পৃথক্ সূত্রয়িতব্যানি।"

সেই প্রধানকে জিজ্ঞাসার কর্ম্মণি বাচ্য রূপে গ্রহণ করিলে যে

যে বিষয়ের জিজ্ঞাসা ব্যতীত তাহা সম্পন্ন না হয় সে সমুদয় সহজেই গৃহীত হইবে। তাহার আর পৃথক গ্রহণের আবশ্যকতা নাই।

"যথা রাজাসৌ গচ্ছতীত্যুক্তে সপরিবারস্য রাজ্ঞোগমনমুক্তং ভবতি তদ্বৎ।"

যেমন রাজা গমন করিতেছেন বলিলে রাজার পারিষদদিগেরও গমন বুঝায় তদ্রূপ। অতএব চিত্ত-শুদ্ধির অনন্তর ব্রহ্মজিজ্ঞাসা যখন জীবেতে উপস্থিত হয় তখন প্রেম, ভক্তি, দয়া, দাক্ষিণ্য, সরলতা, সত্যবাদিতা, প্রভৃতি সমস্ত সদ্‌গুণ এবং পঞ্চকোষ-বিবেক, ষট্‌চক্রনিরূপণ, সৃষ্টিতত্ত্বের বিচার প্রভৃতি সমস্ত তত্ত্বজ্ঞান সেই জিজ্ঞাসার সঙ্গে সঙ্গে থাকে। তাহাদের পৃথক সাধনের প্রয়োজন করে না। এমনও বলিতে পার না যে, ব্রহ্মজিজ্ঞাসাতে ব্রহ্মই বিশেষরূপে জিজ্ঞাস্য বটেন কিন্তু ঐ সকল গুণ ও তত্ত্ব নিদানে স্বতন্ত্র ভাবে সামান্যরূপেও জিজ্ঞাস্য। এরূপ আশঙ্কা অকিঞ্চিৎকর। কেন না

"যতো বা ইমানি ভূতানি জায়ন্তে"

ইত্যাদি শ্রুতিতে একেবারেই কহিয়াছেন।

"তদ্বিজিজ্ঞাসস্ব তদ্ব্রহ্মেতি"

যাঁহা হইতে এই ভূত সকল উৎপন্ন হয় তাঁহাকে জানিতে ইচ্ছা কর তিনি ব্রহ্ম। এতাবতা "অথাতো ব্রহ্মজিজ্ঞাসা" সূত্রেতে কর্ম্মে ষষ্ঠী সমাসে একমাত্র ব্রহ্মই জিজ্ঞাসার বিষয়। তদ্ভিন্ন অন্য কিছুই জিজ্ঞাস্য নহে। তদাশ্রিত অশেষ বস্তু-বিচারও প্রয়োজনীয় নহে। আর সাধন-চতুষ্টয়-সম্পন্ন শুদ্ধচিত্ত, সে জিজ্ঞাসার অধিকারোৎপাদক হইলেও তাহা তাহার অব্যর্থ অনুষঙ্গী।

৯। অতঃপর শঙ্করাচার্য্য আপনিই এই প্রকার পূর্ব্বপক্ষ করিয়াছেন,

"তৎপুনর্ব্রহ্মপ্রসিদ্ধমপ্রসিদ্ধং বা স্যাৎ, যদি প্রসিদ্ধং ন জিজ্ঞাসিতব্যং, অথা-প্রসিদ্ধং নৈব শক্যং জিজ্ঞাসিতুমিতি।"

যে ব্রহ্মের জিজ্ঞাসা সম্বন্ধে এত বিচার তিনি প্রসিদ্ধ কি অপ্রসিদ্ধ? এস্থানে "প্রসিদ্ধ" শব্দের অর্থ সিদ্ধত্ব, মুক্তত্ব, নিত্যত্ব, সদ্ভাবত্ব, সর্ব্বগতত্ব, প্রকাশকত্ব, কূটত্ব, সাক্ষিত্ব ইত্যাদি সর্ব্বত্র-সুলভ বা প্রাপ্তব্য ধর্ম্ম। আর 'অপ্রসিদ্ধ' শব্দের অর্থ উহারই বিপরীত। অতএব যদি ব্রহ্মকে প্রসিদ্ধ বল, তবে তাঁহার জিজ্ঞাসার প্রয়োজন কি? আর অপ্রসিদ্ধ বলিলে জিজ্ঞাসাই অসম্ভব। শ্রুতিতে লক্ষণাপ্রয়োগে ব্রহ্মের সর্ব্বব্যাপ্তিত্ব দেখাইবার নিমিত্ত অনেক পদার্থকে ব্রহ্ম কহিয়াছেন। ব্রহ্ম শব্দে মনু, প্রাণ, মন, বিজ্ঞান, জীবাত্মা, শব্দ, মন্ত্র, অন্ন ব্রাহ্মণ ইত্যাদি। বেদ ব্রহ্ম, সুর ব্রহ্ম, রাগ ব্রহ্ম, তাল ব্রহ্ম, কৃষ্ণ ব্রহ্ম, রাম ব্রহ্ম, ইন্দ্র ব্রহ্ম, বায়ু ব্রহ্ম, সূর্য্য ব্রহ্ম, বরুণ ব্রহ্ম, ইত্যাদি। সর্ব্বত্রে ভগবানের বিভূতি সামান্য বা বিশেষরূপে বর্ত্তমান থাকিলেও সেই বিভুতির জিজ্ঞাসু না হইয়া লোকে ঐ সকল পদার্থকে পৃথক্ পৃথক্ ব্রহ্মরূপে গ্রহণ করিতে পারে, তাহাতে তাঁহার অখণ্ডৈকরসস্বরূপের সুতরাং প্রত্যক্ষানুভব-যোগ্য প্রসিদ্ধ ভাবের জ্ঞান লাভ হয় না। বিশেষতঃ অদ্বয়-তত্ত্বজ্ঞান-বিরহিত ব্যক্তিরা প্রশ্ন করিতে পারেন যে, এই সকল ব্রহ্মের মধ্যে মানব কোন্ ব্রহ্মের জিজ্ঞাসু হইবেন? তদুত্তরে যদি উপরি উক্ত ব্রহ্মগণের মধ্যে কোন একটিকে নির্দ্দেশ করা যায়, তবে তাদৃশ ব্রহ্মের সিদ্ধত্ব, মুক্তত্ব, সদ্ভাবত্ব, নিত্যত্ব, সর্ব্বগতত্ব, কূটত্ব, সাক্ষিত্ব প্রভৃতি অপরোক্ষ ধর্ম্মের প্রতি সন্দেহ উপস্থিত হইয়া তজ্জিজ্ঞাসায় অশ্রদ্ধা জন্মে। এইরূপ আশঙ্কার সমাধান এই যে "সর্ব্বস্যাত্মত্বাৎ" ব্রহ্ম সকলের আত্মারূপে প্রকাশমান আছেন। সুতরাং প্রসিদ্ধ। এ কথায় পুনঃ প্রশ্ন হইতেছে যে, যদি প্রসিদ্ধ তবে আবার জিজ্ঞাসার অর্থাৎ অন্বেষণের প্রয়োজন কি? ইহার উত্তর এই যে, যদিও তিনি অন্তরাত্মারূপে

সামান্যতঃ সর্ব্বজীবে আছেন, যদিও সামান্যরূপে তিনি সকলের নিকটে জ্ঞাত আছেন তথাপি,

"ন তদ্বিশেষং প্রতি বিপ্রতিপত্তেঃ।"

সকলে তাঁহাকে বিশেষরূপে জানে না। তিনি আত্মারূপে জীবেতে না থাকিলে জীবের আত্মবুদ্ধি উপস্থিত হইত না। তিনি চিদাভাসরূপে জীবেতে মিশ্রিত থাকাতে জীব "আমি আছি" বলিয়া প্রত্যয় করে। জীবের সেই সহজাত আত্মবুদ্ধি সেই কূটস্থ ও চিদাভাস-স্বরূপ অন্তরাত্মার অধিষ্ঠানেই প্রতিষ্ঠিত আছে। শ্রুতিতে কহিয়াছেন,

"তং হ দেবমাত্মবুদ্ধিপ্রকাশং।"

সেই পরমেশ্বর জীবের আত্মবুদ্ধির প্রকাশক। কিন্তু এই প্রকার সুলভ ও প্রসিদ্ধ মুখ্যাত্মারূপে তিনি জীবেতে অধিষ্ঠিত থাকিলেও তিনিই যে জীবের প্রকৃত আত্মা সে ভাবে বিশেষরূপে তাঁহাকে সকলে জানে না, কেন না কেহ দেহকে, কেহ ইন্দ্রিয়শক্তিকে, কেহ মনকে, কেহ বুদ্ধিকে, কেহ বা এই সংসারী জীবাত্মাকে আত্মা কহে। কিন্তু যাঁহার অধিষ্ঠান বশত দেহেন্দ্রিয়াদি চেতনা-বিশিষ্ট হয়, মনোবুদ্ধি প্রভৃতি সঙ্কল্প-বিকল্পে, যুক্তি-নিশ্চয় পরিস্ফুট হয়, জীবাত্মাতে আত্মবুদ্ধি ও কর্ত্তৃত্ব ভোক্তৃত্বের উদয় হয়, যাঁহার অধিষ্ঠান না থাকিলে জীবাত্মা ক্ষণকালও তিষ্ঠিতে পারিত না, তাঁহাকে আপনাতে আত্মারূপে প্রত্যক্ষ দর্শন করা বিশেষ জ্ঞানের কার্য্য। তিনি ঐ রূপে প্রসিদ্ধ থাকিলেও বিশেষ মতে তাঁহাকে জানিতে চেষ্টা করা প্রয়োজন। সেইরূপ জানার ইচ্ছাকে "ব্রহ্মজিজ্ঞাসা" বলে। যখন ইহামুত্রার্থ-ফলভোগ-বিরাগ প্রভৃতি চিত্তশুদ্ধি বশতঃ দেহ প্রাণ অবধি জীবত্ব পর্য্যন্তে মমতা-রহিত হইয়া, মধুপানোন্মত্ত ভৃঙ্গের ন্যায় জীব সেই অন্তরাত্মার চরণ-সরোরুহ-ক্ষরিত মকরন্দ-

পানে সকল কামনার পরিসমাপ্তি জ্ঞান করেন, তখনই তাঁহার ব্রহ্মজিজ্ঞাসা আরম্ভ হয়। অতএব "ব্রহ্মই আমার আত্মা" এই প্রত্যক্ষ জ্ঞানটি লাভের নিমিত্ত এই বেদান্ত দর্শন আরম্ভ করিয়াছেন। এই জ্ঞান ধর্ম্মক্রিয়া, অনুমান, বা কোন রূপ সাধনার বিষয় নহে।

১০। "যতোবা ইমানি ভূতানি জায়ন্তে"।

ইত্যাদি শ্রুতির আরম্ভে যদিও তাঁহাকে জগৎকর্ত্তা বলিয়া নির্দ্দেশ করিয়াছেন কিন্তু সেরূপ ভাবে তাঁহাকে জানায় তিনি প্রত্যক্ষ হন না। কেবল যখন পঞ্চকোষ অতিক্রম পূর্ব্বক তাঁহাকে অন্তরাত্মারূপে অনুভব করি, তখন আমাতেই তাঁহার স্বরূপ এবং তাঁহাতেই আমার মুখ্য স্বরূপ প্রত্যক্ষ দর্শন করি। ব্রহ্মস্বরূপের এই প্রত্যক্ষ দর্শন লাভের নিমিত্তই ব্রহ্মজিজ্ঞাসার আবশ্যক। উপরি উক্ত "যতো বা ইমানীত্যাদি" শ্রুতিতে প্রথমে তটস্থ লক্ষণে ব্রহ্মনিরূপণ করিয়া পশ্চাৎ "তদ্বিজিজ্ঞাসস্ব" তাঁহাকে বিশেষরূপে জানিতে ইচ্ছা কর, "রসোবৈ সঃ" তিনি "রসস্বরূপ তৃপ্তিহেতু" "পরমে ব্যোমন্ প্রতিষ্ঠিত" ব্রহ্ম বিদ্যা হৃদয়াকাশে প্রতিষ্ঠিত ইত্যাদি স্বরূপ লক্ষণে সমাহার করিয়াছেন। তাহা জীব উপাধির অভিমান ত্যাগ পূর্ব্বক আপনাতেই অনুভব করিতে ক্ষমবান হন, অতএব ব্রহ্মজিজ্ঞাসু হইয়া জীব আপনাতেই প্রত্যক্ষরূপে—স্বরূপে তাঁহাকে দর্শন করিবেন। পূর্ব্বোক্ত "তটস্থ" ও শেষোক্ত "স্বরূপ লক্ষণের" বিভিন্নতা প্রদর্শনার্থে ভগবান ব্যাস নিম্নস্থ সূত্র উপস্থিত করিতেছেন।

ইতি প্রথম অধ্যায়ে প্রথম পাদে প্রথম অধিকরণে প্রথম সূত্রের ব্যাখ্যা সমাপ্ত।

প্রথম অধ্যায়।

প্রথম পাদ।

দ্বিতীয় অধিকরণ।

দ্বিতীয় সূত্র।

সূত্র। জন্মাদ্যস্য যতঃ।২।

অর্থ। যে সর্ব্বজ্ঞ পুরুষ হইতে এই জগতের জন্মাদি অর্থাৎ জন্ম-স্থিতি-ভঙ্গ হয় তিনি ব্রহ্ম।

তাৎপর্য্য।

১১। জন্ম-স্থিতি-ভঙ্গরূপ কার্য্যই যদি ব্রহ্মের পরিচায়ক হয় তবে গৌণ প্রয়োগে অন্ন, প্রাণ, মন, বিজ্ঞান, প্রকৃতি ধর্ম্মাধর্ম্ম, অদৃষ্ট প্রভৃতি অনেক পদার্থকে জন্মস্থিতি ভঙ্গের কারণ বলা যাইতে পারে। সেই সকল গৌণ কারণের অবধারণ কি ব্রহ্মজিজ্ঞাসা? কখন নহে। সে তাৎপর্য্যে উক্ত সূত্র উক্ত হয় নাই। আবার অনেক তর্ক ও যুক্তিপরায়ণ ঈশ্বরবাদী উক্ত সূত্রের লক্ষিত বেদ-বাক্যের সমাহার না জানিয়া মনে করিতে পারেন যে, কেবল জগ-তের জন্ম-স্থিতি-ভঙ্গরূপ কার্য্যই বুঝি ব্রহ্মরূপ কারণকে নির্দ্দেশ করে। তদ্ভিন্ন ব্রহ্ম থাকার অন্য প্রমাণ নাই। অতএব তাঁহারা বলিবেন যে "জন্মাদ্যস্য যতঃ" এই সূত্রটিতেও কেবল এরূপ যুক্তিই গ্রথিত হইয়াছে এবং তাদৃশ ব্রহ্ম-বিষয়ক জ্ঞানের অনুসন্ধানই ব্রহ্ম-জিজ্ঞাসা শব্দের বাচ্য। এ কথার উত্তর এই যে, যদ্রূপ গৌণ কারণস্বরূপ অকাশাদি বা অন্নপ্রাণাদি কোন পদার্থ ব্রহ্মজিজ্ঞাসার বিষয় নহে সেইরূপ জগতের জন্মাদির কারণ বলিয়া অনুমান ও যুক্তি দ্বারা যে ঈশ্বরকে নিষ্পন্ন করা যায় তিনিও ব্রহ্মজিজ্ঞাসার প্রকৃত বিষয় নহেন। সেরূপ অনুমান ও যুক্তি গ্রথনের জন্য এ সূত্র রচিত হয় নাই। পূজ্যপাদ শঙ্করাচার্য্য স্বীয় ভাষ্যে লিখিয়াছেন,

"বেদান্তবাক্যকুসুমগ্রথনার্থত্বাৎ সূত্রাণাং,
বেদান্তবাক্যানি হি সূত্রৈরুদাহৃত্য বিচার্য্যতে।"

বেদান্ত-বাক্যরূপ অর্থাৎ জ্ঞানকাণ্ডীয় বেদ-বাণীরূপ-পুষ্প গ্রথনের জন্যই সূত্র সকল প্রবৃত্ত হয়, যুক্তি বা অনুমান গ্রথন-জন্য নহে। সেই বেদবাণী সকল গ্রহণ পূর্ব্বক এই সকল সূত্রে বিচারিত হইয়াছে।

১২। "বাক্যার্থবিচারণাধ্যবসাননির্ব্বৃত্তা হি ব্রহ্মাবগতির্নানুমানাদি প্রমাণান্তর-নির্বৃত্তা।"

বেদ-বাক্যের যথাশ্রুত অর্থে বেদের গূঢ় তাৎপর্য্য নাই, কিন্তু বিচার পূর্ব্বক সেই সকল বাক্যার্থ নিশ্চয় করিতে হয়, উত্তম-রূপে হৃদয়ঙ্গম করিতে হয় তবে হৃদয়েতে বাক্যার্থের স্ফুটতা জন্মিয়া ব্রহ্মাবগতি হয়। হৃদয়ঙ্গম না করিয়া "এই জগতের সৃষ্টি স্থিত্যাদির কর্ত্তা যিনি তিনি ব্রহ্ম" এরূপ মৌখিক উক্তিতে অথবা সামান্য অন্ধ বিশ্বাসে ব্রহ্মজ্ঞান জন্মে না, হৃদয়ঙ্গম-রূপ-মূল-শূন্য নামমাত্র আকাশ-কুসুমবৎ বিশ্বাসের দৃঢ়তা সম্পাদনার্থে অনুমান ও তর্কাদি যত্ত প্রমাণ প্রয়োগ করিবে তাহার দ্বারা কোন মতেই ঐ জ্ঞান জন্মিবে না। কিন্তু হৃদয়ঙ্গমকৃত বেদান্ত বাক্যার্থের সেরূপ লাঘব হয় না। তাহা জীবের হৃদয়ে প্রবেশ করিয়া নিস্তরঙ্গ গাম্ভীর্য্য লাভ করে। এ কথায় কেহ কেহ মনে করিতে পারেন তবে বুঝি বেদান্ত-বিচারে কিছুমাত্র তর্কানুমানের সমাবেশ নাই। ফলে তাহাও নহে। বেদান্ত-শাস্ত্রের লক্ষ্যই এই যে, জীবকে তাঁহার স্বীয় হৃদয়ে জীবের নিজ সত্ত্বা অপেক্ষাও প্রত্যক্ষতর রূপে ব্রহ্মকে অনুভব করাইয়া সংসারের অপ্রত্যক্ষত্ব প্রতিপাদন করিবেন। সেই দিকেই বেদান্ত-বাক্য সকলের উদ্দেশ্য। অতএব যদিও বেদান্ত দৃঢ়তররূপে জগজ্জন্মাদি কারণবাদী বটেন, তথাপি তাঁহার ঐ লক্ষ্যটি স্থিরতর থাকায়, তিনি তদবিরোধী তর্ক ও অনুমানাদিকেও স্থান দিয়া থাকেন।

"শ্রুত্যৈব চ সহায়ত্বেন তর্কস্যাপ্যভ্যুপেতত্বাৎ"

শ্রুতিতেও তর্ক সকল সহায়রূপে গৃহীত হয়। কেন না, শ্রুতি বলেন যে ব্রহ্মের শ্রবণ, মনন, নিদিধ্যাসন করিবেক এবং তদ্ভিন্ন তিনি নানা প্রকার লৌকিক দৃষ্টান্ত ও ন্যায়ের দ্বারা ব্রহ্মজ্ঞানোপদেশ করেন। এইরূপ তর্ক ও যুক্তি প্রভৃতি হৃদয়ঙ্গম-যোগ্য ব্রহ্মাবগতিনিষ্ঠ বেদ-বাক্যের সহায়। কিন্তু বেদ ত্যাগ করিয়া কেবল তর্ক ও যুক্তি তদ্রূপানুভূতি উৎপাদনে সুপারগ হয় না। সুতরাং তাদৃশ স্থলে তাহাদের মর্য্যাদা নাই। কেননা কঠ শ্রুতিতে আছে "অতর্ক্য-মনুপ্রমাণাৎ।" পরমাত্মা তর্ক দ্বারা অগম্য। "নৈষা তর্কেণ মতি-রাপনেয়া" বেদাগম প্রতিপাদ্যা ও আত্মাতে উৎপন্না যে ব্রাহ্মী মতি তাহা তর্কেতে পাওয়া যায় না। অতএব বেদের অবিরোধি ও তদনুগত তর্কানুমানাদি বেদান্ত-বিচারে অবলম্বিত হইবার বাধা নাই। বিশেষতঃ বেদান্ত-প্রতিপাদ্য ব্রহ্মজ্ঞান যখন হৃদয়ে লগ্ন হওয়া প্রয়োজন, তখন তর্ক ও যুক্তি বিনা তাদৃশ হৃদয়গত অনুভব ও অবধারণ হয় না। শিষ্যেরা কেবল শ্রুতি উচ্চারণ বা কণ্ঠস্থ করিয়া শ্রুত্যর্থ হৃদয়ঙ্গম করিতে পারে না। সুতরাং তাদৃশ হৃদয়ঙ্গম-কার্য্যে শ্রুত্যর্থের স্ফুটতা নিমিত্তে তর্ক, যুক্তি প্রভৃতি পুরুষ বুদ্ধির সাহায্য প্রয়োজন।

১৩। কিন্তু যাগ যজ্ঞাদি ক্রিয়া কর্ম্মে বেদ-মন্ত্রের তাদৃশ হৃদয়-স্পর্শী স্ফুটতার প্রয়োজন নাই। সেরূপ স্থলে মন্ত্রোচ্চারণ পূর্ব্বক পদ্ধতি শেষ করিতে পারিলেই হয়। কঠোপনিষদে পঞ্চমী বল্লীতে ঋগ্বেদীয় চতুর্থ মণ্ডলের চত্বারিংশ অনুবাকের পঞ্চম সূক্তের একটি যজ্ঞীয় মন্ত্র আছে, যথা

"হংসঃ শুচি সদ্বসুরন্তরিক্ষসদ্ধোতা বেদিষদতিথির্দুরোণসৎ নৃষদ্বরসদৃতসদ্ব্যোম-সদব্জা গোজা ঋতজা ঋতং বৃহৎ।"

যজ্ঞানুষ্ঠান-কালে অর্থজ্ঞান বা তাহার গভীর তাৎপর্য্য হৃদয়ে ধারণ না করিয়াও পুরোহিত ঐ মন্ত্র পাঠ করিতে পারেন। কেন না, নিয়ম-রক্ষা বা ফল-কামনা উদ্দেশ করিয়া যত যজ্ঞ অনুষ্ঠিত হয় তাহাতে পদ্ধতি অনুসারে মন্ত্রগুলি পাঠ করাই প্রয়োজন। তাহার তাৎপর্য্য হৃদয়ে ধারণ প্রয়োজন নহে। অতএব উক্ত হইয়াছে যে ধর্ম্ম-জিজ্ঞাসায় কি না কর্ম্মকাণ্ডে পুরোহিত ও যজমানগণ বেদের দাসত্ব করেন। বেদে যাহা আছে বিনা তর্কে, বিনা যুক্তিতে, বিনা বোধে তাহাই পাঠ করিয়া থাকেন। সে জন্য ধর্ম্ম-ক্রিয়ায় বেদই একমাত্র প্রমাণ। সেখানে তর্ক, যুক্তি, বিচার, অনুমান প্রভৃতির প্রবেশাধিকার নাই। মানবের অন্তঃকরণের যে ভাবটি ঐ প্রকার ক্রিয়ায় আধিপত্য করে তাহা প্রবৃত্তি ও কামনা মাত্র। তাহা বুদ্ধি যুক্তি বা অনুভব নহে। কিন্তু

"অনুভবাবসানত্বাদ্ভবস্তুবিষয়ত্বাচ্চ ব্রহ্মবিজ্ঞানস্য"

নিত্য বস্তু বিষয়ক জ্ঞান অনুভবেতেই পর্য্যবসিত হয়। ব্রহ্ম-জ্ঞান অনুভবেতেই লীন হইয়া থাকে। ব্রহ্মজিজ্ঞাসু ব্যক্তি তাৎ-পর্য্য গ্রহণ ব্যতীত বেদমন্ত্র ধারণ করেন না। যখন কর্ম্মাধিকারে উপরি উক্ত "হংসঃ শুচি সদ্বসু" ইত্যাদি মন্ত্র পাঠ দ্বারা কর্ম্মী ক্রিয়া সম্পন্ন করেন তখন তাদৃশ মন্ত্রকে "বেদ" মাত্র বলা যায়। আর জ্ঞানাধিকারে যখন ব্রহ্মজিজ্ঞাসু তাহার প্রত্যেক অক্ষর ভেদ পূর্ব্বক ব্রহ্মরূপ পরম তাৎপর্য্যকে হৃদয়ে ধারণ করেন তখন ঐ বাক্যটীকে বেদান্ত কহা যায়। তাদৃশ জ্ঞানাধিকারে ঐ রূপ বচনের বৈদিক কর্ম্ম-সাধকরূপ মন্ত্রত্বের অন্ত হওয়ায় তাহা বেদান্ত বাক্য রূপে পরিগণিত হয়। উক্ত বাক্যের বৈদান্তিক অর্থ। যথা— "হংস" গচ্ছতি—পরমাত্মা সর্ব্বত্রগামী, "শুচিষৎ" শুচৌ দিবি আদিত্যাত্মনা সীদতীতি, তিনি সূর্য্যরূপে কি না সূর্য্যের বরণীয়

রূপে আকাশে গমন করেন, তিনি 'বসুঃ' বাসয়তি সর্ব্বানিতি, তিনি সকলকে আপনাতে বাসস্থান দেন 'অন্তরীক্ষসৎ' বায্বাত্মনা অন্তরীক্ষে সীদতীতি, তিনি বায়ুরূপে কি না বায়ুর নিয়ামকরূপে অন্তরীক্ষে গমনাগমন করেন। তিনি "হোতা" কিনা অগ্নির স্বরূপ হয়েন অর্থাৎ তিনি অগ্নির প্রভাব স্বরূপ। "বেদিসৎ" বেদ্যাং পৃথিব্যাং সীদতীতি, তিনি পৃথিবীর অধিষ্ঠাত্রী দেবতা হইয়া তাহার সর্ব্বত্র ব্যাপ্ত হয়েন। "অতিথির্দুরোণসৎ" অতিথিঃ সোমঃ ব্রাহ্মণঃ অতিথি-রূপেণ বা দ্রোণে কলশে বা দুরোণেষু যজ্ঞ-গৃহেষু সীদতীতি। তিনি সোমরস স্বরূপে যজ্ঞ-কলশে গমন করেন অর্থাৎ সেই রসে তিনিই প্রতিষ্ঠিত, অথবা ব্রাহ্মণ ও অতিথি রূপে তিনি যজ্ঞগৃহে আগমন করেন। তাৎপর্য্য এই যে ব্রহ্মনিষ্ঠ জনের ও অতিথির প্রভাব তিনিই। "নৃষৎ" তিনি নরেতে, "বরসৎ" তিনি দেবতাতে, "ঋতসৎ" তিনি যজ্ঞেতে অথবা সত্যেতে, "ব্যোমসৎ" তিনি আকাশে অধিষ্ঠাত্রী দেবতারূপে বাস করেন। তিনি 'অব্জা' শঙ্খ শুক্তি মকরাদি রূপে জলেতে জন্মেন, অর্থাৎ তাহাদের উৎপত্তির সঙ্গে সঙ্গে অন্তর্যামীরূপে উৎপন্ন হন। 'গোজা' পৃথিবীতে অন্নরূপে উৎপন্ন হন, অর্থাৎ তিনিই অন্নের মহিমা-স্বরূপ এবং অধিষ্ঠাত্রী দেবতা। 'ঋতজা' তিনি যজ্ঞের অঙ্গরূপে উৎপন্ন হন। স্বধা, স্বাহা, মন্ত্র, আজ্য, অগ্নি, আহুতি, দক্ষিণা ইত্যাদি যত যজ্ঞাঙ্গ আছে সমস্তই তাঁহাকে প্রতিপাদন করে, সকলই তাঁহার উদ্দেশে। ঐ সমস্ত যজ্ঞাঙ্গে তিনি প্রতিষ্ঠিত থাকাতে তাঁহাকে তত্তৎ স্বরূপ কহা যায়। তিনি 'অদ্রিজা' তিনি পর্ব্বত হইতে গঙ্গা, যমুনা, গোদাবরী, সরস্বতী, নর্ম্মদা, সিন্ধু, কাবেরী প্রভৃতি নদ্যাদিরূপে জন্ম গ্রহণ করেন, অর্থাৎ তাহাদের অধিষ্ঠাত্রী দেবতা হয়েন। এইরূপ তিনি সর্ব্বস্বরূপ হয়েন অথচ তাঁহার বিকার নাই "ন বভূব কশ্চিৎ" নিজে কোন বস্তু হন নাই। তিনি "ঋতং" অবিতথ-স্বভাব এবং "বৃহৎ" সকলের কারণ

মহান্ আত্মা। ইনিই সর্ব্ব পদার্থে সত্য-স্বরূপ সকলের প্রাণস্বরূপ জীবন-স্বরূপ অন্তরাত্মা স্বরূপ এবং অধিষ্ঠাত্রী দেবতা স্বরূপ। ভুত-মাত্র উপাধিকে তিরস্কার পূর্ব্বক ব্রহ্মজ্ঞানী সর্ব্বত্রবাসী সর্ব্বত্রোৎপন্ন সেই অখণ্ডৈকরসস্বভাব ব্রহ্মকে সর্ব্বাত্মা স্বরূপে হৃদয়ে উপলব্ধি করেন। অতএব কর্ম্মকাণ্ডের ন্যায় ব্রহ্মজিজ্ঞাসায় বেদ-মন্ত্রের পাঠ-মাত্র আদরণীয় বা ফলপ্রদ নহে। তাহা হইলে এই পুণ্য-ভূমি ভারতবর্ষে এপর্য্যন্ত একজন ব্রহ্মজ্ঞানীও আবির্ভূত হইতেন না। অথবা মন্ত্রের পাঠ মাত্রে ব্রহ্মজ্ঞান জন্মিলে বঙ্গদেশের দুর্গোৎসবে ব্রতী পুরোহিত ও যজমানগণ এতদিনে ব্রহ্মজ্ঞানী হইতেন। ব্রহ্ম-জ্ঞান-সাধনে মন্ত্র-পাঠেই কার্য্যোদ্ধার হয় না, মন্ত্রার্থ বুঝা ও হৃদয়ঙ্গম করা চাই। অনুভব করিতে গেলে শ্রুতির যে হৃদয়ঙ্গম করাইবার দিকে বৈদান্তিক উদ্দেশ্য তদনুকূল তর্ক, যুক্তি বিচারাদি সকলেরই সহায়তা প্রয়োজন।

১৪। শাঙ্কর ভাষ্যে আছে,

"শ্রুত্যাদয়োঽনুভবাদয়শ্চ যথাসম্ভবমিহ প্রমাণং"

ব্রহ্মজিজ্ঞাসায় শ্রুতি ও অনুভব উভয়ই প্রমাণ। ধর্ম্মজিজ্ঞাসার ন্যায় কেবল অন্ধ-স্বরূপ বেদ মাত্র প্রমাণ নহে। অর্থাৎ বেদের পাঠমাত্র ভাগকে এবং তাহাতে যে লোকের অন্ধ শ্রদ্ধা আছে সেই অংশকে ত্যাগ করিলে তাহার যে হৃদয়ঙ্গমনিষ্ঠতা থাকে ব্রহ্মজ্ঞানে তাহাই প্রমাণ, সুতরাং ব্রহ্মজ্ঞানে বেদ ও হৃদয় উভয়ই প্রমাণ। প্রসিদ্ধ বস্তু যে ব্রহ্ম বেদেতে তাঁহারই প্রতিষ্ঠা, হৃদয়েতেও তাঁহারই প্রতিষ্ঠা। বেদ ও তদবিরোধী তর্ক যুক্ত্যাদি দ্বারা এবং যিনি জগ-তের জন্ম-স্থিতি-ভঙ্গাদির কারণ তিনি আত্মারূপে জীবেতে বাস করেন এই বোধ দ্বারা বেদ ও জগৎরূপ ঐশ্বর্য্য হইতে মুক্ত হইয়া জীব সেই প্রসিদ্ধ তত্ত্বকে আপনাতেই লাভ করেন। সেই লব্ধ ব্রহ্মজ্ঞান প্রকৃত প্রস্তাবে উক্ত হৃদয়-নিহিত পুরাতন সিদ্ধ বস্তুর

অধীন। তাহা তর্কানুমানের রচনা নহে, বেদেরও পরতন্ত্র নহে, সৃষ্টি স্থিত্যাদি কারণ-বাদরূপ যুক্তিরও অধীন নহে। যজ্ঞাদির ব্যবস্থা বেদের অধীন বটে এবং যজ্ঞাদি করা পুরুষ-প্রবৃত্তির অধীন, কিন্তু সত্য ঈশ্বরের যজ্ঞাদিতে যে আবির্ভাব আছে তাহার যদি প্রত্যক্ষানুভব হয় তবে সে অনুভব-রূপ জ্ঞানকে আর বেদের বা পুরুষ-প্রবৃত্তির অধীন বলা যাইতে পারে না। তাহাকে হৃদয়-নিহিত ব্রহ্মরূপ বস্তু-পরতন্ত্র বলিতে হইবে। তাহা ব্রহ্মরূপ বস্তুরই আশ্রিত, বেদ তাহার সংবাদ দেন মাত্র কিন্তু জনক বা কারণ নহেন। যজ্ঞাদি সেই জ্ঞানকে স্মরণ করিয়া দিতে পারেন, কিন্তু জন্ম দিতে পারেন না। জগজ্জন্মাদি-কারণ-বাদরূপ যুক্তি সেই জ্ঞানলাভে সাহায্য করিতে পারে কিন্তু উৎপত্তি করিতে পারে না। যেমন যজ্ঞাদি করা পুরুষ-প্রবৃত্তির অধীন সেইরূপ কোন তত্ত্বকে কর্ম্মকাণ্ডে রূপান্তরে ভাবনা করাও পুরুষপ্রবৃত্তির অথবা বিধির অধীন। তোমার ফলাশা পূরণার্থ প্রবৃত্তি বশতঃ বেদ-বিধি-অনুযায়ী তুমি একটি কুশ-তৃণকে ব্রাহ্মণ মনে করিতে পার, কিন্তু সেরূপ মনে করা কুশ বিষয়ক তত্ত্বজ্ঞান নহে। ভ্রমস্থলেও তুমি এক বস্তুকে অন্য বস্তু বোধ করিতে পার। তাদৃশ ভ্রম-জ্ঞানও কেবল কর্ত্তৃতন্ত্র জ্ঞানমাত্র। তাহা বস্তুতন্ত্র জ্ঞান নহে। যথা তুমি ভ্রমে একটা স্থাণুকে চোর বা প্রেত জ্ঞান করিতে পার। একজন চোরকেও একটা স্থাণু বলিয়া মনে করিতে পার। স্থাণুতে যে চোর বা প্রেত-জ্ঞান তাহা স্থাণুপরতন্ত্র নহে। চোরে যে স্থাণু-বোধ তাহাও চোরাশ্রিত জ্ঞান নহে। এই প্রকারের ক্রিয়া, ধ্যান বা ভ্রমজ্ঞান তোমারই চিত্ত-ব্যাপারাধীন। কিন্তু বস্তুর যথার্থ জ্ঞান তদ্রূপ নহে। তাহাকে মন বা বুদ্ধি কোনরূপ বিধি প্রবৃত্তি বা ভ্রম-জন্য রচনা করে না, শাস্ত্রও তাহাকে জন্ম দেয় না। তাহা একমাত্র বস্তু-পরতন্ত্র, বস্তু হইতেই প্রকাশিত হয়। মনোবুদ্ধি কেবল

তাহার অভিজ্ঞাপক মাত্র কিন্তু কারণ নহে। স্থাণুতে স্থাণু-জ্ঞানই স্থাণুর তত্ত্বজ্ঞান। চোর বা প্রেত-জ্ঞান স্থাণু-বিষয়ক তত্ত্বজ্ঞান নহে। ব্রহ্মেতে ব্রহ্মজ্ঞানই ব্রহ্মজ্ঞান। ব্রহ্মকে অন্য কিছু জ্ঞান বা অন্য কিছুকে ব্রহ্মজ্ঞান ব্রহ্মজ্ঞান-শব্দের বাচ্য নহে। হৃদয়ঙ্গম করিয়া জীবের আত্মারূপে ব্রহ্মের যে জ্ঞান পাওয়া যায় তাহাই প্রত্যক্ষ ব্রহ্মজ্ঞান, প্রত্যক্ষ না হইলে তাহাকে ব্রহ্মজ্ঞান বলিব না। যিনি সৃষ্টির কর্ত্তা তিনি ব্রহ্ম, এরূপ বোধও যুক্তি ও অনুমান পরতন্ত্র। সে ব্রহ্ম নরবুদ্ধির রচনা। সে বোধে তিনি তৃতীয় পুরুষরূপে লক্ষিত হন মাত্র কিন্তু প্রত্যক্ষ হন না, কেবল আত্মার অন্তরাত্মা রূপেই তিনি প্রত্যক্ষ হইয়া থাকেন।

১৫। পূর্ব্বে উক্ত হইয়াছে যে অনেক পদার্থকে সৃষ্টি-স্থিতি ভঙ্গের হেতু বোধ করা যাইতে পারে। কেহ প্রকৃতিকে, কেহ অন্নকে, কেহ প্রাণকে, কেহ মনকে, কেহ বা বুদ্ধিকে সৃষ্টি-স্থিতি-ভঙ্গের কারণ ব্রহ্ম বলিতে পারেন। শাস্ত্রেও পরমেশ্বরের বিভূতি-দৃষ্টিতে অনেক স্থলে সেরূপ বলিয়াছেন। কিন্তু সকলের সে দৃষ্টি নাই। সুতরাং বিভূতি পরিত্যাগ করিয়া, ব্রহ্মের সর্ব্বাত্মভাব হৃদয়ঙ্গম না করিয়া, কেহ কেহ ঐ সকল ভূতমাত্রোপাধিকে ব্রহ্ম বলিতে পারেন। যে জ্ঞান হইতে তাঁহারা সেরূপ বলেন তাহা ব্রহ্মজ্ঞান নহে। তাহা তাঁহাদের বুদ্ধি ও কল্পনার রচনা। তাহাকে পুরুষ-বুদ্ধি-পরতন্ত্র বলা যায়। ব্রহ্মরূপ-বস্তু-পরতন্ত্র নহে। সেরূপ জ্ঞান জীবরূপ-কর্ত্তৃ-পরতন্ত্রমাত্র—কর্ম্মপদ-স্বরূপ ব্রহ্ম-পরতন্ত্র নহে। ব্রহ্মের সহিত সে জ্ঞানের সম্বন্ধ নাই—কর্ত্তার বুদ্ধ্যাদির সহিতই তাহার সম্বন্ধ। যদি জীবের আত্মা-স্বরূপে, জাজ্বল্যমান জীবন-স্বরূপে, জাগ্রত প্রাণ-স্বরূপে এবং ভক্তবৎসল পিতা-স্বরূপে হৃদয়-ধামে তাঁহাকে অনুভব করিতে না পারা যায়, তবে উপরি-উক্ত প্রকারের জ্ঞান বা বিশ্বাসের মূলে ঐরূপ অন্ন প্রাণাদি কোন ব্রহ্মকে কোটি বর্ষ উপাসনা করিলেও

ব্রহ্মজ্ঞান জন্মিবে না। কিন্তু সত্য ও সিদ্ধ-বস্তু-স্বরূপ পরমাত্মাকে জীবন ও রসস্বরূপে অনুভব হইলেই প্রবৃত্তির কার্য্য যজ্ঞাদি এবং বুদ্ধির কার্য্য তর্ক নিশ্চয়াদি নিবৃত্ত হইয়া যায়। পুরুষ-বুদ্ধি যদিও শ্রুতির সহায় হইয়া জীবকে আত্ম-স্বরূপ ব্রহ্মানুভব করায় কিন্তু সেই ব্রহ্মরূপ প্রসিদ্ধ বস্তুর যথার্থ জ্ঞান তাদৃশ বুদ্ধ্যাদির রচনা নহে। তাহা স্বয়ম্প্রকাশ ও সেই পরম বস্তুরই পরতন্ত্র। ব্রহ্মরূপ বস্তুই ব্রহ্মজ্ঞানের আশ্রয়-ভূমি। সেই জ্ঞান জীবের অনুভব বা আত্ম-প্রত্যয়-সিদ্ধ। অর্থাৎ আত্মানুভব রূপ জ্ঞান ব্রহ্মকে জানায় মাত্র কিন্তু তাঁহাকে উৎপত্তি করে না। ঠিক্ তদ্রূপ যেমন যথার্থ দৃষ্টি স্থাণুকে স্থাণুরূপেই দেখায় কিন্তু জন্ম দেয় না। ব্যভিচারিত দৃষ্টি বশতঃ মনোবুদ্ধি যেমন স্থাণুর অবলম্বনে চোর বা প্রেতকে জন্ম দেয়, সেইরূপ হৃদয়ে দৃষ্টি-বিরহিত মনোবুদ্ধিরা নানা ব্রহ্ম ও নানা যজ্ঞ সৃষ্টি করিয়া প্রকৃত অনুভবসিদ্ধ ব্রহ্মকে আচ্ছাদন করে। অতএব হৃদয়ে দৃষ্টি শিক্ষা দিবার নিমিত্তেই বৈদান্তিক প্রস্থানের অভ্যুদয়। বেদান্ত-বাক্য সকলের হৃদয়-গ্রাহিতা সংস্থাপন করণোদ্দেশে মহর্ষি ব্যাসদেব তৎসমূহকে সূত্রে গ্রথিত করিয়া বিচার করিয়াছেন। তিনি বেদান্তবাক্য সকলকে কোনরূপ বাহ্য বা মানসিক ধর্ম্মক্রিয়ার্থেও যোজনা করেন নাই এবং বেদবাক্য ছাড়িয়া কেবল যুক্তির হারও রচনা করেন নাই।

১৬। শ্রীমান শঙ্করাচার্য্য কহিয়াছেন,

"তস্মাজ্জন্মাদিসূত্রং নানুমানোপন্যাসার্থং, কিং তর্হি বেদান্তবাক্য প্রদর্শনার্থং।"

এই জন্মাদি সূত্রটি অনুমান অর্থাৎ যুক্তি ও তর্কাদি উপন্যাসার্থ রচিত হয় নাই। কেবল বেদান্ত-বাক্যের প্রতিপাদ্য হৃদয়-নিহিত প্রসিদ্ধ আত্মাকে পঞ্চকোষ ভেদ পূর্ব্বক যুক্তি ও বিচার দ্বারা দেখাইবার জন্যই রচিত হইয়াছে। এই সূত্রে যে বেদান্তবাক্য

লক্ষিত আছে তাহার নাম "বারুণী বিদ্যা"। তাহা তৈত্তিরীয় শ্রুতির ভৃগুবল্লীতে, ভৃগুবরুণ সম্বাদে প্রকাশ আছে। সূত্রের মর্ম্ম-সমাহারের নিমিত্তে এস্থলে তৎপ্রকরণ-গত তাৎপর্য্য দেওয়া যাইতেছে। ভৃগু স্বীয় পিতা বরুণের নিকট গমন পূর্ব্বক কহিলেন, হে ভগবন্! আমাকে ব্রহ্ম কি বুঝাইয়া দিন। বরুণ তাঁহাকে কহিলেন,

"যতোবা ইমানি ভূতানি জায়ন্তে। যেন জাতানি জীবন্তি যৎপ্রয়ন্ত্যভিসম্বি-শন্তি। তদ্বিজিজ্ঞাসস্ব। তদ্‌ব্রহ্মেতি।"

যাঁহা হইতে এই ভূত সকল উৎপন্ন হয়, উৎপন্ন হইয়া যাঁহার দ্বারা জীবিত রহে এবং প্রলয়-কালে যাঁহার প্রতি গমন করে ও যাঁহাতে প্রবেশ করে তাঁহাকে বিশেষরূপে জানিতে ইচ্ছা কর তিনি ব্রহ্ম। এই শ্রুতিতে ব্রহ্মের স্বরূপ-লক্ষণ নাই। ইহাতে কেবল তটস্থ-লক্ষণ দ্বারা ব্রহ্মকে লক্ষ্যমাত্র করিতেছেন। ব্রহ্ম কি তাহা বলিলেন না। কিন্তু বলিয়া রাখিলেন "তদ্বিজিজ্ঞাসস্ব" বিশেষেণ জ্ঞাতুমিচ্ছস্ব—তাঁহাকে বিশেষরূপে অর্থাৎ হৃদয়ের দ্বারা জানিতে ইচ্ছা কর। সামান্যরূপে জানিলে তাঁহাকে বুঝা যাইবে না।

১৭। পিতার বাক্য গ্রহণ পূর্ব্বক ভৃগু তপস্যা করিতে লাগি-লেন। অর্থাৎ নিয়ম পূর্ব্বক চিন্তা ও সন্ধান করিতে লাগিলেন যে, যাঁহা হইতে সর্ব্বভূত জন্মগ্রহণ করে—জন্মিয়া জীবিত রহে, এবং যাঁহাতে অন্তে লীন হয় তিনি কি রূপ? কিন্তু ভূমি, ধান্য, সুন্দর ও বলিষ্ঠ স্থূল দেহ, পুত্র ও বিত্ত প্রভৃতি ভোগকামনাশীল মূঢ়েরা যেমন মনোবৃত্তি বা ধর্ম্মপ্রবৃত্তির উন্নতি ত্যাগ করিয়া কেবল স্থূলদেহাভিমান ও ভোগ্য-বস্তুতেই আকৃষ্ট হয় সেইরূপ ভৃগু প্রথ-মেই অন্নের মহিমা কর্ত্তৃক আকৃষ্ট হইলেন। অন্ন শব্দে সমস্ত ভোগ্য বস্তু। পৃথিবীর সহিত পঞ্চ স্থূল ভূত, তদুৎপন্ন ফলশস্য

এবং রুধির মাংসাদির আধার স্থূল জীবদেহ সকলই অন্ন শব্দের বাচ্য। এই বেদান্তমীমাংসা শাস্ত্রে (২ অঃ ৩ পাঃ ১২ সূঃ) মহর্ষি ব্যাসদেব মীমাংসা করিয়াছেন "পৃথিব্যধিকাররূপ শব্দান্তরেভ্যঃ" অন্ন শব্দে স্থূল পৃথিবীই, ফলশস্য ও স্থূল দেহ গ্রহণ করিলেও কার্য্যকারণ-লক্ষণায় সেই পৃথিবীই মুল অন্ন। বিশেষতঃ বেদে নিরূপণ করিয়াছেন যে, পরমাত্মা হইতে সূক্ষ্ম প্রপঞ্চাদিক্রমে স্থূল আকাশ, আকাশ হইতে বায়ু, বায়ু হইতে অগ্নি, অগ্নি হইতে জল, জল হইতে পৃথিবী, পৃথিবী হইতে উদ্ভিজ্জ, উদ্ভিজ্জ হইতে অন্ন, অন্ন হইতে শুক্র, শুক্র হইতে পুরুষ উৎপন্ন হয় "সবাএষ পুরুষোঽন্নরসময়ঃ।" সেই পুরুষ অন্নরসের বিকার অর্থাৎ স্থূলদেহের অভিমানী।

"অন্নাদ্বৈ প্রজাঃ প্রজায়ন্তে। যাঃ কাশ্চ পৃথিবীং শ্রিতাঃ অথো অন্নেনৈব জীবন্তি। অথৈনদপি যন্ত্যন্ততঃ অন্নং হি ভূতানাং জ্যেষ্ঠং।"

তৈত্তিরীয় শ্রুতির ব্রহ্মবল্লীতে অন্নকেই সকলের কারণ, সকলের প্রতিপালক ও গম্য স্থান বলিয়াছেন, অর্থাৎ পৃথিবীরূপ অন্ন হইতেই ভূত সকল জন্মগ্রহণ করে, তাহার দ্বারা জীবিত রহে এবং অন্তকালে সেই পৃথিবীতেই লয় প্রাপ্ত হয়। কিন্তু শ্রুতির এইরূপ উপদেশের একদেশ গ্রহণ করিলে চলে না। সমস্ত প্রকরণের আদ্যন্ত দেখিতে হয়। দেখিয়া শ্রুতির তাৎপর্য্য গ্রহণ করিলে জানা যায় যে, অন্ন সর্ব্বভূতের মুল কারণ প্রতিপালক বা শেষ গতি নহে। অন্ন যাঁহা হইতে অব্যবহিত রূপে প্রকটিত হইয়াছে এবং সেই পদার্থ যাঁহা হইতে আসিয়াছে ইত্যাদি পরম্পরা-ক্রম ভেদ পূর্ব্বক সুক্ষ্ম প্রপঞ্চের ও প্রকৃতির উর্দ্ধে উঠিলে জানা যায় যে, সকলের মুল ও শেষগতি এক জন আছেন। তিনিই জিজ্ঞাসার বিষয় ব্রহ্ম। কিন্তু যে সকল মূঢ় জন এই সংসারে স্থূল দেহ ও তাহার উপাদান

যথোক্ত-লক্ষণ অন্নের জন্যই ব্যস্ত, বেদের সার মর্ম্ম এবং সমাহার কথা তাহাদের বুদ্ধিতে স্ফুর্ত্তি পায় না। সুতরাং তাহারা যে অন্নের মহিমায় আকৃষ্ট তাহাকেই জন্ম-স্থিতি-ভঙ্গের কারণ এবং গতি মুক্তি বলিয়া জানে এবং শ্রুতিবাক্যের আরম্ভ ও সমাহার বর্জন পূর্ব্বক তাহার যে অংশে আপনাদের প্রিয় অন্নের গুণবাদ আছে তাহাকেই প্রমাণরূপে গণ্য করে। এই নিয়মানুসারে ভৃগু বিভ্রমোহে বিমূঢ় হইয়া জানিলেন,

"অন্নং ব্রহ্মেতি—অন্নাদ্ধ্যেব খল্বিমানি ভূতানি জায়ন্তে, অন্নেন জাতানি জীবন্তি, অন্নং প্রয়ন্ত্যভিসম্বিশন্তি"

অন্নই ব্রহ্ম, অন্ন হইতে ভূত সকল উৎপন্ন হয়, উৎপন্ন হইয়া অন্ন দ্বারা জীবিত রহে। এবং অন্তে অন্নেতেই (অর্থাৎ স্থূল প্রপঞ্চে) প্রবেশ করে। অন্নকে এইরূপে ব্রহ্ম বলিয়া জানিয়া ভৃগুর তৃপ্তি হইল না। অতএব পুনরায় পিতার নিকট আসিয়া ব্রহ্ম-জিজ্ঞাসু হইলেন। বরুণ তাঁহাকে কহিলেন,

"তপসা ব্রহ্ম বিজিজ্ঞাসস্ব।

তপস্যা দ্বারা ব্রহ্মকে জান।

১৮। পিতার বাক্যানুসারে ভৃগু তপস্যারম্ভ করিলেন। তদ্দ্বারা তিনি প্রাণকে ব্রহ্ম বলিয়া জানিলেন। প্রাণেতে যে পরমেশ্বরের বিভূতি আছে এস্থলে প্রাণ শব্দ তাহাকে প্রতিপাদন করে না। এস্থলে প্রাণ শব্দ নানাদেহস্থিত জীবনী-শক্তি-স্বরূপ প্রাণবায়ু সমূহকে প্রতিপন্ন করে। সেই ভৌতিক প্রাণই শরীরকে জীবিত রাখে। এবং তাহা জীবের সূক্ষ্ম দেহের অঙ্গ স্বরূপ। যেমন কতকগুলি লোক অন্ন শব্দের বাচ্য পৃথিবী ধন ধান্য দেহ প্রভৃতি লইয়া বিমূঢ়, সেইরূপ কতিপয় লোক প্রাণ শব্দের বাচ্য স্বাস্থ্যরক্ষা প্রভৃতি লইয়া উন্মত্ত। তাঁহারা মনে করেন প্রাণই সর্ব্বস্ব। বিশেষতঃ প্রশ্নোপনিষদে এই প্রাণের বিস্তর স্তুতিবাদ আছে।

"অরাইব রথনাভৌ প্রাণে সর্ব্বং প্রতিষ্ঠিতং। ঋচোযজুংষি সামানি যজ্ঞঃ ক্ষত্রং ব্রহ্ম চ॥"

রথচক্রের নাভিদেশে অর সকলের ন্যায় সমুদায় ব্রহ্মাণ্ডই প্রাণে প্রতিষ্ঠিত আছে। ঋক্, যজু, সাম, যজ্ঞ, ক্ষত্র, ও ব্রাহ্মণ এ সকলই প্রাণে প্রতিষ্ঠিত রহিয়াছে।

"প্রজাপতিশ্চরসি গর্ভে ত্বমেব প্রতিজায়সে।"

হে প্রাণ! তুমি প্রজাপতি হইয়া গর্ভমধ্যে বিচরণ কর। পিতা মাতার প্রতিরূপ হইয়া তুমিই জন্মগ্রহণ কর।

"ইন্দ্রস্ত্বং প্রাণ তেজসা রুদ্রোসি পরিরক্ষিতা।"

তুমি তেজেতে ইন্দ্র-স্বরূপ, সংহারে রুদ্র, এবং পালয়িতা।

"প্রাণস্যেদং বশে সর্ব্বং ত্রিদিবে যৎপ্রতিষ্ঠিতং।"

ত্রিজগতে যাহা কিছু পদার্থ আছে, সমুদায়ই প্রাণের বশে বর্ত্তমান রহিয়াছে। এইরূপে প্রাণের সৃষ্টি-স্থিতি-সংহার-কর্ত্তৃত্ব বর্ণন করিয়া ঐ উপনিষদেই বাক্য-শেষে সমাহার করিয়াছেন,

'আত্মন এষ প্রাণোজায়তে। যথৈষা পুরুষে ছায়ৈতস্মিন্নেতদাততং।'

পরমাত্মা হইতে এই প্রাণ জন্মেন, যেমন পুরুষের ছায়া উৎপন্ন হয় তাহার ন্যায় পরব্রহ্মোতেই প্রাণ প্রকাশিত রহিয়াছে।

"বিজ্ঞানাত্মা সহদেবৈশ্চ সর্ব্বৈঃ প্রাণা ভূতানি সংপ্রতিষ্ঠন্তি যত্র।
তদক্ষরং বেদয়তে যস্তু সৌম্য স সর্ব্বজ্ঞঃ সর্ব্বমেবাবিবেশ॥"

বিজ্ঞানাত্মা জীব 'দেবৈঃ' ইন্দ্রিয়গণ ও তৎসহ প্রাণ সকল ও পৃথিব্যাদি ভূত সকল যে অক্ষর ব্রহ্মোতে প্রতিষ্ঠিত আছে, হে সৌম্য! সেই অক্ষরকে যিনি জানেন তিনি সর্ব্বজ্ঞ হইয়া সর্ব্বত্র প্রবেশ করিতে পারেন। "সপ্রাণমসৃজত" তিনি প্রাণকে সৃষ্টি করিয়াছেন।

'অরাইব রথনাভৌ কলা যস্মিন্ প্রতিষ্ঠিতাঃ।
তং বেদ্যং পুরুষং বেদ যথা মা বো মৃত্যুঃ পরিব্যথা।'

রথচক্রের নাভিদেশে অর সকলের ন্যায় যাঁহাতে প্রাণাদি কলা সকল প্রতিষ্ঠিত রহিয়াছে, সেই বেদ্য পুরুষকে জান, যাহাতে মৃত্যু তোমাদিগকে ব্যথা দিতে না পারেন। কঠোপনিষদেও কহিয়াছেন,

"ন প্রাণেন নাপানেন মর্ত্ত্যোজীবতি কশ্চন।
ইতরেণ তু জীবন্তি যস্মিন্নেতাবুপাশ্রিতৌ॥"

প্রাণ বা অপান দ্বারা মর্ত্ত্য জীবিত থাকে এমত নহে, কিন্তু অন্য একজন দ্বারা জীবিত থাকে, যাঁহাতে প্রাণ ও অপান উভয়েই আশ্রিত হইয়া আছে। মুণ্ডকে কহিলেন "প্রাণোহ্যেষ যঃ সর্ব্বভূতৈর্ব্বিভাতি।" এই পরমেশ্বরই মূল প্রাণ যিনি সর্ব্বভূতে প্রকাশ পাইতেছেন।

'গতাঃ কলাঃ পঞ্চদশপ্রতিষ্ঠা দেবাশ্চ সর্ব্বে প্রতি দেবতাসু।'

মোক্ষকালে দেহারম্ভিকা পঞ্চদশ কলা কিনা প্রাণ, আকাশ, বায়ু, জ্যোতিঃ, অপ, পৃথিবী, অন্ন, বীর্য্য, মন, ইন্দ্রিয়, কর্ম্ম, শ্রদ্ধা, তপঃ, লোক, নাম এই সকল স্বীয় স্বীয় কারণে প্রতিষ্ঠা লাভ করে। চক্ষুরাদি ইন্দ্রিয়দিগের আশ্রয়স্বরূপ আদিত্যাদি দেবগণের প্রভাব প্রতি দেবতাতে লীন হয়। এতাবতা বেদের সিদ্ধান্ত এই যে প্রাণ ব্রহ্ম নহে। সৃষ্টি স্থিতি প্রলয় প্রভৃতি যে সকল শক্তি দ্বারা স্থানে স্থানে প্রাণকে নির্দ্দেশ করিয়াছে তাহা লক্ষণা, গুণবাদ ও গৌণ কল্পনা মাত্র। কিন্তু মূঢ়েরা বেদের সিদ্ধান্ত-ভাগ-প্রতিপাদ্য পরমেশ্বরকে ত্যাগ করিয়া সামান্য প্রাণকেই বড় বলিয়া জানে এবং মনে করে তদ্ব্যতীত বিশ্বসৃজনাদির অন্য কারণ নাই। তাঁহাদের উক্তি এই যে,

"প্রাণোজাগর্ত্তি সুপ্তেষু প্রাণঃশ্রৈষ্ঠ্যাদিকং শ্রুতং।
(পঃ দঃ ৬। ৬৬)

সমুদয় নিদ্রিত হইলেও প্রাণ জাগ্রত থাকে।

'চক্ষুরাদ্যক্ষলোপেঽপি প্রাণসত্বে তু জীবতি।'
(ঐ ঐ ৬৫)

চক্ষুরাদি নষ্ট হইলেও প্রাণের সত্বাতে জীবিত থাকা যায়। এই নিয়মানুসারে ভৃগু স্বীয় বুদ্ধি ও বেদের অসিদ্ধান্ত ভাগ উপলক্ষ্য করিয়া স্বীয় তপস্যা দ্বারা স্থির করিলেন প্রাণই ব্রহ্ম।

'প্রাণাদ্ধ্যেব খল্বিমানি ভূতানি জায়ন্তে। প্রাণেন জাতানি জীবন্তি। প্রাণং প্রয়ন্ত্যভিসম্বিশন্তি॥''

প্রাণ হইতে এই ভূতসকল উৎপন্ন হয়, উৎপন্ন হইয়া প্রাণ দ্বারা জীবিত রহে এবং প্রলয়কালে প্রাণেতেই প্রবেশ করে। কিন্তু এইরূপ জ্ঞান লাভ করিয়া তাঁহার তৃপ্তি হইল না। অতএব পুনরায় পিতার নিকট আগমন পূর্ব্বক ব্রহ্মজ্ঞান ভিক্ষা করিলেন।

১৯। বরুণ স্বীয় পুত্র ভৃগুকে কহিলেন, তপস্যা কর, জানিতে যত্ন কর তবে জানিবে। এই আদেশানুসারে ভৃগু পুনর্ব্বার দৃঢ়ব্রত হইয়া অন্বেষণ করিলেন, কিন্তু সেবার তিনি আর একগ্রাম উর্দ্ধে উঠিয়া সমুদয় ইন্দ্রিয়-শক্তি-যুক্ত সূক্ষ্ম দেহের উত্তমাঙ্গ স্বরূপ মনকে ব্রহ্ম বলিয়া জানিলেন। এই প্রকার জানা অসম্ভব নহে। অবিবেকী লোকের নিকটে যুক্তি ও শাস্ত্রের অসিদ্ধান্ত অংশ অনুসারে সেরূপ বোধ হইয়া থাকে। শাস্ত্রে আছে "মনোব্রহ্মেত্যুপাসীত" মনই ব্রহ্ম, মনের উপাসনা করিবেক। বিশেষতঃ সৃষ্টিক্রিয়া উপলক্ষ্য করিয়া বেদান্ত শাস্ত্রে কহেন, সংকল্প-বিকল্পাত্মক অন্তঃকরণ-বৃত্তির নাম মন। ইচ্ছা, অহঙ্কার, বাসনা প্রভৃতি নানা বৃত্তি তাহার অন্তর্গত। মনই ইন্দ্রিয়গণকে বিষয়ে প্রবৃত্ত করে, এবং বুদ্ধিকে

অনুসন্ধান ও নিশ্চয়ে নিয়োজিত করে। বিশেষতঃ বৈদান্তিক আচার্য্যেরা এই প্রত্যক্ষ জগৎকে ব্রহ্মের সঙ্কল্প দ্বারা সৃষ্ট হইয়াছে বলিয়াও একটি সূক্ষ্ম সিদ্ধান্ত করিয়া থাকেন। তাঁহারা কহেন যে, যে শক্তি হইতে ব্রহ্মাণ্ড প্রসূত হইয়াছে, যাহা দ্বারা পালিত হইতেছে এবং যাহাতে অন্তে লয় পাইবে তাহা ব্রহ্মের পূর্ণ শক্তির এক বিন্দুমাত্র। ঐ বিন্দু মাত্র শক্তি এই সৃষ্টিতে প্রকাশিত। তাহার ওদিকে ব্রহ্মরূপ অনন্ত সাগর। ঐ বিন্দুমাত্র শক্তি যেন ঐ সাগরের তটস্বরূপ। এজন্য উহাকে বেদান্তশাস্ত্রে তটস্থা শক্তি কহে। ঐ তটস্থা শক্তিই সৃষ্টি-সংহার-কারিণী প্রকৃতি। সৃষ্ট্যাদি করাই তাঁহার স্বভাব। তাঁহারই সন্নিধান বশত তাঁহার বিকাশাদির সাধন নিমিত্তে ব্রহ্মের সঙ্কল্প হয়। নতুবা ব্রহ্মের সঙ্কল্প নাই। সেই সঙ্কল্পই ব্রহ্মেতে ঐশ্বর্য্য কল্পনা করে। তাহারই জন্য তাঁহাকে ঈশ্বর বলা যায়। অতএব সেই সঙ্কল্পই এই জগতের সৃষ্টি স্থিতি ভঙ্গের কারণ। তাহারই নামান্তর মহৎ অথবা মন। সুতরাং মনই জগতের সৃষ্টি-স্থিতি-সংহারক। কিন্তু মনই জগতের কর্ত্তা, ইহার উক্ত প্রকার মূল তাৎপর্য্য বিস্মৃত হইয়া অনেকে মনে করে যে, মানবের মনই বুঝি জগতের জন্ম-স্থিতি-ভঙ্গের কারণ। ফলে বেদান্ত শাস্ত্রে মনুষ্যের মনকেও জগতের জন্ম-স্থিতি-সংহারের কারণ বলেন; কিন্তু তাহার তাৎপর্য্য স্বতন্ত্র। তাহাতে উক্ত আছে যে, যেমন ঈশ্বরের কৃত বাহ্য জগৎ আছে, সেইরূপ জীব স্বীয় মন দ্বারা মনোময় জগৎ রচনা করেন। জীবের কৃত এই মনোময় জগতই জীবের বন্ধের কারণ। বাহ্য জগৎ বন্ধের কারণ নহে। কেননা ঈশ্বর-সৃষ্ট বাহ্য জগৎ একই স্বরূপে অবস্থিতি করে। যেমন কোন স্ত্রী। তিনি ঈশ্বর-সৃষ্ট স্ত্রীমাত্র। কিন্তু সাংসারিক সম্বন্ধাধীন মনের কল্পনাতে কেহ তাঁহাকে কন্যা, কেহ মাতা, কেহ বধূ, কেহ পত্নী ইত্যাদি মনে করে। যেমন স্বর্ণাদি ধন স্বভাবতঃ মূল্যবান নহে, কিন্তু মানবের

লোভ তাহাকে মুল্যবান করিয়া তুলে। * অতএব জগৎ ঈশ্বর কর্ত্তৃক যেরূপে সৃষ্ট হইয়াছে, মানবের বাসনা তাহার উপরি কোটি গুণ আকর্ষণ প্রক্ষেপ করিয়াছে। আজ তুমি বাসনা-বিবর্জিত হইয়া সর্ব্বত্যাগী হও কাল এই সৃষ্টিকে আর একরূপে দেখিবে, হয় তো আর দেখিতেও পাইবে না। অতএব মনই সৃষ্টি করে, মনই রক্ষা করে, আবার মনোনিবৃত্তি হইলেই সৃষ্টি থাকে না। যাঁহার মন বাসনাশূন্য ও নিবৃত্তি-প্রাপ্ত তাঁহার পক্ষে সৃষ্টি থাকা না থাকা দুই তুল্য। যাঁহার মনঃকল্পিত সৃষ্টির নাশ হয়, তিনি জগতের যে তত্ত্ব পান তাহা সৃষ্টি সংহারের অতীত। এতাবতা উপরি উক্ত তাৎপর্য্যে মনই সৃষ্টি স্থিতি ভঙ্গের কারণ। কিন্তু শাস্ত্রের তাৎপর্য্য এরূপ নহে যে, মূলতঃ মনুষ্যের মনই এই জাজ্বল্যমান বাহ্য জগৎ সৃষ্টি করিয়াছে। যাহা হউক, এমন লোক অনেক আছেন যাঁহারা দৃঢ়তররূপে বাসনার আধার-স্বরূপ মনেতেই বদ্ধ। তাঁহাদের উক্তি এই—

"অসত্যমপ্রতিষ্ঠন্তে জগদাহুরনীশ্বরং।
অপরস্পরসম্ভূতং কিমন্যৎ কামহেতুকং॥" (গীতা)

এই জগতের ধর্ম্ম ও ব্যবস্থারূপ কোন প্রতিষ্ঠা নাই। ইহা কেবল স্ত্রী পুরুষের মানসিক কাম জন্য সংযোগাধীন উৎপন্ন। অতএব কাম ব্যতীত ইহার উৎপত্তির আর কি কারণ থাকিতে পারে।

"কামমাশ্রিত্য দুষ্পূরং দম্ভমানমদান্বিতাঃ।
মোহাদ্‌গৃহীত্বাঽসদ্‌গ্রাহান্ প্রবর্ত্তন্তেঽশুচিব্রতাঃ॥" (ঐ)

সেই সকল দম্ভ-মান-মদান্বিত জনেরা দুষ্পূর কামনা আশ্রয় পূর্ব্বক মোহ বশতঃ প্রচুর ধনাদি লাভার্থ অশুচি-ব্রতে প্রবৃত্ত হয়। তাঁহারা জ্ঞান বিজ্ঞান কর্ত্তৃক নীয়মান না হইয়া কেবল সঙ্কল্প-

* অতিরিক্তপত্র সংখ্যা ২ দ্রষ্টব্য।

বিকল্পাত্মক মনের অধীন হইয়াই বিষয়-সুখে আকৃষ্ট, অভিমানে অন্ধ, শত শত আশায় তরঙ্গাকুলিত হন। অতএব মনই তাঁহাদের বিচরণের ক্ষেত্র। অপেক্ষাকৃত মূঢ়দিগের ন্যায় যদিও তাঁহারা কেবল অন্ন ও প্রাণ লইয়াই পরিতৃপ্ত নহেন, কিন্তু অপেক্ষাকৃত উচ্চপদবীস্থ বিজ্ঞানবাদীগণের ন্যায়ও বিজ্ঞান তাঁহাদের সাধনীয় নহে। তাঁহারা মন হইতেই অভিলাষানুরূপ সংসার সৃষ্টি করেন, তাহারই দ্বারা সে সৃষ্টি রক্ষা করেন, এবং অন্তে তাহাতেই তাঁহাদের যথাসর্ব্বস্ব লয় হইয়া যায়। মনেতে যে ঈশ্বরের বিভূতি আছে অথবা ধর্ম্মবুদ্ধি বা নিষ্কাম উপাসনা দ্বারা মনকে যে নিবৃত্ত করিতে হয়, সে দৃষ্টি তাঁহাদের নাই। তাঁহারা মনঃসম্বন্ধে শাস্ত্রের সিদ্ধান্ত ভাগ পরিত্যাগ করত তদীয় স্তুত্যর্থবাদসমূহকে আপনাদের লৌকিক মন-উপাসনার পোষকতায় গ্রহণ করিয়া থাকেন। মনের শ্রেষ্ঠত্ব সম্বন্ধে শাস্ত্রের এই সমস্ত অসিদ্ধান্ত অংশ ও লৌকিক দৃষ্টান্ত উপলক্ষ করিয়া ব্রহ্মজিজ্ঞাসু ভৃগু তৃতীয় তপস্যায় মনকেই সৃষ্টি-স্থিতি-সংহার-কর্ত্তা ব্রহ্মরূপে গ্রহণ করিলেন। তিনি কহিলেন,

> "মনসোহ্যেব খল্বিমানি ভূতানি জায়ন্তে।
> মনসা জাতানি জীবন্তি। মনঃ প্রয়ন্ত্যভিসম্বিশন্তি॥"

মন হইতেই এই ভূত সকল জন্মগ্রহণ করে, জন্মিয়া জীবিত রহে এবং অন্তে মনেতেই লয় পায়। কিন্তু শাস্ত্রের সিদ্ধান্ত এই যে, মনোনিবৃত্তি ব্যতীত ব্রহ্মের প্রত্যক্ষ জ্ঞান হয় না; সুতরাং প্রত্যক্ষ ব্রহ্মদর্শন না হওয়ায় তাঁহার তৃপ্তি হইল না।

২০। তিনি পুনরায় স্বীয় পিতা বরুণের নিকট উপস্থিত হইয়া ব্রহ্মজ্ঞানের প্রার্থী হইলেন। তাঁহার পিতা আবার কহিলেন তপস্যা কর। তাহাতে তপস্যা করিয়া তিনি বিজ্ঞানকে ব্রহ্ম বলিয়া জানিলেন। বেদান্তশাস্ত্রানুসারে বিজ্ঞান বুদ্ধি-শব্দের বাচ্য। অনুসন্ধান, সিদ্ধান্ত, নিশ্চয় প্রভৃতি বুদ্ধির কার্য্য। বুদ্ধিই মনের অভ্য-

ন্তর পদার্থ। অর্থাৎ বুদ্ধিই মনের সমস্ত কার্য্য সুচারুরূপে নির্ব্বাহ করিয়া দেয়। তাহা সূক্ষ্ম দেহের এক প্রধান অঙ্গ। তৈত্তিরীয় উপনিষদে ব্রহ্মবল্লীতে উক্ত হইয়াছে,

"তস্মাদ্বা এতস্মাৎ মনোময়াৎ। অন্যোঽন্তর আত্মা বিজ্ঞানময়ঃ।"

মনোময় আত্মা হইতে অতিরিক্ত অভ্যন্তর আত্মা বিজ্ঞানময়। অর্থাৎ জীবাত্মার স্থূলদেহের অভিমান, প্রাণাভিমান এবং ইন্দ্রিয় ও মনের অভিমান ত্যাগ হইলেও, অভ্যন্তরে বুদ্ধির অভিমান থাকে।

"বিজ্ঞানং দেবাঃ সর্ব্বে ব্রহ্ম জ্যেষ্ঠমুপাসতে। বিজ্ঞানং ব্রহ্মচেদ্বেদ। তস্মাচ্চেন্ন প্রমাদ্যতি। শরীরে পাপ্মনোহিত্বা সর্ব্বান্ কামান্ সমশ্নুত ইতি"

সকল দেবতা বিজ্ঞানকে শ্রেষ্ঠ বলিয়া ব্রহ্মরূপে উপাসনা করেন। বিজ্ঞানকে ব্রহ্ম জানিয়া তাহাতে অবহিত হইলে শারীরিক পাপ হইতে মুক্ত হইয়া সকল কামনা উপভোগ করে। অতএব শাস্ত্রানুসারে বিজ্ঞান যখন অবচ্ছেদাবচ্ছেদে অন্ন, প্রাণ, ও মনের অভ্যন্তরবর্ত্তী শ্রেষ্ঠ পদার্থ তখন বিজ্ঞানই সৃষ্টি স্থিতি ভঙ্গের কারণ ব্রহ্ম। ভৃগু কহিলেন,

'বিজ্ঞানাদ্ধ্যেব খল্বিমানি ভূতানি জায়ন্তে। বিজ্ঞানেন জাতানি জীবন্তি। বিজ্ঞানং প্রয়ন্ত্যভিসম্বিশন্তি।

বিজ্ঞান হইতে এই ভূত সকল উৎপন্ন হয়। উৎপন্ন হইয়া বিজ্ঞান দ্বারা জীবিত রহে এবং প্রলয়কালে বিজ্ঞানেতে গমন করে ও বিজ্ঞানেতেই প্রবেশ করে। ভৃগু এইরূপ সিদ্ধান্ত করিলেন। কিন্তু শাস্ত্রের প্রকৃত মর্ম্মের প্রতি দৃষ্টিপাত করিলেন না। কেননা তৈত্তিরীয় শ্রুতিতে অবশেষে কহিয়াছেন যে বিজ্ঞান ব্রহ্ম নহেন। কারণ বিজ্ঞান অপেক্ষা কারণদেহরূপিণী প্রকৃতি পরিপালিত আনন্দময় জীব শ্রেষ্ঠ। "ব্রহ্ম পুচ্ছং প্রতিষ্ঠা" ব্রহ্ম তাঁহার প্রতিষ্ঠা-স্বরূপ পুচ্ছ (আধার)। বিশেষতঃ ঐতরেয় শ্রুতিতে যে "প্রজ্ঞানং ব্রহ্ম" কহিয়াছেন

তাহার অর্থ এমত নহে, যে, মানবের প্রজ্ঞান অর্থাৎ বিজ্ঞানই ব্রহ্ম। তাহার প্রকৃত তাৎপর্য্য এই যে, মানবের বুদ্ধিতে যে পরম চৈতন্যের জ্যোতি অধিষ্ঠিত থাকাতে বুদ্ধি বিষয়ের জ্ঞান অবগত হয় সেই বুদ্ধিস্থ চৈতন্য প্রজ্ঞান শব্দের বাচ্য। তিনিই ব্রহ্ম। নতুবা বুদ্ধি ব্রহ্ম নহে। এইরূপে ঈশ্বরের বিভূতি জ্ঞানের অভাবে লোক সকল উপাধিকে ঈশ্বর-স্থানীয় জ্ঞান করে।

২১। পূর্ব্বকালে বৌদ্ধেরা সর্ব্বাপেক্ষা বুদ্ধিকেই প্রধান বলিয়া জানিয়াছিলেন। তাঁহারা বুদ্ধিকেই আত্মা বলিয়া গ্রহণ করিয়াছিলেন। যথা পঞ্চদশীতে, চিত্রদীপে (৭৩)

বিজ্ঞানময়কোষোঽয়ং জীব ইত্যাগমা জগুঃ।
সর্ব্বসংসার এতস্য জন্মনাশসুখাদিকঃ।

বিজ্ঞানই জীব। সেই জীবেরই এই জন্ম বিনাশ, সুখ দুঃখরূপ সংসার। শ্রীমান সদানন্দ যোগীন্দ্র স্বীয় বেদান্তসারে কহিয়াছেন যে, "বৌদ্ধস্তু অন্যোঽন্তর আত্মা বিজ্ঞানময়"। বৌদ্ধেরা প্রাগুক্ত প্রকারের শ্রুতি অনুসারে মনের অভ্যন্তরবাসী বুদ্ধিকে আত্মা বলেন এবং প্রমাণ দেন যে, 'কর্ত্তুরভাবে করণস্য শক্ত্যভাবাৎ' বুদ্ধিরূপ কর্ত্তা না থাকিলে মন, প্রাণ, ইন্দ্রিয় প্রভৃতি করণগণের শক্তির অভাব হইত। অতএব বৌদ্ধগণের মতে বুদ্ধি হইতে শ্রেষ্ঠ কিছুই নাই। তিনিই জীব, তিনিই কর্ত্তা, তিনিই, ভোক্তা, তিনিই জ্ঞান, তিনিই জ্ঞাতা, তিনিই জ্ঞেয়, তিনিই ত্রাতা। তিনি ব্যতীত জগতের জন্মস্থিতি ভঙ্গের অন্য কারণ নাই। পূর্ব্বকালে বৌদ্ধেরা যেমন বুদ্ধিকে আত্মা ও শ্রেষ্ঠ বলিয়া আদর করিতেন, এই বর্ত্তমান কালে রাজকীয় বিদ্যা-প্রভাবে ভারতবর্ষে আবার বুদ্ধিরই পূজা প্রচার হইয়া পড়িতেছে, অথচ অন্ন প্রাণ এবং মনের আকর্ষণ তাহার সঙ্গে সঙ্গে আছে। শরীরের সৌন্দর্য্যের প্রতি, ধন সম্পত্তির প্রতি, স্বাস্থ্যরক্ষার প্রতি, শারীরিক বীর্য্য লাভের প্রতি যশোমান ও সাংসারিক সুখের প্রতি লোকের তো সাধা-

রণতঃ যত্ন আছেই, কিন্তু বিশেষতঃ বুদ্ধি বিদ্যার দিকেই লোকের শেষ লক্ষ্য পড়িয়াছে। ঈশ্বরের পূজা বা তাঁহাকে হৃদয়ঙ্গম করিবার দিকে কাহারই লক্ষ্য দেখা যায় না। যদিও স্থানে স্থানে ঈশ্বরের পূজা দেখা যায় কিন্তু তাহা ঈশ্বরের উদ্দেশে নহে এবং তদ্দ্বারা তাঁহার প্রত্যক্ষ জ্ঞানও লাভ হয় না। কেহ বা শরীরের সৌন্দর্য্য ও ধন সম্পত্তিরূপ অন্ন লাভের নিমিত্ত তাঁহার পূজা করেন, কেহ বা আরোগ্য ও শক্তি বীর্য্যরূপ প্রাণ কামনায় তাঁহার আরাধনা করেন, কেহ বা যশোমান ও সুখরূপ মানসিক ইচ্ছা চরিতার্থ হইবার জন্য তাঁহার পূজা করেন, কেহ বা তাঁহার পূজার ছল করিয়া কেবল বিদ্যা ও বুদ্ধিরই চরণে পতিত আছেন। বিদ্যা বুদ্ধির উন্নতিরূপ অবস্থাই এখনকার চূড়ান্ত অবস্থা। যদি সৌভাগ্যবলে ভারতের বর্ত্তমান সন্তানগণ কখনও অন্নময় প্রাণময় বা মনোময় কোষরূপ আবরণ হইতে উদ্ধার পান কিন্তু আকার প্রকার দৃষ্টে বোধ হইতেছে যে বুদ্ধি বিদ্যার বিস্তীর্ণ রাজ্যকে তাঁহারা ভেদ করিতে পারিবেন না। বিশেষতঃ বর্ত্তমান কালে অনেক শ্রেষ্ঠ ব্যক্তি যখন বিদ্যা বুদ্ধিতেই অন্ন, প্রাণ, মন এমন কি ঈশ্বরকে পর্য্যন্ত প্রতিষ্ঠিত করিয়াছেন তখন লোকেরা তদনুবর্ত্তন করিবেই করিবে। এমত অবস্থায় ঈশ্বর যদিও পূজিত হন সে কেবল বুদ্ধি বিদ্যার বাচ্যরূপে; স্বরূপতঃ নহে। ইহারই মধ্যে অনেকে ঈশ্বরকে ত্যাগ করিয়াছেন এবং সর্ব্বত্র বুদ্ধি বিদ্যার প্রতিষ্ঠা লইয়া বিব্রত হইতেছেন। এই জগতের কেহ সৃষ্টি-স্থিতি-ভঙ্গের কর্ত্তা আছেন তাঁহাদের সর্ব্বশ্রেষ্ঠ পদাভিলাষী বুদ্ধি বিদ্যা তাহা স্থির করিতে চাহে না, কেননা তাহা হইলে তাহার অপমান হয়। সুতরাং ভাবিয়া দেখ তাদৃশ স্থানে তাঁহাদের বুদ্ধি বিদ্যাই জগতের সৃষ্টি-স্থিতি-ভঙ্গের ভার লইয়া আছে। যাঁহারা সৌভাগ্যক্রমে বুদ্ধি বিদ্যা দ্বারা ঈশ্বরের সৃষ্টি-স্থিতি-সংহার-কর্ত্তৃত্ব স্বীকার করেন, তাঁহারাও তদ্দ্বারা তাঁহার প্রত্যক্ষ জ্ঞান পান

না। কেননা হৃদয়ঙ্গম ও অনুভব ব্যতীত কেবল বিদ্যা দ্বারা তাঁহার অপরোক্ষ জ্ঞান লাভ হয় না। অতএব অনুভব ও হৃদয়ঙ্গম করা ব্যতীত বুদ্ধি বিদ্যা অপ্রত্যক্ষ ঈশ্বরকে রচনা করে মাত্র তদ্ভিন্ন প্রত্যক্ষ পরমাত্মাকে দেখাইতে পারে না। যেমন প্রদীপ ধরিয়া কেহ সূর্য্য দর্শন করিতে যায় না, কিন্তু বিস্তৃত চক্ষুতে সূর্য্য স্বয়ং প্রকাশিত হন সেইরূপ সম্পত্তি, বীর্য্য, মনোবুদ্ধি দ্বারা পরমাত্মাকে দেখা যায় না, হৃদয়ের দ্বার আতত করিলেই তাঁহাকে তথায় জীবের প্রকাশক ও অন্তর্যামী আত্মারূপে স্বয়ং-প্রকাশ দেখা যায়। সুতরাং বিজ্ঞানকে জীবাত্মা কিম্বা ব্রহ্ম বলিয়া জানায় অথবা বিজ্ঞানের দ্বারা ব্রহ্ম নিরূপণ করায় তৃপ্তি লাভ হয় না। অতএব ভৃগু বিস্তর তপস্যা করিয়া যে বিজ্ঞানকে শাস্ত্রের অসিদ্ধান্ত অংশের অনুযায়ী ও লৌকিক দৃষ্টান্তে ব্রহ্ম বলিয়া স্থির করিলেন তাহাতে তাঁহার চিত্ত প্রসন্ন হইল না।

২২। ভৃগু পুনরায় পিতার সকাশে উপস্থিত হইয়া কহিলেন, ভগবন্, আমাকে ব্রহ্ম উপদেশ করুন। বরুণ কহিলেন,

"তপসা ব্রহ্ম বিজিজ্ঞাসস্ব। তপোব্রহ্মেতি।"

তপস্যা দ্বারা ব্রহ্মকে জান। তপস্যাই ব্রহ্মের সাধন। ভৃগু পুনরায় তপস্যা আরম্ভ করিলেন এবং তাহাতে আনন্দকে ব্রহ্ম বলিয়া জানিলেন। যদিও তৈত্তিরীয় শ্রুতির ব্রহ্মবল্লীতে উক্ত আছে,

"তস্মাদ্বা এতস্মাৎ বিজ্ঞানময়াৎ অন্যোন্তরআত্মা আনন্দময়ঃ।"

উপরি উক্ত বিজ্ঞানময় হইতে অতিরিক্ত অভ্যন্তর আনন্দময় আত্মা (জীব), কিন্তু ঐ শ্রুতিরই শেষাংশে আছে, "ব্রহ্মপুচ্ছং প্রতিষ্ঠা" ব্রহ্মই সেই আনন্দময় জীবের প্রতিষ্ঠা সুতরাং ব্রহ্মই মুখ্য আনন্দ। তদ্দ্বারা জীব প্রচুর রূপে আবৃত থাকায় জীবই আনন্দময়

শব্দের বাচ্য। এস্থলে সামানাধিকরণ্য সম্বন্ধে সবিশেষ ও নির্ব্বিশেষ এই যে দুই প্রকার আনন্দ উক্ত হইয়াছে সেই সম্বন্ধ-জ্ঞানাভাবে অনেকে সবিশেষ যে প্রাকৃতিক জীবানন্দ তাহাকেই ব্রহ্ম বলিয়া গ্রহণ করেন। যদিও ব্রহ্ম প্রতিষ্ঠারূপে তাহারই অন্তর্ভূত আছেন, কিন্তু উক্ত সবিশেষ আনন্দ ভেদ পূর্ব্বক অনেকে সেই নির্ব্বিশেষ ব্রহ্মানন্দকে দেখিতে পান না। যতক্ষণ মানব আপনার দেহ, প্রাণ, মন, বুদ্ধি এবং প্রাকৃতিক আনন্দকে বিস্মৃত না হইবেন, ইহ জীবনের ক্রমোন্নতিতে যতদিন মানব ক্রমেই আপনাকে অধিকাধিক অপূর্ণ বলিয়া বোধ না করিবেন, ততদিন ধরিয়া তিনি ব্রহ্মকে আপনার আত্মারূপে দেখিতে পাইবেন না। কিন্তু ভৃগু আপনার সুদৃঢ় তপস্যার প্রভাবে তাদৃশ জীবানন্দকে হেয় করত একেবারে পূর্ণানন্দকে আপনার জীবত্বের প্রতিষ্ঠারূপে অনুভব করিলেন। তাহাতে সেই প্রসিদ্ধ ব্রহ্মই তাঁহার আত্মারূপে প্রত্যক্ষ হইলেন। তাঁহাকেই আনন্দরূপে আস্বাদ করত তিনি তৃপ্ত হইলেন এবং আনন্দ পূর্ব্বক কহিলেন,

আনন্দাদ্ধ্যেব খল্বিমানি ভূতানি জায়ন্তে।
আনন্দেন জাতানি জীবন্তি আনন্দং প্রয়ন্ত্যভিসম্বিশন্তি।"

আনন্দ হইতে এই জীব সকল উৎপন্ন হয়। উৎপন্ন হইয়া আনন্দ দ্বারা জীবিত রহে এবং প্রলয়কালে আনন্দেতে গমন করে ও আনন্দেতেই প্রবেশ করে। ইতিপূর্ব্বে তৈত্তিরীয় শ্রুতির ব্রহ্মবল্লীতে তন্ন তন্ন করিয়া অন্নময় অবধি আনন্দময় পর্য্যন্ত পঞ্চকোষের ব্রহ্মত্ব নিষেধ করিয়াছেন কিন্তু সমাহার করিয়াছেন যে "ব্রহ্মপুচ্ছং প্রতিষ্ঠা" সেই আনন্দময়ের অর্থাৎ জীবের প্রতিষ্ঠা ও প্রকাশক ব্রহ্ম।

'স তপস্তপ্ত্বা ইদং সর্ব্বমসৃজত। যদিদং কিঞ্চ।"

তিনি বিশ্বসৃজনার্থ আলোচনা করিয়া এই সমুদায় যাহা কিছু সৃষ্টি করিলেন।

২৩। "রসোবৈ সঃ। রসংহ্যেবায়ং লব্ধ্বানন্দীভবতি।"

সেই পরমাত্মা রসস্বরূপ তৃপ্তি-হেতু। সেই রসস্বরূপ পর-ব্রহ্মকে লাভ করিয়া (অয়ং জীবঃ) জীব আনন্দিত হয়েন। "এষ-হ্যেবানন্দযাতি" ইনিই লোক সকলকে ধর্ম্মানুরূপ আনন্দিত করেন। ইনি আনন্দের আধার। পঞ্চকোষ মধ্যে যদিও তাঁহার বিভূতি দেদীপ্যমান আছে কিন্তু তন্মধ্যে তাঁহার প্রত্যক্ষ জ্ঞান লাভ হয় না। এমন কি কারণ-দেহ-রূপিণী-প্রকৃতি-নিষ্পন্ন জীবানন্দও তাঁহার তটস্থ-লক্ষণ মাত্র। স্বরূপ-লক্ষণে তিনি স্বয়ং সেই জীবের আনন্দ, আধার, আলোক, রস বা প্রতিষ্ঠা। জীব যখন সেই আধারে আপনার স্থিতি দর্শন করেন, এবং সেই আলোকে আপনাকে প্রকাশিত দেখেন, তখন সেই রস আস্বাদন পূর্ব্বক তাঁহাকে জীবন ও আত্মা বলিয়া অভিনন্দন করেন।

"যদাহ্যেবৈষ এতস্মিন্নদৃশ্যেনাত্ম্যেনিরুক্তেনিলয়নেভয়ং প্রতিষ্ঠাম্ বিন্দতে। অথ সোঽভয়ং গতোভবতি।"

জীব যৎকালে এই অদৃশ্য নিরবয়ব, অনির্ব্বচনীয়, নিরাধার পরব্রহ্মে নির্ভয়ে স্থিতি করেন, তখন তিনি অভয় প্রাপ্ত হয়েন।

"যতোবাচোনিবর্ত্তন্তে অপ্রাপ্য মনসা সহ আনন্দং ব্রহ্মনোবিদ্বান্ ন বিভেতি কুতশ্চন।"

মনের সহিত বাক্য যাঁহাকে না পাইয়া যাঁহা হইতে নিবৃত্ত হয়, সেই পরব্রহ্মের আনন্দ যিনি জানিয়াছেন, তিনি আর কাহা হইতেও ভয় প্রাপ্ত হন না। 'মন ইতি বিজ্ঞানং' এস্থানে মনের গ্রহণে বিজ্ঞানকেও গ্রহণ করা হইয়াছে। এইরূপে ব্রহ্মবল্লীতে অন্নময় অবধি আনন্দময় পর্য্যন্ত অর্থাৎ স্থূল দেহ অবধি জীবানন্দ-স্বরূপ কারণ শরীর পর্য্যন্ত পঞ্চকোষ বর্জন পূর্ব্বক প্রকৃতি-পরি-পালিত আনন্দময়-কোষাবচ্ছিন্ন জীবের প্রতিষ্ঠারূপে ব্রহ্মকে স্থাপন

করত সেই ব্রহ্মকেই বিশুদ্ধ আনন্দ কহিয়াছেন। ভৃগু সেই অপ্রাকৃতিক ও সংসারাতীত আনন্দের রসজ্ঞ হইলেন। ভার্গবী-বারুণী বিদ্যাতে সেই আনন্দের প্রতিষ্ঠা। এই প্রকারে 'যতোবা ইমানী-ত্যাদি শ্রুতি এবং তন্মীমাংসার্থ প্রতিজ্ঞাত 'জন্মাদি' সূত্র তটস্থ লক্ষণে ব্রহ্মনিরূপণ আরম্ভ করিয়া অন্তে ব্রহ্মের আনন্দরূপ ও রস-স্বরূপ স্বরূপলক্ষণ প্রতিপাদন করিয়াছেন। উক্ত বিদ্যাতে আখ্যা-য়িকা সমাপ্ত কালে সমাহার করিয়াছেন যে,

২৪। "সৈষা ভার্গবী বারুণী বিদ্যা পরমে ব্যোমন্ প্রতিষ্ঠিতা। স য এবং বেদ প্রতিতিষ্ঠতি। অন্নবানন্নাদোভবতি। মহান্ ভবতি। প্রজয়া পশুভির্ব্রহ্ম-বর্চ্চসেন। মহান্ কীর্ত্ত্যা॥"

বরুণ-প্রোক্তা ভৃগু কর্ত্তৃক বিদিতা এই ব্রহ্মবিদ্যা 'পরমে ব্যোমন্ প্রতিষ্ঠিতা' হৃদয়াকাশ-গুহাতে প্রতিষ্ঠিত। ভৃগুর ন্যায় যিনি এই ব্রহ্মবিদ্যাকে জানেন, তিনিও ব্রহ্মেতে প্রতিষ্ঠিত হয়েন। কিন্তু কেহ মনে করিতে পারেন যে অন্ন, প্রাণ, মন, বিজ্ঞান, জীবানন্দ সমস্ত ত্যাগ করিয়া যদি ভৃগুর ন্যায় ব্রহ্মজ্ঞানী হইতে হয় তবে সে অসম্ভব। জনকাদি ব্রহ্মজ্ঞানীরা কেহই সেরূপ ত্যাগী হইতে পারেন নাই। এই আশঙ্কা দূর করিবার নিমিত্ত কহিলেন যে, তাদৃশ ব্যক্তি ভোগ-কামনা-শীল না হইলেও অন্নবান, অন্নভোক্তা আর প্রজা, পশু, তেজ ও কীর্ত্তি দ্বারা মহান্ হয়েন। যিনি পঞ্চ-কোষ বর্জন পূর্ব্বক, জ্ঞানদ্বারা প্রকৃতি ও বাসনাশূন্য হইয়া ব্রহ্মা-নন্দে রমণ করেন ঈশ্বর তাঁহার অন্ন, প্রাণ, মন, বিজ্ঞান ও আনন্দ সম্বন্ধে উন্নতি বিধান করেন। গীতাস্মৃতিতে ভগবান কহিয়াছেন,

"অনন্যাশ্চিন্তয়ন্তোমাং যে জনাঃ পর্য্যুপাসতে।
তেষাং নিত্যাভিযুক্তানাং যোগক্ষেমং বহাম্যহং॥

অন্য চিন্তা পরিত্যাগ করিয়া যাঁহারা আমার উপাসনা করেন সেই সকল নিত্যাভিযুক্ত ব্যক্তিদিগের নিকট আমি ধনাগমের ও

ধনরক্ষার উপায় বহন করিয়া দেই। কি জানি, পঞ্চকোষ ত্যাগের ব্যবস্থাতে যদি কেহ নাস্তিকতা পূর্ব্বক অন্ন, প্রাণ, মন, বিজ্ঞান, আনন্দ প্রভৃতিকে ঘৃণা করেন এজন্য কহিলেন যে, যাঁহারা ঐ সকল পদার্থের বাহ্যাকর্ষণে আবদ্ধ না হইয়া তাহার অভ্যন্তরে পরমেশ্বরের অধিষ্ঠান অনুভব পূর্ব্বক তাঁহার পূজা করেন তাঁহারা ঐ সকল পদার্থকে ত্যাগ করিয়াও আদর করেন। উপরি উক্ত ভৃগুবল্লীর দশমানুবাকে কহিয়াছেন,

"ক্ষেম ইতি বাচি। যোগক্ষেম ইতি প্রাণাপানয়োঃ। কর্ম্মেতি হস্তয়োঃ। গতিরিতি পাদয়োঃ। বিমুক্তিরিতি পায়ৌ।"

বাক্যেতে ধনরক্ষার উপায় রূপে, প্রাণাপানে ধনাগমের উপায়রূপে, পদদ্বয়ে গতিরূপে, পায়ুদেশে বিমুক্তিরূপে, ব্রহ্মের উপাসনা করিবেক। এইরূপে মনোবুদ্ধি প্রভৃতিতে তাঁহার বিভূতি দর্শন পূর্ব্বক উপাসনা করিবেক। তিনি সর্ব্বত্রই বিরাজমান আছেন। সর্ব্বত্র তাঁহাকে দর্শন পূর্ব্বক ব্যবহারিক প্রলোভন-স্বরূপ অন্নময়াদি কোষ ত্যাগ করিবেক, কিন্তু অন্নাদিতে তাঁহার অধিষ্ঠান অনুভব পূর্ব্বক তাহাদের পবিত্রতা সন্দর্শন করিবে এবং আপনার স্বার্থ পরিত্যাগ করত সর্ব্বত্র তাঁহার ভাবের ভাবুক হইবেক। সমস্ত কথার সমাহার এই যে, হৃদয়-কমলে আত্মারূপে ব্রহ্মদৃষ্টি হইলে সমস্ত জগতের সম্বন্ধে সন্ন্যাস উপস্থিত হয় অথচ তিনি সর্ব্বত্রেই প্রতিষ্ঠারূপে দৃষ্ট হওয়ায় কিছুই ত্যাগ হয় না। অর্থাৎ সম্পত্তি প্রভৃতি ত্যাগে সন্ন্যাস হয় না, কেবল বাসনা-ত্যাগেই হইয়া থাকে। বাহ্য বিষয়ের বাসনা ও মনোরাজ্য ত্যাগ হইলেই আত্মারূপে ব্রহ্ম দৃষ্ট হইয়া থাকেন। সেই দৃষ্টি প্রত্যক্ষ। তিনি কোন দূরস্থ স্বর্গলোকে আছেন এরূপ জানিলে তিনি প্রত্যক্ষ হন না। তিনি জন্ম-স্থিতি-ভঙ্গের কারণ, এরূপ জানিলেও তাঁহাকে প্রত্যক্ষ করা

যায় না। মনোবুদ্ধিতেও তিনি প্রত্যক্ষ হন না। কেবল জীবের প্রতিষ্ঠা-স্বরূপ আত্মারূপেই তিনি প্রত্যক্ষ হন।

২৫। এতাবতা "জন্মাদ্যস্য যতঃ" এই ব্যাসসূত্রে কেবল তটস্থ-লক্ষণের দ্বারা ব্রহ্মবিচার করেন নাই—কেবলমাত্র লৌকিক তর্ক যুক্তিকে আশ্রয় করিয়াও ব্রহ্মজ্ঞান দানে ব্রতী হন নাই কিন্তু কেবল ব্রহ্মের শ্রুতিসম্মত অনুভব-সিদ্ধ প্রসিদ্ধ ও প্রত্যক্ষ-যোগ্য আনন্দ ও রস-স্বরূপ স্বরূপ-লক্ষণকে প্রতিষ্ঠা করিয়াছেন। ইহাতে এই সিদ্ধান্ত হইল যে অন্ন, প্রাণ, মন, বিজ্ঞান, জীব, প্রকৃতি প্রভৃতি অন্য কোন আভিধানিক ব্রহ্ম জগতের সৃষ্টি-স্থিতি-ভঙ্গের কারণ নহে কিন্তু কেবল একমাত্র আনন্দ-স্বরূপ ব্রহ্মই উক্ত কারণ হয়েন। "অথাতোব্রহ্মজিজ্ঞাসা" সূত্রে তাঁহাকেই জানিবার উপদেশ দিয়াছেন। তিনিই হৃদয়-কমল-বাসী প্রসিদ্ধ জ্ঞানস্বরূপ আত্মা এবং আনন্দময়-কোষ-স্বরূপিণী প্রকৃতির প্রতিষ্ঠা ও আধার বিধায় তিনিই জগতের জন্ম-স্থিতি-ভঙ্গের কারণ। সুতরাং জগতে এমত কোন পদার্থ নাই যাহা তিনি সৃষ্টি করেন নাই।

জগৎকারণ বিধায় তিনিই "সর্ব্বজ্ঞ" শব্দের বাচ্য।

"এষসর্ব্বেশ্বর এষসর্ব্বজ্ঞ এষোন্তর্যাম্যেষযোনিঃ সর্ব্বস্য প্রভবাপ্যয়ৌ হি ভূতানাং।"

ইনি সৃষ্টির 'কারণ সূক্ষ্ম ও স্থূল' এই সর্ব্বাবস্থার ঈশ্বর ও জ্ঞাতা, অন্তর্যামীরূপে সর্ব্বভূতের নিয়ন্তা, যোনি-রূপে সমুদয়ের কারণ, এবং ইহাঁ হইতেই সর্ব্বভূতের জন্ম স্থিতি ভঙ্গ হয়। এইরূপ মীমাংসাতে এই সন্দেহ উপস্থিত হইতে পারে যে ব্রহ্ম কিরূপে সকলের কারণ ও সর্ব্বজ্ঞ হইবেন? যদিও অন্যান্য বিষয়ে সেরূপ হইতে পারেন কিন্তু সর্ব্বজ্ঞানের আকর-স্বরূপ বেদের তিনি সৃষ্টিকর্ত্তা নহেন। কেন না বেদ অকৃত অপৌরুষেয়, নিত্য, ও স্বতঃসিদ্ধ।

তাহার সৃষ্টিকর্ত্তা কেহ নাই। অতএব "জন্মাদ্যস্য যতঃ" এই সূত্র বেদ ব্যতীত অন্যত্রে সংলগ্ন হইতে পারে। এই সন্দেহ নিরাস করণার্থ মহর্ষি ব্যাসদেব নিম্নস্থ সূত্র উপস্থিত করিতেছেন।

ইতি প্রথম অধ্যায়ে প্রথম পাদে দ্বিতীয়াধিকরণে দ্বিতীয় সূত্রের ব্যাখ্যা সমাপ্ত।

প্রথম অধ্যায়।

প্রথম পাদ।

তৃতীয় অধিকরণ।

তৃতীয় সূত্র।

সূত্র। শাস্ত্রযোনিত্বাৎ। ৩।

অর্থ। (১) জগৎকারণ ব্রহ্ম সর্ব্বজ্ঞ। তাহার প্রমাণ এই যে তিনি সর্ব্বজ্ঞান-প্রকাশক বেদের যোনি অর্থাৎ জন্মস্থান। (২) বেদ তাঁহার সর্ব্বজ্ঞত্ব প্রভৃতি যথাবৎ স্বরূপের জ্ঞাপক। *

প্রথম অর্থের তাৎপর্য্য।

২৬। ব্রহ্মই জগতের জন্ম-স্থিতি-ভঙ্গের কারণ, এই মীমাংসা পূর্ব্ব-সূত্রে স্থির হইয়াছে। সেই সূত্রে আরো কথিত হইয়াছে যে ব্রহ্ম সর্ব্বজ্ঞ। কেন না, যিনি এই অচিন্ত্য-রচনা বিশ্বের কারণ তিনি কখনও জ্ঞান-হীন অল্পজ্ঞ অথবা জড় হইতে পারেন না। পূজ্যপাদ শঙ্করাচার্য্য শারীরক ভাষ্যে কহিয়াছেন—

"অস্য জগতোনামরূপাভ্যাং ব্যাকৃতস্য অনেক-কর্তৃভোক্তৃসংযুক্তস্য প্রতিনিয়ত-দেশকালনিমিত্তক্রিয়াফলাশ্রয়স্য মনসাপ্যচিন্ত্যরচনারূপস্য জন্মস্থিতিভঙ্গং যতঃ সর্ব্বজ্ঞাৎ সর্ব্বশক্তেঃ কারণাদ্ভবতি তদ্ব্রহ্মেতি"।

যে জগৎ অসংখ্য ও বিচিত্র নাম-রূপেতে দেদীপ্যমান; যে জগৎ অনেক কর্ম্মকর্ত্তা ও কর্ম্ম-ফল-ভোক্তা জীব-নিচয়ে পরিপূর্ণ;

* সমাসভেদে এই সূত্রের এই দুই প্রকার অর্থ হয়। (১) 'ব্রহ্ম শাস্ত্রের যোনি (জন্মস্থান) (২) শাস্ত্র ব্রহ্মের যোনি (জ্ঞাপক)। এই দুই প্রকার অর্থের স্বতন্ত্র স্বতন্ত্র তাৎপর্য্য দেওয়া গেল।

যে জগৎ সেই সকল ক্রিয়া-ফলকে প্রতিনিয়ত ভোগ করিবার প্রদেশ স্বরূপ ভূলোকাবধি দেবলোক পর্য্যন্ত লোক সমূহের ও ঐহিক পারত্রিক ভোগ-কালের আশ্রয়-স্থান, এবং যে জগতের রচনা-ব্যাপার মনেতেও চিন্তা করিয়া উঠা যায় না; তাহার জন্ম-স্থিতি-ভঙ্গ যে সর্ব্বজ্ঞ সর্ব্বশক্তি কারণ হইতে হয় তিনি ব্রহ্ম। তিনি কখনও অচেতন ও অজ্ঞ হইতে পারেন না। শঙ্করাচার্য্য উক্ত ভাষ্যে এ সম্বন্ধে আরো কহিয়াছেন।

"ন যথোক্তবিশেষণস্য জগতোযথোক্তবিশেষণমীশ্বরং মুক্ত্বা অন্যতঃ প্রধানাদ-চেতনাৎ অণুভ্য অভাবাৎ বা সংসারিণোবা উৎপত্ত্যাদি সম্ভাবয়িতুং শক্যং। নচ "স্বভাবতঃ" বিশিষ্টদেশকালাদিনিমিত্ত উপাদানাৎ।"

উপরি উক্ত লক্ষণ-বিশিষ্ট ঈশ্বরকে পরিত্যাগ করিয়া, অচেতন প্রধান ১, পরমাণু ২, অভাব ৩, জীব ৪, অথবা বিশিষ্ট-দেশ-কালাদি-প্রেরিত স্বভাবরূপ ৫ কোন উপাদান হইতে এতাদৃশ আশ্চর্য্য ব্রহ্মাণ্ডের উৎপত্তি স্থিতি লয় কখনই সম্ভব হইতে পারে না। এই সকল কারণে পূর্ব্বসূত্রে ব্রহ্মের সর্ব্বজ্ঞত্ব মীমাংসিত হইয়াছে।

২৭। ঈশ্বরাধিষ্ঠান ত্যাগ পূর্ব্বক প্রকৃতি স্বতন্ত্ররূপে জগতের উপাদান কারণ হইতে পারে না। কেন না, ব্রহ্মাশ্রয় ব্যতীত উহা অজ্ঞান, অচেতন ও জড়। বেদান্তশাস্ত্র উহাকে ব্রহ্মেরই শক্তি কহেন। ব্রহ্মের পূর্ণ শক্তি কহেন না, কিন্তু কেবল সৃষ্টির মূলীভূত আংশিক শক্তি কহেন। সেই আংশিক শক্তিই এই অশেষ জগতের বীজ। তাহা সম্পূর্ণরূপে তাঁহার আয়ত্তাধীন। তাহা

---

১ সাংখ্য-দর্শনের স্বীকৃত প্রকৃতি।

২ ন্যায় বৈশেষিক-দর্শনের স্বীকৃত সৃষ্টির উপাদান কারণ।

৩ শূন্যবাদী বৌদ্ধ ও চার্ব্বাকগণ কহেন যে শূন্য হইতে জগৎ সৃষ্ট হইয়াছে। সেই শূন্যই অভাব।

৪ জীবাত্মা।

৫ আকস্মিক প্রাকৃতিক ঘটনা।

ব্যক্ত হইয়া জগতের স্থিতিকালে বিচিত্র ভাবে ব্রহ্মাণ্ডরূপে পরিণত হয়। প্রলয়কালে স্থূল সূক্ষ্ম অবয়ব সমূহের লয়স্থানরূপে অব্যক্ত ভাবে অবস্থিতি করে। কখন অব্যক্ত ও অদৃশ্য কখনও বা ব্যক্ত ও প্রত্যক্ষ পরিদৃশ্যমান জড় ও জীবসমাকীর্ণ জগৎরূপে পরিণত হয় বলিয়া তাহাকে অনির্ব্বচনীয়া মায়া কহা যায়। মোক্ষের বিরোধী ও পুনঃ পুনঃ জন্ম-জরা-মরণরূপ অনেক অনর্থসঙ্কুল অশেষ সংসারের হেতু বিধায় উহা অজ্ঞান শব্দে উক্ত হয়। উহার অব্যক্ত, অঙ্কুর ও ব্যক্ত এই তিন অবস্থা। প্রলয়কালে উহার অব্যক্ত অথবা কারণাবস্থা। সে অবস্থায় সমস্ত জগৎ, স্থূল সূক্ষ্ম সমস্ত দেহ ও অবয়ব, এবং সমগ্র ব্রহ্মাণ্ডের নিবাসী জীবগণ ঐ কারণ-স্বরূপিণী অব্যক্ত প্রকৃতির গর্ব্ভে বিলীন ও নিরুদ্ধ-বৃত্তি হইয়া অপেক্ষা করে। অতঃপর প্রথম-সৃষ্টি-আরম্ভ-সময়ে উহার অঙ্কুর অথবা সূক্ষ্মাবস্থা। তদবস্থায় সূক্ষ্ম ভূতগণ, ও সূক্ষ্ম দেহ সকল বিকশিত হয়। তৎপরে প্রকৃতির ব্যক্ত, পরিণত, অথবা স্থূলাবস্থা। এই অবস্থায় স্থূল ভূত, স্থূল দেহ ও স্থূল অবয়ব সকল প্রকাশ পায়। প্রকৃতির এই তিন অবস্থা। এই তিন অবস্থাতে উহার দুই দুই প্রকার ব্যাপ্তি। এক সমষ্টি, দ্বিতীয় ব্যষ্টি। সমষ্টি ভাবে উহা কারণ; সূক্ষ্ম ও স্থূল এই ত্রিবিধ অবস্থায় পূর্ণস্বরূপ, নির্ম্মল, এবং ঈশ্বরের আয়ত্তাধীন। কিন্তু ব্যষ্টিভাবে উহা ঐ তিন অবস্থাতেই নানারূপে বিভক্ত, অল্পস্বরূপ মলিন এবং বদ্ধ। কারণাবস্থাতে, প্রকৃতি সমষ্টিভাবে সৃষ্টির মুল-বীজ-স্বরূপিণী। ব্যষ্টিভাবে আপনাতে বিলীন তাবৎ পদার্থের বিশেষ বিশেষ কারণ-ধাতু ও জীবগণের নিরুদ্ধ-বৃত্তি ও নিদ্রিত অদৃষ্ট-স্বরূপিণী। সূক্ষ্মাবস্থাতে প্রকৃতি সমষ্টিভাবে সমুদয় সূক্ষ্ম ভূত ও সূক্ষ্ম দেহের উপাদান এবং ব্যষ্টি ভাবে প্রত্যেক সূক্ষ্ম ভূত ও সূক্ষ্ম অবয়বের ধাতুরূপে পরিণত হয়। স্থূলাবস্থায় উহা সমগ্রভাবে সকল স্থূল অবয়বের এবং ব্যষ্টি

ভাবে প্রত্যেক স্থূল পদার্থ ও স্থূল দেহের উপাদান। প্রকৃতির এই ষড়্‌বিধ অবস্থা। সমষ্টি কারণ, ব্যষ্টি কারণ; সমষ্টি সূক্ষ্ম, ব্যষ্টি সূক্ষ্ম; সমষ্টি স্থূল, ব্যষ্টি স্থূল। তন্মধ্যে সমষ্টি অবস্থাত্রয়ে উহা ঈশ্বরের আয়ত্তাধীন-সৃষ্টি-শক্তি-বিধায় শুদ্ধসত্ত্বপ্রধানা অর্থাৎ নির্ম্মলা। আর ব্যষ্টি অবস্থাত্রয়ে উহা পৃথক্ পৃথক্ পদার্থগত কঠোর নিয়মে বদ্ধ ও জৈবিক অদৃষ্ট বা স্বভাবে পরিণত বিধায় মলিনা।

২৮। প্রকৃতির এই ষড়্‌বিধ অবস্থাতেই ব্রহ্ম উপহিত। কিন্তু অংশতঃ উপহিত মাত্র। কেন না ব্রহ্ম এতই মহান্ যে তাঁহার ক্ষমতার অনন্ত সাগর-মধ্যে এই অশেষ সৃষ্টি-ব্যাপার এক বিন্দু বুদ্‌-বুদ-বিশেষ! তাহা কখনই সমগ্র ভাবে তাঁহাকে ধারণ করিতে পারে না, সুতরাং শাস্ত্রের সিদ্ধান্ত এই যে তিনি একাংশে এই জগতে স্থিতি করিতেছেন! সেই তাঁহার একাংশ মাত্র এই ব্রহ্মাণ্ড-রাজ্যের কার্য্যে লিপ্ত রহিয়াছে। তাঁহার অবশিষ্ট সমুদয় অংশ সংসারের অতীত দেশে শুদ্ধ-বুদ্ধ-মুক্ত ভাবে বিদ্যমান আছে। তাঁহার সেই ভাব নিষক্রিয়, শান্ত, নিরঞ্জন ও নির্লিপ্ত। তাহাই মোক্ষপদ এবং ব্রহ্মশব্দের বাচ্য। তাঁহার যে অংশ ব্রহ্মাণ্ডে প্রবিষ্ট তাহা ছয় পাদে বিভক্ত। সমষ্টি প্রকৃতির কারণ, সুক্ষ্ম, স্থূল, এই তিন অবস্থায় তিন পাদ এবং ব্যষ্টি প্রকৃতির ঐরূপ তিন অবস্থায় তিন পাদ। তন্মধ্যে সমষ্টি প্রকৃতি-স্বরূপিণী সৃষ্টিশক্তি নির্ম্মলা। তাহাতে তাঁহার যে অধিষ্ঠান তাহাই সাধারণতঃ সমষ্টি প্রকৃতির নিয়ন্তা। এস্থলে কারণাবস্থায় তাঁহার নাম জগৎকারণ, সর্ব্বেশ্বর, সর্ব্বনিয়ন্তা, ঈশ্বর, সর্ব্বান্তর্যামি, এবং সর্ব্বজ্ঞ। সূক্ষ্ম প্রকৃতিতে তাঁহার নাম হিরণ্যগর্ভ এবং প্রকৃতির ব্যক্ত ও স্থূলাবস্থায় তিনি বিরাট শব্দে কথিত হয়েন। এ সমস্ত স্থলেই নির্ম্মলা সমষ্টি প্রকৃতিই তাঁহার উপাধি এবং তিনি তাহাতে ঔপাধেয় ও উপহিত। অতঃপর প্রকৃতির ত্রিবিধ ব্যষ্টি পরিণামে তাঁহার যে অন্তর্যামিত্ব, অবভাসকত্ব

ও নিয়ন্তৃত্ব তাহা কঠোর ভৌতিক নিয়মে ও অদৃষ্টবদ্ধ জৈবিক স্বভাবে রুদ্ধ। এই শেষোক্ত অবস্থাত্রয়ে উপহিত চৈতন্যত্রয় ব্যষ্টি ও বিশেষ বিশেষ আধারাবচ্ছিন্ন বিধায় সর্ব্বজ্ঞ শব্দের বাচ্য নহে। সুতরাং জগতের জন্মস্থিতি-ভঙ্গ রূপ ক্রিয়ার যিনি কারণ তাঁহার সর্ব্বজ্ঞত্ব ঐ চৈতন্যত্রয় দ্বারা সিদ্ধ হয় না। কেবল শুদ্ধ-সত্ত্বাত্মিকা সমষ্টি প্রকৃতিতে বিদ্যমান যে ব্রহ্মচৈতন্য তাঁহারই ঈশ্বরত্ব। তন্মধ্যে প্রকৃতির কারণাবস্থাতে তাঁহার যে বিদ্যমানতা তাহাই উপলক্ষ করিয়া শাস্ত্রকারেরা তাঁহাকে জগৎ-কারণ ও সর্ব্বজ্ঞ বিশেষণ দিয়াছেন।

২৯। পরব্রহ্মের যে বিন্দু মাত্র শক্তি "সৃষ্টিশক্তি" অথবা "প্রকৃতি" শব্দের বাচ্য তাহার সহিত তাঁহার যে আংশিক আবির্ভাব কেবল সেই আবির্ভাবেরই নাম জগৎ-কারণ। জগৎ-রচনা, প্রজা-দিগকে বিবিধ কাম্য বস্তু পরিবেশন, এবং সুকৃতি দুষ্কৃতি অনুসারে প্রজাগণের প্রতি ফল বিধান করা এ সমস্ত কার্য্য তাহারই নিয়ন্তৃত। তিনি সমস্ত ব্রহ্মাণ্ডের প্রয়োজনবিৎ। কামনা, বাসনা, প্রার্থনা, মন্ত্রময়ী ক্রিয়া, এ সমস্তের তিনি জ্ঞাতা। তিনি আমাদের প্রত্যেক চিন্তা, উদ্দেশ্য, ভক্তি, প্রীতি, সুমতি, কুমতি, জানিতেছেন। তিনি ত্রিকালজ্ঞ, সর্ব্বকালবর্ত্তমান, সর্ব্বত্র বিরাজমান এবং সর্ব্বদর্শী। এই সমস্ত সৃষ্টি-ব্যাপার যখন কারণ-রূপিণী প্রকৃতিগর্ব্ভে বিবশ হইয়া বিলীন ছিল, তখন তিনি জগৎ-কারণরূপে তৎসমস্তের বিশেষতা, পূর্ব্বভাব, ভাবী উদয়কাল, এবং পরিণাম জ্ঞাত ছিলেন এবং এখনও সমস্ত জানিতেছেন। এতাবতা জগৎ-কারণ-স্বরূপ ব্রহ্ম যে সর্ব্বজ্ঞ তাহাতে আর সন্দেহ কি? জগতের কারণাবস্থাকে স্মরণ করিয়া তাঁহাকে জগৎকারণ বলা যায়; কিন্তু তিনি যদি সর্ব্বজ্ঞ-কারণ না হইতেন তবে কি এই সুকৌশল-সম্পন্ন, সর্ব্বাঙ্গ-সমঞ্জসীভূত, প্রার্থ-নার অনুরূপ, সর্ব্বতোভাবে প্রয়োজনীয়-উপকরণ-সম্পন্ন সুচারু

ব্রহ্মাণ্ড তাঁহা হইতে প্রসূত হইত? এই সকল কারণে শাস্ত্র ব্রহ্মের "জগৎকারণ" বিশেষণের সঙ্গে "সর্ব্বজ্ঞ" বিশেষণ দৃঢ়তর রূপে যুক্ত করিয়া দিয়াছেন। মাণ্ডুক্যোপনিষদে "এষ সর্ব্বেশ্বর" ইত্যাদি শ্রুতিতে তাঁহাকে একেবারে "যোনি ও সর্ব্বজ্ঞ" কহিয়াছেন। মুণ্ডকশ্রুতিতেও আছে—

"যঃ সর্ব্বজ্ঞঃ সর্ব্ববিদ্‌যস্য জ্ঞানময়ং তপঃ।
তস্মাদেতদ্‌ব্রহ্ম নামরূপমন্নং চ জায়তে॥"

যিনি সর্ব্বজ্ঞ, সর্ব্ববিৎ, জ্ঞানই যাঁহার তপস্যা, তাঁহা হইতে হিরণ্যগর্ভ্, নাম, রূপ, ও অন্ন জন্মে। শ্রীমান্ সদানন্দ যোগীন্দ্র স্বীয় বেদান্তসারে লেখেন,

"ইয়ং সমষ্টিরুৎকৃষ্টোপাধিতয়া বিশুদ্ধসত্ত্বপ্রধানা এতদুপহিতং চৈতন্যং সর্ব্বজ্ঞত্ব-সর্ব্বেশ্বরত্বসর্ব্বনিয়ন্তৃত্বাদিগুণকং সদসদব্যক্তমন্তর্যামিজগৎকারণমীশ্বর ইতি চ ব্যপদিশ্যতে। সকলাজ্ঞানাবভাসকত্বাদস্য সর্ব্বজ্ঞত্বং॥"

অজ্ঞান-সমষ্টি অর্থাৎ সমগ্র প্রকৃতি উৎকৃষ্ট উপাধি স্বরূপ। তাহাই বিশুদ্ধ-সত্ত্ব-প্রধান। তাহাতে উপহিত অর্থাৎ ঔপাধেয় স্বরূপ যে ব্রহ্মচৈতন্যাংশ তিনি সর্ব্বজ্ঞ, সর্ব্বেশ্বর, সর্ব্বনিয়ন্তা ইত্যাদি গুণ-যুক্ত। তিনিই অব্যক্ত, অন্তর্যামী, জগৎ-কারণ, এবং ঈশ্বর শব্দে কথিত হন। তিনি সমষ্টি প্রকৃতিকে অব্যক্তাবস্থা হইতে স্থাবর-জঙ্গমাত্মক বিচিত্র বাহ্য প্রকৃতিতে এবং মনোবুদ্ধিচিত্তাহংকার-বিশিষ্ট মানসিক প্রকৃতিতে ব্যক্ত-রূপে পরিণত করেন বলিয়া সর্ব্বজ্ঞ-শব্দের বাচ্য। এতাবতা বেদান্ত-দর্শনের ইহা দৃঢ়তর সিদ্ধান্ত যে, যাঁহা হইতে এই বিশ্বের জন্ম স্থিতি ভঙ্গ হয় তিনি ব্রহ্ম। তিনি অচেতন জড় প্রকৃতি নহেন, কিন্তু চৈতন্যময় ও সর্ব্বজ্ঞ। সর্ব্বজ্ঞত্ব ব্যতীত তাঁহার জগদ্‌যোনিত্ব সিদ্ধ হইতে পারে না।

৩০। উক্ত সিদ্ধান্তকে এই বর্ত্তমান "শাস্ত্রযোনিত্বাৎ" সূত্র দ্বারা আরো দৃঢ়তর করিতেছেন। শাস্ত্র শব্দে বেদ। সেই বেদের

তিনি যোনি। যোনি শব্দে জন্ম-স্থান। অর্থাৎ তিনি সর্ব্বপ্রকার জ্ঞান-প্রকাশক বেদশাস্ত্রের জন্ম-স্থান। তিনি যদি সর্ব্বজ্ঞ না হইতেন তবে এতাদৃশ বিবিধ বিদ্যার আধার, সর্ব্বার্থ-প্রকাশক, মহৎ ঋগ্বেদাদি শাস্ত্ররাশি তাঁহা হইতে কখনই উৎপন্ন হইত না। অতএব তিনি বেদের জন্মদাতা বিধায় সর্ব্বজ্ঞ হইতেছেন। তাঁহার শাস্ত্র-যোনিত্বই তাঁহার সর্ব্বজ্ঞত্বের বিশেষ প্রমাণ। শ্রীমান্ আনন্দগিরি কহিয়াছেন।

"ন কেবলং জগদ্‌যোনিত্বাদস্য সার্ব্বজ্ঞ্যং কিন্তু শাস্ত্রযোনিত্বাদপীতি যোজনা।"

কেবল জগদ্‌যোনিত্ব জন্য যে ব্রহ্মের সর্ব্বজ্ঞত্ব হয় এমত নহে কিন্তু শাস্ত্রযোনিত্ব জন্যও তাঁহার সর্ব্বজ্ঞত্ব সিদ্ধ হইতেছে। এই সূত্রের সমাস-ভেদে অর্থান্তরও আছে। "শাস্ত্রযোনিত্বাৎ" অর্থাৎ শাস্ত্রই যাঁহার স্বরূপ-জ্ঞান ও সর্ব্বজ্ঞত্বাদি বিশেষণ প্রতিপাদনের যোনি। কিন্তু এস্থানে বিপক্ষদিগের আপত্তি এই যে বেদশাস্ত্র ব্রহ্ম কর্ত্তৃক সৃষ্টও হয় নাই এবং তাহা ব্রহ্মপ্রতিপাদকও নহে। এই আপত্তি কোথা হইতে উৎপন্ন হইয়াছে এবং এই "শাস্ত্রযোনিত্বাৎ" সূত্র দ্বারা তাহা কিরূপে খণ্ডিত হইয়াছে অতঃপর তাহা বলা যাই-তেছে।

৩১। ভারতবাসীগণের পক্ষে ক্রিয়াবিধি ও ব্রহ্মজ্ঞান এ উভয় তত্ত্বের সম্বন্ধে বেদ কল্প-তরু-সদৃশ। সেই পরম শাস্ত্রকে ক্রিয়ানিষ্ঠগণ এক ভাবে এবং ব্রহ্মজ্ঞেরা অন্য ভাবে দৃষ্টি করেন। তন্মধ্যে ক্রিয়ানিষ্ঠগণের সিদ্ধান্ত এই যে প্রথমতঃ "বাচা বিরূপ-নিত্যয়া" বেদ নিত্য বাক্য। দ্বিতীয়তঃ "আম্নায়স্য ক্রিয়ার্থত্বাৎ" বেদ কেবল ক্রিয়ারই শাস্ত্র। বেদের নিত্যতা সম্বন্ধে তাঁহাদের উক্তি এই যে, বেদ-বিহিত ক্রিয়া সকল জীবের ঐহিক ও পার-লৌকিক ফলপ্রদ। জীবের আরম্ভ ও অন্ত কল্পনা করা অসম্ভব। সুতরাং জীব আদি-অন্ত-শূন্য নিত্য পদার্থ। কিন্তু উপ-জীবিকা

ব্যতীত কি ইহকালে, কি পরকালে জীবের জীবত্ব-ব্যবহার সম্ভবে না। কর্ম্ম-ফলই সেই উপজীবিকা। প্রকৃতির রূপ-বিশেষ অনাদি বাসনা সেই ফলের বীজ। তাহাকে অঙ্কুরিত ও পরিবর্দ্ধিত করিবার নিমিত্ত যে যত্ন, প্রার্থনা, আরাধনা ও যজ্ঞাদি-রূপ কার্য্য তাহার নাম ক্রিয়া। তাহা হইতে সম্ভোগার্থ যে জীবিকা লাভ হয় তাহার নাম কর্ম্মফল। অতএব ঐ বাসনা, ক্রিয়াসাধক মন্ত্র ও কর্ম্মফল নিত্যকাল জীবকে আশ্রয় করিয়া থাকে। গ্রন্থ, পত্র, লিপি, অধ্যায় প্রভৃতি যে বেদ এমত অভিপ্রায় নহে। সামান্যতঃ বেদ কেবল শব্দরাশি মাত্র। কিন্তু

"ঔৎপত্তিকস্তু শব্দস্য অর্থেন সহ সম্বন্ধঃ।"

অর্থের সহিত শব্দের সম্বন্ধ স্বাভাবিক ও নিত্য। এই হেতু বেদরাশির যে স্ফোট-স্বরূপ অর্থ তাহাই বেদ-শব্দের বাচ্য। বেদমন্ত্র সকল অর্থরূপে জীবের বাসনা হইতে স্ফুরিত হয়। সুতরাং বেদ নিত্য পদার্থ। তাহা বীজ, অঙ্কুর, ক্রিয়া ও ফল রূপে এবং অভ্যুদয়প্রদ ধর্ম্মরূপে নিত্যকাল জীবের স্বভাবে স্থিতি করিতেছে। প্রলয় দ্বারা বাহ্য শব্দরাশি বিনষ্ট হইলেও বেদের জীব-স্বভাবনিহিত অক্ষয় বীজের নাশ হয় না। অতএব বেদ ঈশ্বরকৃত নহে। এতাদৃশ অকৃত পদার্থ যে বেদ তাহার সৃষ্টিকরণরূপ ক্রিয়া ঈশ্বরেতে অর্শিতে পারে না এবং তাদৃশ ক্রিয়া দ্বারা তাঁহার সার্ব্বজ্ঞ্যরূপ মাহাত্ম্য সিদ্ধ হইতে পারে না। দ্বিতীয়তঃ বেদ স্বয়ংই ব্রহ্ম-শব্দ-বাচ্য অপৌরুষেয় পদার্থ, এবং তাহা কেবল ক্রিয়ারই শাস্ত্র। তাহা কোন সর্ব্বজ্ঞ ও জগৎকারণ ব্রহ্মের প্রতিপাদক নহে। কেন না ব্রহ্মবাদিগণের বর্ণিত জ্ঞানস্বরূপ ব্রহ্ম সৃষ্টি-সংসারের অতীত এবং স্বর্গাদি ভোগ যেমন ক্রিয়ার ফল তিনি তদ্রূপ কোন ভোগ্য ফল নহেন। এইরূপে বেদের ক্রিয়াপরতার দিকেই ক্রিয়ানিষ্ঠগণের দৃষ্টি। মহর্ষি জৈমিনি তাঁহাদের দর্শনকার। তদ্ভিন্ন অশ্বলায়ন, গোভিল,

কাত্যায়ন প্রভৃতি অনেক মহর্ষি শাখাভেদে কর্ম্মাঙ্গ বেদ-বিধি সকল স্ব স্ব স্মার্ত্ত সূত্রগ্রন্থে শ্রেণী পূর্ব্বক সুসজ্জিত করিয়াছেন। মহর্ষি জৈমিনির দর্শন-শাস্ত্রে ঐ সকল কর্ম্মাঙ্গভূত বেদরাশির মীমাংসা আছে। সেই জন্য তাহার নাম কর্ম্মমীমাংসা অথবা ধর্ম্মমীমাংসা। আর কর্ম্মকাণ্ডই বেদের পূর্ব্বকাণ্ড। জৈমিনিদর্শনে তাহার মীমাংসা আছে অথবা জৈমিনি প্রথমেই স্বীয় দর্শন প্রণয়ন করেন বলিয়া উহার আর এক নাম পূর্ব্বমীমাংসা।

৩২। মহর্ষি বাদরায়ণ বেদান্তদর্শন নামে বেদশাস্ত্রের উত্তর-পাদ-স্বরূপ ব্রহ্মকাণ্ডের যে অন্য এক মীমাংসা প্রস্তুত ও প্রচার করেন তাহাকে উত্তর-মীমাংসা কহে। তাহা ব্রহ্মজ্ঞদিগের ব্রহ্ম-জ্ঞানরূপ বৈদিক দৃষ্টির সপক্ষ। এজন্য তাহাকে ব্রহ্মমীমাংসা কহে। ইহার মতে ব্রহ্মই একমাত্র সত্য পদার্থ। তিনিই জগৎ, বেদ, যজ্ঞাদি ক্রিয়া, কর্ম্মফল প্রভৃতির যোনি, আশ্রয়, এবং লয়স্থান। তাঁহার আশ্রয়ে ও তাঁহার অনির্ব্বচনীয় শক্তি সহকারে এই ব্রহ্মাণ্ড সত্যের ন্যায় প্রকাশ পাইতেছে। সেই শক্তি কি পদার্থ, তাহার কি প্রকার ধাতু, কেন তাহা কখনও ব্যক্ত কখন অব্যক্ত তাহা কেহ বলেন নাই। কিন্তু তাহার প্রভাব আশ্চর্য্য। যে সকল পদার্থকে জগতের এই স্থিতিকালে আমরা ইন্দ্রিয়-গোচর স্থূল দ্রব্যরূপে দর্শন করিতেছি, সেই অনির্ব্বচনীয় শক্তি তাহার মূলীভূত উপকরণ; যে সকল পদার্থকে আমরা সুসূক্ষ্ম অদৃশ্য ইন্দ্রিয়-শক্তি, মন, বুদ্ধি, বাসনা, কামনা, মানসিক প্রকৃতি বলি তাহারও মূল ধাতু ঐ শক্তি। ঐ শক্তিই বিশ্বরূপে আবির্ভূত। কিন্তু প্রলয়ে উহা আবার অব্যক্ত, এবং মোক্ষে একেবারে লুপ্ত। এই সকল কারণে বেদান্ত শাস্ত্রে উহা মায়া নামে এবং এই জগতের আবির্ভাব তিরোভাব মায়িক বলিয়া কথিত হয়। জীবের শরীর ধারণ, সংসারাবস্থা, ধর্ম্মাধর্ম্ম, শুভাশুভ-ফল-ভোগ মায়িক ও পরমার্থতঃ অসত্য বলিয়া উক্ত হয়। ফলে

বেদান্ত-শাস্ত্র সে সমস্তকে আকাশকুসুম, শশশৃঙ্গ, বা বন্ধ্যার পুত্রের ন্যায় অসত্য কহেন না। কিন্তু শুক্তিতে রজতজ্ঞান, রজ্জুতে সর্প-বোধ, তেজ ও কাচে বারিবুদ্ধির ন্যায় মিথ্যা বলেন। কেন না সেই ঈশ্বরীয় অনির্ব্বচনীয় শক্তি, যাহাকে বুঝিয়া উঠা যায় না এসমস্ত তাহারই পরিণাম। সেই দৈব শক্তিতে এই জগৎ ও জৈবিক ব্যাপারের ভাণ হইতেছে। জগৎ ও শরীরাদি সহস্র সত্য হইলেও তাহা প্রকৃতির বিকার ভিন্ন অন্য কিছু নহে। প্রকৃতি ঈশ্বরেরই শক্তি। সুতরাং বেদান্ত বলেন "হে জীব, বুঝিয়া বল কাহাকে আমি, বা আমার শরীর বলিতেছ? শরীর ধরেন বলিয়া জীবের অর্থাৎ জীবাত্মার নাম শারীর। তাঁহার শরীর, সংসার, ধর্ম্ম, ফলভোগ, হর্ষ, বিষাদ এ সমস্ত প্রকৃতির বিকার। জীবাত্মা অর্থাৎ শারীরকে এই সমস্ত আবরণ হইতে পৃথক করিয়া বিশুদ্ধ ভাবে প্রতিপন্ন করাতে বেদান্তদর্শনের আর এক নাম শারীরক মীমাংসা। এ দর্শন ক্রিয়া, প্রকৃতি, অদৃষ্ট, ফল ও স্বর্গের পক্ষপাতী নহে; তৎপরিবর্ত্তে একমাত্র ব্রহ্মের পক্ষপাতী। ইহা স্থূল সূক্ষ্ম কারণাদি শরীরের পক্ষপাতী নহে, কিন্তু শারীর রূপ নির্ম্মল আত্মার পক্ষপাতী। ইহা জীবাত্মার মায়া-সম্বন্ধাধীন জীব-ভাবের পক্ষপাতী নহে, কিন্তু মায়ামুক্ত ও ব্রহ্মে যুক্ত তদীয় ব্রহ্মধাতুর পক্ষপাতী। এ দর্শনের মতে ব্রহ্মই বিশ্বযোনি এবং শাস্ত্রযোনি। তাঁহা হইতে এই বিশ্ব, জীব, মানব-প্রকৃতি, ধর্ম্মার্থ-কাম-মোক্ষ-বিধায়ক জ্ঞান, বিজ্ঞান, বিধি, ক্রিয়া সমস্তই স্বভাবতঃ জন্মে। তাঁহা হইতে বিচ্ছিন্ন হইয়া স্থূল সূক্ষ্ম কোন পদার্থ, কোন তত্ত্ব, কোন বিধি, কোন জ্ঞান স্বতন্ত্ররূপে উৎপন্ন হইতে পারে না। অতএব সর্ব্বজ্ঞানের আকরস্বরূপ মহামহিমান্বিত ঋগ্বেদাদি শাস্ত্রও তাঁহা হইতে স্বভাবতঃ উৎপন্ন হইয়াছে। যেমন তাঁহা হইতে উৎপন্ন হইয়া, তাঁহা কর্ত্তৃক প্রতিপালিত থাকিয়া এবং তাঁহাতে বিলয়োন্মুখী হইয়া এই বিশ্বসংসার সহস্র হস্ত উত্তোলন

পূর্ব্বক তাঁহাকে অরুন্ধতী ন্যায়ে তটস্থ লক্ষণে দেখাইয়া দিতেছে; সেইরূপ, হৃদয়গত প্রার্থনার শেষ ফল স্বরূপ, হৃদয়কমলবাসী পরমাত্মার জ্ঞাপক, মহাপবিত্র বেদশাস্ত্র তাঁহা হইতেই স্বভাবতঃ সমুদ্ভূত হইয়া তাঁহার সর্ব্বজ্ঞত্বাদি ধর্ম্মকে এবং তাঁহার পরম পবিত্র জ্ঞানকে তটস্থ ও স্বরূপ উভয় লক্ষণ দ্বারা কহিতেছে। সুতরাং ব্রহ্ম যেমন বেদের কারণ, বেদও সেইরূপ তাঁহার যথাবৎস্বরূপ-জ্ঞাপক।

৩৩। কিন্তু ক্রিয়াবাদিগণের আপত্তি এই যে বেদ অপৌরুষেয়। তদ্যোনিত্ব-কল্পনা দ্বারা ব্রহ্মের সর্ব্বজ্ঞত্ব সিদ্ধ হইতে পারে না। দ্বিতীয়তঃ বেদ কেবল ক্রিয়ার শাস্ত্র, তাহাতে ব্রহ্মরূপ কোন পরম বস্তুর স্বরূপ লক্ষণ বা তটস্থ লক্ষণ কি রূপে থাকিবে ?

বেদান্ত দর্শন এই উপস্থিত "শাস্ত্রযোনিত্ব" সূত্রে উক্ত আপত্তির মীমাংসা করিতেছেন। পূজ্যপাদ শঙ্করাচার্য্য এই সূত্রের ভাষ্যে লিখিয়াছেন।

"অনেকশাখাভেদভিন্নস্য দেবতির্য্যঙ্‌মনুষ্যবর্ণাশ্রমাদিপ্রবিভাগহেতোঋর্গ্বেদাদ্যাখ্যস্য সর্ব্বজ্ঞানাকরস্যাপ্রযত্নেনৈব লীলান্যায়েন পুরুষনিশ্বাসবদ্যস্মান্মহতোভূতাদ্যোনেঃ সম্ভবঃ 'অস্য মহতোভূতস্য নিশ্বসিতমেতদ্‌যদৃগ্বেদ' ইত্যাদি শ্রুতেঃ। তস্য মহতোভূতস্য নিরতিশয়ং সর্ব্বজ্ঞত্বং সর্ব্বশক্তিমত্বঞ্চেতি।"

অনেক শাখাতে বিভক্ত, দেবতির্য্যক্ মনুষ্যগণের বর্ণাশ্রমাদি বিভাগের হেতু, সর্ব্বজ্ঞানের আকরস্বরূপ ঋগ্বেদাদি শাস্ত্র সকল নিশ্বাস-ক্ষেপণের ন্যায় বিনা প্রযত্নে অবলীলাক্রমে যে মহৎ পুরুষ হইতে উৎপন্ন হইয়াছে এবং শ্রুতিতেও উক্ত ঋগ্বেদাদি শাস্ত্রকে যে মহৎ পুরুষের নিশ্বসিত কহিতেছেন, তাঁহার সর্ব্বজ্ঞত্ব ও সর্ব্বশক্তিত্ব অতিশয় মহৎ তাহাতে আর সন্দেহ নাই। আচার্য্যেরা ভাষ্যকারধৃত উক্ত শ্রুতির অর্থ করিয়াছেন যথা

"যদৃগ্বেদাদিকমস্তি তদেতস্য নিত্যসিদ্ধস্য ব্রহ্মণোনিশ্বাসইবাপ্রযত্নেন সিদ্ধমিত্যর্থঃ।"

জীবগণ যেমন বিনা প্রযত্নে নিশ্বাস ত্যাগ করেন, সেইরূপ সেই নিত্যসিদ্ধ ব্রহ্মের সকাশ হইতে স্বভাবতঃ অবলীলাক্রমে ঋগ্বেদাদি শাস্ত্র নির্গত হয়। বেদের উৎপত্তিকে সেই হেতু শাস্ত্রে "নিশ্বসিত ন্যায়" কহেন। এরূপ উৎপত্তি অপ্রযত্নোৎপত্তি মাত্র। তাহা ইষ্টসাধনপরা বুদ্ধি বা প্রবৃত্তি-পূর্ব্বক নহে। * সর্ব্বজ্ঞানাকর, চতুর্ব্বর্গফলের কল্পবৃক্ষ-স্বরূপ সেই সনাতন বেদশাস্ত্র মূলতঃ ব্রহ্ম হইতে স্বভাবতঃ উৎপন্ন হইয়াছে। তাঁহার বলক্রিয়াও যেমন স্বভাবসিদ্ধ তাঁহার জ্ঞানক্রিয়াও সেইরূপ স্বভাবসিদ্ধ। সুতরাং ব্রহ্মই সর্ব্বশক্তিমান, জগৎকারণ, সর্ব্বজ্ঞ এবং জ্ঞানস্বরূপ। বেদবাণী সকল কেবল ঋষিদিগের কণ্ঠনিঃসৃত নহে। তৎসমূহ তাঁহাদের হৃদয়-নিঃসৃত। কেন না তৎসমস্তই অর্থ ও ভাবযুক্ত। সমস্ত বেদমন্ত্রই কামনা-প্রকাশক, ফলার্থ দৈব ক্রিয়ার সাধক অথবা নিষ্কাম মোক্ষপ্রদ জ্ঞান-প্রকাশক। মানবের যখন যেমন অবস্থা, যেমন অধিকার, যেমন ধারণা, যেমন জ্ঞান জন্মে, ঐ বাণী সকল প্রস্থান-ভেদে ও বিভাগক্রমে তাহারই উত্তর-সাধক হয়। অতএব ঋষিগণের হৃদয় হইতে ধর্ম্ম ও ব্রহ্ম-প্রতিপাদক যে সকল বাণী নির্গত হইয়াছে এবং যাহা নর-স্বভাবের সাক্ষাৎ প্রতিমূর্ত্তিস্বরূপ বর্ত্তমান আছে, তাহা যে ঈশ্বরীয় বিধি ও ঈশ্বর-প্রণীত-ভাব-পূর্ণ তাহাতে আর সন্দেহ কি? আমাদের সমগ্র মনোভাবের যিনি নিয়ন্তা তিনি যে ধর্ম্মার্থ-কাম-মোক্ষ-বিধায়ক মনোভাব নিচয়েরও নিয়ন্তা তাহাতে আর সংশয় কি? যিনি সকলের মনের ভাব সামান্য ও বিশেষরূপে জানেন; যে মহাপুরুষ বাহ্য ও মানব প্রকৃতির সমষ্টিভাবগত গুণ, ধর্ম্ম, অবগত আছেন এবং যিনি স্বয়ং সেই সকল ভাব, গুণ, ধর্ম্ম ও জ্ঞানের উৎস; তিনি যে একেবারেই সর্ব্বজ্ঞ,

* বিশ্বও এইরূপে স্বভাবতঃ ব্রহ্ম হইতে উৎপন্ন হয়। অতিরিক্ত পত্র সংখ্যা ৫ দ্রষ্টব্য।

জগৎকারণ, বেদবিধির আকরস্থান ও বেদশাস্ত্রের সৃষ্টিকর্ত্তা তাহাতে আর সংশয় কি ?

৩৪। সেই রত্নকল্প ধর্ম্মজীবন-স্বরূপ, ভাবরাশি-স্বরূপ বেদরাশি কল্পে কল্পে চিরজীবনসখার সকাশ হইতে নির্গত হইয়া নর-হৃদয়কে অধিকার করিয়া থাকে। যুগে যুগে ঋষিগণ সেই অমূল্য ভাবরাশিকে কণ্ঠনিঃসৃত বাণী দ্বারা কীর্ত্তন করেন। তাহাই লিপিবদ্ধ হইয়া বেদরূপ গ্রন্থ নামে প্রসিদ্ধ হয়। কিন্তু কোন বিশেষ নরে বেদের কোনরূপ কর্ত্তৃত্ব অর্শে না। কেবল সমষ্টি নরস্বভাবের মূল উৎসস্বরূপ ব্রহ্মেতেই তাহা অর্শিয়া থাকে। ঈশ্বর, সর্ব্বজ্ঞ, হিরণ্যগর্ভ, ব্রহ্মা, বিরাট প্রভৃতি নাম কারণ, সূক্ষ্ম, স্থূলাদি অবস্থা-ভেদে সেই এক ব্রহ্মেতেই আরোপিত হয়। এজন্য শাস্ত্রে কোন স্থানে বেদ সর্ব্বজ্ঞ-ঈশ্বর-কৃত কোথাও হিরণ্যগর্ভ-প্রণীত এবং কোন স্থানে বা ব্রহ্মা বা বিরাট পুরুষ হইতে উদ্ভূত কহিয়াছেন। ইহাতে অর্থের ভেদ নাই। পর ব্রহ্মের যে পাদ সৃষ্টিসংসারে ও সমষ্টি প্রকৃতিতে প্রবিষ্ট হইয়া আছে, ঐ সমস্ত নামই সেই পাদকে নির্দ্দেশ করিতেছে। সমষ্টি প্রকৃতির যেরূপ কারণ, সূক্ষ্ম, স্থূল অবস্থাত্রয় আছে ; তদনুপ্রবিষ্ট ব্রহ্মেরও সেইরূপ কারণ, সূক্ষ্ম, স্থূল এই অবস্থাত্রয় পরিকল্পিত হয় ; তত্তদবস্থাপন্ন জগতেরও তদ্রূপ বীজ বা কারণাবস্থা, সূক্ষ্ম বা অঙ্কুরাবস্থা সুব্যক্ত বা স্থূলাবস্থা আছে ; এবং অবিকল সেইরূপ মানব-স্বভাবের ও মানবের জ্ঞানধর্ম্মের দর্পণ-স্বরূপ বেদরূপ ভাবরাশিরও তিন অবস্থা স্বীকৃত হয়। প্রলয়াবস্থায় সেই বেদরূপ ভাবরাশি সমষ্টি মানব-স্বভাবের সহিত নিরুদ্ধবৃত্তিতে কারণ-স্বরূপ ঈশ্বরেতে লীন থাকে। তাহাই বেদের বীজাবস্থা। সূক্ষ্ম-সৃষ্টিকালে অতিসূক্ষ্ম গর্ব্ভাঙ্কুরস্বরূপ, জীবগণের সমষ্টি মনোরাজ্যাধিষ্ঠাতৃস্বরূপ নবোদিত হিরণ্যগর্ব্ভের সহিত তাহা বিকাশোন্মুখী হয় এবং জগতের ব্যক্তাবস্থার নিমিত্তে অপেক্ষা করিয়া থাকে। তাহাই

বেদের অঙ্কুরাবস্থা। স্থূল সৃষ্টিকালে বাক্‌শক্তিযুক্ত ভাবপরিপূরিত হৃদয়বিশিষ্ট জৈবিক স্থূলদেহের সম্ভাব হেতু, সেই বেদরূপ ভাবরাশি সমষ্টি স্থূল দেহের অধিষ্ঠাতা বিরাট পুরুষের সকাশ হইতে ঋষি-দিগের হৃদয়, কণ্ঠ ও রসনা-যোগে মূর্ত্তিমতী বাণী স্বরূপে স্থূল সৃষ্টির উপযোগী হইয়া থাকে। তাহাই বেদের সুব্যক্তাবস্থা। এইরূপে নিষ্পাপস্বভাব সরলচিত্ত সাধু ঋষিগণের পবিত্রভাবোন্মত্ত হৃদয় হইতে বেদবাণী সকল স্বভাবতঃ উৎপন্ন হয়। তাহাতে কোন বিশেষ ঋষির বুদ্ধির কর্ত্তৃত্ব নাই। কেবল তাদৃশ হৃদয়সমষ্টিতে উপহিত চৈতন্যস্বরূপ, জীবঘন বীজ-পুরুষ-স্বরূপ, হিরণ্যগর্ব্ভ বা ব্রহ্মাস্বরূপ, সর্ব্বজ্ঞ জগৎকারণ ঈশ্বরেরই প্রেরণা দ্বারা তাহা উৎপন্ন হইয়া থাকে।

৩৫। পুরুষসূক্তে আছে

তস্মাৎ যজ্ঞাৎ সর্ব্বহুতঃ ঋচঃ সামানি যজ্ঞিরে।
ছন্দাংসি যজ্ঞিরে তস্মাদ্ যজুস্তস্মাদজায়ত॥

সেই সর্ব্বহুত ব্রহ্মরূপী যজ্ঞ হইতে ঋক্, সাম, ছন্দ ও যজুর্বেদ উৎপন্ন হইল।* এস্থলে আচার্য্যেরা লিখিয়াছেন—

---

* পুরুষসূক্ত পাঠ করিলে বুঝা যাইবে যে, তথায় ব্রহ্মকে সমষ্টি স্থূল সৃষ্টির অধিষ্ঠাতা-রূপে বর্ণন করিয়াছেন। সে ভাবে তিনি বিরাট পুরুষ রূপে পরি-কল্পিত হয়েন। কিন্তু প্রকৃত প্রস্তাবে তিনি একমাত্র, অরূপী ও অবর্ণ। তাঁহা হইতে চন্দ্র সূর্য্য গ্রহতারাদি-খচিত এই বিচিত্র বিশ্বরাজ্য এবং ইন্দ্রিয়-সৌষ্ঠব-দেহবিশিষ্ট, জ্ঞানধর্ম্মযুক্ত মানবগণে পরিপূর্ণ ভূলোক প্রসূত হওয়ায়, তিনি সর্ব্ব জীবের বীজ পুরুষ, এবং সমস্ত ধর্ম্মের উৎস বলিয়া গৃহীত হন। "তাঁহার ঐ বিরাট মূর্ত্তির অবয়ব-সংস্থান দ্বারা ভূর্লোকাদি সমস্ত লোক কল্পিত হয়।" পরব্রহ্মের স্থূল সৃষ্টিতে প্রবেশ, ও নিয়ন্তৃরূপে অবস্থান-ঘোষণার্থে ঐ মূর্ত্তির কল্পনা। তিনি যখন সমগ্র ব্রহ্মাণ্ডের বীজ পুরুষ, তখন অবশ্য তাঁহাতে সমস্ত জগতেরই অঙ্গ বীজ রূপে স্থিতি করে। ইহার তাৎপর্য্য এই যে জগতের উপাদান-কারণ-স্বরূপিণী প্রকৃতি তাঁহার শক্তি বিধায়, ঐ প্রকৃতিকে অধিকার পূর্ব্বক এই কল্পনা উৎপন্ন হইয়াছে। এই কল্পনার প্রকারান্তরও আছে। যথা, এই স্থূল সৃষ্টির অংশে অংশে ব্রহ্ম অনুস্যূত থাকায় সেই নানা অংশ হইতে তাঁহার প্রভাব সমস্ত

অপ্রযত্নোৎপন্তৌচার্থং বুদ্ধা বিরচিতঃ কালিদাসাদি বাক্যৈঃ বৈলক্ষণ্যাদপৌরুষেয়ত্বং প্রতিসর্গং পূর্ব্বসাম্যেনোৎপত্তেঃ প্রবাহরূপেণ নিত্যতা, অতঃ সর্ব্বজগদ্ব্যবস্থাবভাসিবেদকর্তৃত্বনিরূপণেন সর্ব্বজ্ঞত্বং নিরূপিতং ভবতি।

বেদশাস্ত্র নিশ্বাসের ন্যায় ব্রহ্মের সকাশ হইতে অপ্রযত্নে উৎ-

চয়ন পূর্ব্বক তাঁহার বীজভাব সম্পন্ন করা। এইরূপ আংশিক প্রভাব দ্বারা পূর্ণপ্রভাবকে লাভ করার নাম "অন্বয়" এবং পূর্ণভাবকে খণ্ড খণ্ড করিয়া অংশজ্ঞানগ্রহণের নাম "ব্যতিরেক"। পুরুষসূক্তে যে যজ্ঞের উল্লেখ আছে তাহা রূপকব্যাজে ঐ প্রকার অন্বয়-ব্যতিরেক-রূপ ব্রহ্মজ্ঞানকে নির্দ্দেশ করিতেছে। ব্রহ্মলাভই সেই যজ্ঞের উদ্দেশ্য ছিল। সে যজ্ঞে সমষ্টি স্থূল সৃষ্টিতে উপহিত চৈতন্যস্বরূপ ব্রহ্মই যজ্ঞপুরুষ; ব্যষ্টি রূপে স্বয়ং তিনিই স্বীয় বৈরাটিক অঙ্গ প্রত্যঙ্গ এবং স্বয়ংই যজ্ঞের বলি ও হবি প্রভৃতি উপকরণ ছিলেন। এই যজ্ঞ হইতে ঋক্ ও সাম সূক্ত সকল এবং ছন্দ ও যজুর্ব্বেদ জন্মিল। ব্রাহ্মণেরই বেদে অধিকার। বিধিপূর্ব্বক বেদ পাঠ, বেদমন্ত্রোচ্চারণ দ্বারা ক্রিয়াসাধন, বেদের অধ্যাপনা, এ সমস্তই ব্রাহ্মণের অর্থাৎ বেদজ্ঞ বা ব্রহ্মজ্ঞস্বরূপ যে উচ্চ বংশ তাঁহাদের মুখে হইয়া থাকে। কিন্তু মূলতঃ বেদশাস্ত্র ব্রহ্মের সৃষ্ট। সুতরাং সমষ্টি ব্রহ্মজ্ঞগণকে বিরাট পুরুষের মুখ বলিয়া গ্রহণ করিয়াছেন। "ব্রাহ্মণোঽস্য মুখমাসীৎ।" এই যজ্ঞে ব্রাহ্মণই তাঁহার মুখ ছিলেন। অর্থাৎ সৃষ্টির অঙ্গ-সমন্বয় দ্বারা যখন বিরাট পুরুষ কল্পিত হইলেন, তখন ব্রাহ্মণই মুখ-স্থানীয় হইলেন। সেই সমষ্টি-ব্রহ্মমুখ হইতে বেদের জন্ম আর স্বয়ং তাঁহা হইতে বেদের জন্ম একই কথা। এই সর্ব্বহুত ব্রহ্মযজ্ঞে কোন পশুবধ হয় নাই। ইহাতে যাজ্ঞিকেরা সেই ব্রহ্মকে ব্যতিরেক ন্যায়ে অর্থাৎ সৃষ্টির বিশিষ্ট প্রভাবনিচয়ে বিভক্ত রূপে অবতীর্ণ দেখিয়াছিলেন। এই ব্যতিরেককরণ-রূপ ক্রিয়া দ্বারা ব্রহ্ম যেন খণ্ড খণ্ড রূপে ছেদিত হইলেন। এজন্য কথিত হইয়াছে যে সেই যাজ্ঞিকেরা এই যজ্ঞে সেই বিরাটরূপী প্রথমজাত বীজ পুরুষকে বলি-স্বরূপে ছেদন করিলেন। তাঁহার সেই ছেদিত খণ্ড সকল তাঁহারই শরীরোদ্ভূত এবং অঙ্গ-স্বরূপ। তন্মধ্যে তাঁহার মুখ ব্রাহ্মণ রূপে অথবা ব্রাহ্মণ তাঁহার মুখরূপে প্রকাশ পাইলেন। ক্ষত্রিয়, বৈশ্য, শূদ্র ক্রমে তাঁহার বাহু, উরু, চরণ স্বরূপে, অথবা তাঁহার বাহু, উরু, চরণ ক্ষত্রিয়াদি রূপে গৃহীত হইলেন। অথবা লক্ষণাপ্রয়োগে ইহাই বল যে তাঁহার সেই সমস্ত অঙ্গ হইতে ইহাঁরা সকলে জন্মিলেন। তাৎপর্য্যতঃ সমস্তই তাঁহা হইতে উৎপন্ন। এই যজ্ঞে চন্দ্র, সূর্য্য, দিক্, বায়ু, ইন্দ্রাগ্নি, অন্তরীক্ষ, দ্যুলোক, এবং ভূমি তাঁহার হৃদয়, নেত্র শ্রোত্র, নাসিকা, বদন, নাভি, মস্তক ও পদ হইতে ক্রমে উৎপন্ন হওয়া কথিত হইয়াছে। এ সমস্তই রূপক। কিন্তু সমস্তই তাঁহা কর্তৃক সৃষ্ট হইয়াছে এই অভিপ্রায়। সমষ্টি স্থূল সৃষ্টির তিনি বীজ, এ সমস্ত তাঁহারই মহিমা ইহাই জ্ঞাপন উদ্দেশ্য। বেদশাস্ত্রকেও সেইরূপ রূপক-ব্যাজে তাঁহার মুখের বাক্য কহিয়াছেন, কিন্তু তাৎপর্য্য এই যে ধর্ম্মার্থ-কামমোক্ষ প্রভৃতি সর্ব্ব প্রকার জ্ঞানের

পন্ন হইয়াছে। তাহা তাঁহা কর্ত্তৃক বুদ্ধি পূর্ব্বক বা প্রবৃত্তিবশতঃ সৃষ্ট হয় নাই। এই জন্য তাহা অপৌরুষেয়। তাহা প্রতিকল্পে পূর্ব্বকল্পের ন্যায় সমান ভাবে ও সমান দেবতা, ছন্দ ও ঋষির সহিত প্রকটিত ও উচ্চারিত হয় সুতরাং তাহা প্রবাহরূপে নিত্য। সমুদয় জগতের ব্যবস্থা-সম্পাদক সেই বেদের যোনি বিধায় ব্রহ্মের সর্ব্বজ্ঞত্ব সিদ্ধ হইল। আচার্য্যদিগের এই ব্যাখ্যার তাৎপর্য্য এই যে বেদ অপৌরুষেয় ও নিত্য বটে; কিন্তু কোন পুরুষ-বুদ্ধির কৃত নহে বলিয়া এবং অপ্রযত্নে নিশ্বসিত ন্যায়ে উৎপন্ন বলিয়া "অপৌরুষেয়"। পূর্ব্ব-মীমাংসার মতাবলম্বীগণ তাহাকে ঈশ্বরের সৃষ্ট নহে বলিয়া যে "অপৌরুষেয়" কহেন তাহা অযুক্ত। কেননা তাহা ঈশ্বর হইতেই উৎপন্ন। তাহা একাদিক্রমে নিত্য নহে, কিন্তু প্রবাহ-রূপে নিত্য।

দ্বিতীয় অর্থের তাৎপর্য্য।

৩৬। অতঃপর পূর্ব্বোক্ত ঋগ্বেদাদি শাস্ত্রই ব্রহ্মের যথাবৎ স্বরূপ-জ্ঞানের প্রমাণ। এ স্থলে ভাষ্যকার পূজ্যপাদ শঙ্করাচার্য্য কহিয়াছেন।

"শাস্ত্রাদেব প্রমাণাজ্জগতোজন্মাদিকারণং ব্রহ্মাধিগম্যত।
তৎ শাস্ত্রমুদাহৃতং পূর্ব্বসূত্রে, যতোবা ইমানি ভূতানি জায়ন্ত ইত্যাদি।"

কেবল শাস্ত্র-প্রমাণ দ্বারাই এই জগতের জন্ম-স্থিতি-ভঙ্গের কারণ ব্রহ্মের স্বরূপ নিরূপিত হয়। পূর্ব্বসূত্রে সেই শাস্ত্র-প্রমাণ উদাহৃত হইয়াছে। অর্থাৎ "যতোবা ইমানি ভূতানীত্যাদি" এই

আকর স্বরূপ বৈদিক্ ভাবরাশি তাঁহারই অক্ষয় নিয়ম হইতে উৎপন্ন। ঋষিরা মহা পবিত্র দৃষ্টিতে তৎসমূহকে সাক্ষাৎ ব্রহ্ম-বাক্য রূপে গ্রহণ করিয়াছেন। ফলতঃ বেদ অতি পবিত্র শাস্ত্র। আর আর সমস্ত ধর্ম্ম ও জ্ঞানশাস্ত্র সেই পরমাকর হইতে উদ্ভূত।

বেদ-বাক্য দ্বারা প্রথমে তটস্থ লক্ষণে ব্রহ্মনিরূপণ করিয়াছেন। পশ্চাৎ উক্ত শ্রুতি যে প্রকরণে আছে তাহার শেষ ভাগে "আনন্দাদ্ধ্যেব খল্বিমানি ভূতানি জায়ন্তে" আনন্দ হইতে এই ভুত সকল উৎপন্ন হয়; "রসোবৈ সঃ" সেই পরমাত্মা রসস্বরূপ; "সৈষা ভার্গবী বারুণী বিদ্যা পরমে ব্যোমন্ প্রতিষ্ঠিতা" বরুণ-প্রোক্তা ভৃগু-কর্ত্তৃক বিদিতা এই ব্রহ্মবিদ্যা হৃদয়ের পরমাকাশে প্রতিষ্ঠিত; ইত্যাদি যে সমস্ত নির্ণয় ও সমাহার বাক্য আছে তাহার দ্বারা ব্রহ্মের স্বরূপ লক্ষণ প্রদর্শিত হইয়াছে। এ স্থলে জিজ্ঞাসা করিতে পার যে, যদি পূর্ব্ব-সূত্রেই উক্ত প্রকার শাস্ত্র-প্রমাণ সকল উদাহরণ দিয়া ব্রহ্মের শাস্ত্রযোনিত্ব এবং তটস্থ ও স্বরূপ লক্ষণ জ্ঞাপন করিয়াছেন, তবে এই বর্ত্তমান "শাস্ত্রযোনিত্বাৎ" সূত্র নিষ্প্রয়োজন। ইহার উত্তরে ভাষ্যকার কহিতেছেন।

"তত্র সূত্রাক্ষরেণ স্পষ্টং শাস্ত্রস্যানুপাদানাজ্জন্মাদি কেবলমনুমানমুপন্যস্তমিত্যাশঙ্কেত। তামাশঙ্কাং নিবর্ত্তয়িতুমিদং সূত্রং প্রববৃতে।"

পূর্ব্ব সূত্রের অক্ষর-বিন্যাসের মধ্যে স্পষ্ট বাক্যে "শাস্ত্র" অথবা "বেদ" শব্দ উক্ত না হওয়ায় কেহ আশঙ্কা করিতে পারেন যে, তথা জগতের জন্ম-স্থিতি-ভঙ্গ দ্বারা যে ব্রহ্ম-নিরূপণ করিয়াছেন, তাহা কেবল অনুমান-উপন্যাস দ্বারা বা প্রসঙ্গাধীন করিয়াছেন। তাদৃশ আশঙ্কা দূর করিবার নিমিত্তে এই শাস্ত্রযোনিত্বাৎ সূত্র উপস্থিত করা হইয়াছে এবং ইহার দ্বারা এই মীমাংসা হইল যে, "ঈশ্বর বেদের জন্মদাতা এবং প্রতিপাদ্য।"

৩৭। এই সূত্রোপলক্ষে আচার্য্যেরা পূর্ব্বপক্ষ করিয়াছেন যে পরব্রহ্মের স্বরূপ যেমন বেদবেদ্য সেইরূপ তাহা প্রত্যক্ষাদিরও গম্য কি না? এ আশঙ্কার এই উত্তর প্রদত্ত হইয়াছে।

"রূপরসাদ্যভাবান্নেন্দ্রিয়যোগ্যতালিঙ্গসাদৃশ্যাদিরাহিত্যাচ্চ নানুমানোপমানাদি-

যোগ্যতা উপনিষৎস্বেবাধিগতমিতি ব্যুৎপত্ত্যা নাবেদবিন্মনুতে তং বৃহন্তমিত্যন্য নিষেধশ্রুত্যা চ বেদৈকমেয়ত্বং।”

পরব্রহ্মেতে রূপ রসাদি নাই। সে জন্য তাঁহার স্বরূপ ইন্দ্রিয়-গোচর অর্থাৎ প্রত্যক্ষযোগ্য নহে। পরব্রহ্মেতে লিঙ্গসাদৃশ্যও নাই। সে জন্য তাঁহার স্বরূপ অনুমান ও উপমানের গ্রাহ্য নহে। কেবল একমাত্র শ্রুতি ও হৃদয়ের অনুভব-বলে তাঁহার জ্ঞান লাভ হয়। বেদবাক্য সকল বিচার দ্বারা হৃদয়ঙ্গমরূপ অনুভবেতে পর্য্যবসিত হইলেই তাঁহার স্বরূপের অবগতি হয়। অতএব পরব্রহ্ম বেদবেদ্য ইহা সিদ্ধ হইল। “অথাতোব্রহ্মজিজ্ঞাসা” সূত্রে ভাষ্যকার কহিয়াছেন।

শ্রুত্যাদয়োঽনুভবাদয়শ্চ যথাসম্ভবমিহ প্রমাণং।

ব্রহ্মস্বরূপের জ্ঞানলাভার্থ শ্রুতি ও অনুভব উভয়ই প্রমাণ। অর্থাৎ বেদের কেবল উচ্চারণ-যোগ্য বাক্যমাত্র প্রমাণ নহে। এবং কেবল মাত্র অনুভবও প্রমাণ নহে। কিন্তু হৃদয়ঙ্গম হইয়া বেদ-বাণীর যে ব্রহ্মরূপ স্ফোট জন্মে তাহাই প্রকৃত বেদ এবং সেই বেদই ব্রহ্মজ্ঞানের প্রমাণ। এতাবতা এই মীমাংসা হইল যে বেদই ব্রহ্মের যথাবৎ স্বরূপ জ্ঞানের হেতু।

৩৮। কিন্তু এরূপ মীমাংসায় সন্দেহ দূর হইল না। কেননা, বেদের ব্রহ্ম-স্বরূপ-প্রতিপাদকতা ও ব্রহ্মপরতার বিরুদ্ধে বিস্তর আপত্তি আছে। মহাত্মা রামমোহন রায় স্বীয় বেদান্তভাষ্যে মীমাংসা করিবার মানসে এই পূর্ব্বপক্ষটী গ্রহণ করিয়াছেন—যথা

“বেদ ব্রহ্মকে কহেন এবং কর্ম্মকেও কহেন তবে সমুদয় বেদ কেবল ব্রহ্মের প্রমাণ কিরূপে হইতে পারেন?”

এই পূর্ব্বপক্ষের তাৎপর্য্য এই যে বেদের মধ্যে কেবলই যে ব্রহ্ম-স্বরূপ-প্রতিপাদক শ্রুতি আছে এমত নহে। তাহাতে ইন্দ্রাগ্নি বায়ু, বরুণ, সূর্য্য, সোম, রুদ্র, বিষ্ণু, প্রজাপতি প্রভৃতি নানা দেবতার

উদ্দেশে নানাবিধ যজ্ঞ বন্দনার বিধি, ও নানাবিধ ক্রিয়ার ফলশ্রুতি সকল বিদ্যমান আছে। অতএব সমস্ত বেদ ব্রহ্মস্বরূপকে প্রতিপন্ন করে ইহা বলা অযুক্ত এবং অশাস্ত্র। তবে জ্ঞানকাণ্ডীয় শ্রুতি সকল তাঁহার স্বরূপ-প্রকাশক এবং কর্ম্মকাণ্ডীয় শ্রুতি সমূহ দেবতা-জ্ঞাপক ইহা বলা যাইতে পারে। মহাত্মা রামমোহন রায়ের এই পূর্ব্বপক্ষটী অতি সঙ্গত। পূজ্যপাদ শঙ্করাচার্য্য স্বীয় শারীরক ভাষ্যে উক্ত প্রকার পূর্ব্বপক্ষ গ্রহণ করেন নাই। তিনি কেবল বেদান্তের বিরোধী পূর্ব্বমীমাংসা পক্ষীয় নিম্নস্থ আপত্তি সকল বিচারার্থ উপস্থিত করিয়াছেন।

১ "বেদান্তানাং আনর্থক্যমক্রিয়ার্থত্বাৎ"

২ "কর্ত্তৃদেবতাদি প্রকাশনার্থত্বেন বা; ক্রিয়াবিধিশেষত্বমুপাসনাদিক্রিয়ান্তর-বিধানার্থত্বং বা"।

৩ "নহি পরিনিষ্ঠিতবস্তু প্রতিপাদনং সম্ভবতি প্রত্যক্ষাদিবিষয়ত্বাৎ পরিনিষ্ঠিতবস্তুনঃ তৎপ্রতিপাদনেচ হেয়োপাদেয়রহিতে পুরুষার্থাভাবাৎ॥"

এই সকল পূর্ব্বপক্ষের তাৎপর্য্য সহিত অর্থ এই যে (১) ব্রহ্ম-প্রতিপাদক বেদবাক্য সকল যাহা সাধারণতঃ বেদান্ত শাস্ত্র নামে গৃহীত হয়, তাহা অক্রিয়াপর অর্থাৎ যজ্ঞাদি-ফল-প্রদ ক্রিয়াতে তাহার উদ্দেশ্য নাই। সুতরাং তাদৃশ ক্রিয়াবর্জ্জিত বেদান্তশাস্ত্র অনর্থক। তাহার কোন প্রামাণ্যই হইতে পারে না। কেননা, 'আম্নায়স্য ক্রিয়ার্থত্বাৎ' কেবল ক্রিয়ার জন্যই বেদের প্রতিষ্ঠা। (২) তবে যদি বৈদান্তিকেরা এরূপ তাৎপর্য্যে সম্মত হন যে, পূর্ব্বমীমাংসায় যজ্ঞ ও মন্ত্রাধিষ্ঠাতৃ যে সকল ফলদাতা দেবতার উল্লেখ আছে বেদান্তবাক্য সকল কেবল সেই সকল দেবতার জ্ঞাপক এবং বেদান্তদর্শনখানি ক্রিয়া-বিধির দর্শনস্বরূপ পূর্ব্বমীমাংসার পরিশিষ্ট মাত্র, তাহা হইলে ক্রিয়াপরত্ব জন্য ও ক্রিয়াধিষ্ঠাতৃ-দেবতা-প্রকাশক বিধায় বেদান্তের প্রামাণ্য হইতে পারে। নচেৎ পারে না। হয়, তাহাই বলিতে

হইবে, না হয়, বেদান্তশাস্ত্রকে সম্পূর্ণরূপে অন্যপ্রকার ক্রিয়ার শাস্ত্র বলিয়া মানিতে হইবে। তাহা এই। শ্রবণ, মনন, ধ্যান, ধারণা, নিদিধ্যাসন, প্রভৃতি ক্রিয়া দ্বারা মোক্ষরূপ-ফলদাতা দেবতারূপে ব্রহ্মের উপাসনা। পূর্ব্বমীমাংসাবাদীগণ কহেন যে, এ সকল শ্রবণাদিও তো ক্রিয়া। সুতরাং যদি উপরি-উক্ত তাৎপর্য্য না গ্রহণ করা হয়, তবে, এই শেষোক্ত তাৎপর্য্যানুসারে বেদান্তশাস্ত্রকে ক্রিয়ান্তর-বিধায়ক বল। যদি তাহা স্বীকার কর তবে তো বেদান্ত ক্রিয়ারই শাস্ত্র হইল। অতএব ব্রহ্মের বেদ-বেদ্যত্ব সপ্রমাণ হউক বা না হউক, উক্ত তাৎপর্য্য দ্বয়ের অন্যতর দৃষ্টিতে শাস্ত্রানুসারে বেদান্তের ক্রিয়াপরত্ব প্রামাণ্য হইতে পারে। নচেৎ ক্রিয়ার্থে শূন্য বেদান্ত শাস্ত্রের যখন প্রামাণ্যই নাই, তখন তাহা সর্ব্বজ্ঞ ব্রহ্মের প্রমাণ হইতে পারে না। তাদৃশ স্থলে বেদান্ত স্বয়ং অসিদ্ধ হইয়া কিরূপে ব্রহ্মের প্রমাণ হইবে? (৩) বিশেষতঃ অদৃষ্টফলা ক্রিয়ার প্রতিপাদনই বিধি।

মন্ত্রণাঞ্চেষেত্বাদীনাং ক্রিয়া তৎসাধনাভিধায়িত্বেন কর্ম্মসমবায়িত্বমুক্তং, ন কচিদপি বেদবাক্যানাং বিধিসংস্পর্শমন্তরেণার্থবত্তা দৃষ্টোপপন্না বা।"

ক্রিয়া ও তাহার সাধনার্থ কর্ম্মসমবায়ী মন্ত্র সকল এ উভয়েরই সার্থকতা আছে। কিন্তু বিধি-সংস্পর্শ ব্যতিরেকে কোন বেদ-বাক্যের অর্থবত্তা সিদ্ধ হয় না। মন্ত্র ও ক্রিয়াতে ফলদাতা রূপে যে দেবাধিষ্ঠান আছে, তাহাতে যে অদৃষ্ট ফল আছে, এবং ক্রিয়ার যে ফলোপযোগী সাধন, এই সকল অলৌকিক বিষয় প্রতিপাদনের নামই বিধি। তাহা লইয়াই বেদ। তাহাই প্রতিপাদনের যোগ্য ও প্রয়োজনীয়। কিন্তু ব্রহ্মকে যদি ফলদাতা দেবতারূপে বা অনুষ্ঠিত বিধিবিহিত ক্রিয়ার অলৌকিক ফলরূপে স্বীকার না কর তবে তাঁহাকে প্রতিপাদনের ফল কি? কেননা বৈদান্তিকেরা তাঁহাকে

আত্ম প্রত্যয়ে, হৃদয়-স্পৃষ্ট-অনুভবে, তত্ত্বজ্ঞানে এবং বেদান্তবিচারে প্রত্যক্ষ, প্রসিদ্ধ, সর্ব্বত্র-সুলভ, এবং কূটস্থ বলিয়া গ্রহণ করেন। এতাদৃশ প্রত্যক্ষ ও প্রসিদ্ধ বস্তুর প্রতিপাদনে ফল কি? শাস্ত্রের তাদৃশ অভিপ্রায় সম্ভব নহে। কেননা যাহা কিছু প্রসিদ্ধ তাহা তো ক্রিয়াফলের ন্যায় দুর্লভ নহে, অদৃষ্ট ও অপ্রত্যক্ষও নহে; সুতরাং তৎপ্রতিপাদনে কোন হেয়োপাদেয় না থাকায় তাহাতে পুরুষার্থ নাই।

৩৯। মহাত্মা রামমোহন রায় ও পূজ্যপাদ শঙ্করাচার্য্য স্বীয় স্বীয় বেদান্ত ভাষ্যে মীমাংসা করিবার জন্য বিপক্ষদিগের পক্ষ হইয়া এই যে সকল পূর্ব্ব-পক্ষ উপস্থিত করিয়াছেন তাহা সনাতন। জ্ঞান ও ক্রিয়ায় চিরবিরোধ। ফলকামী পুরুষের দৃষ্টিতে ক্রিয়াই পুরুযার্থ, জ্ঞান অনর্থক। জ্ঞানীর দৃষ্টিতে ফল অনিত্য এবং তৎসাধনজন্য ক্রিয়া পণ্ডশ্রম ও বাল্যলীলা মাত্র। বেদশাস্ত্র কামধেনু। তাহা কর্ম্ম ও ব্রহ্ম উভয় তত্ত্বেই সমন্বিত হইতে পারে। কর্ম্মী, তাহার জ্ঞানকাণ্ডকে পর্য্যন্ত ক্রিয়া বলিয়া গণ্য করিতে পারেন এবং জ্ঞানী তাহার কর্ম্ম-কাণ্ডকে পর্য্যন্ত জ্ঞানে পরিসমাপ্ত করিয়া থাকেন। ইহার দৃষ্টান্ত অতি সংক্ষেপে দিতেছি। যদি কোন ব্যক্তি স্বীয় পীড়িত শিশুর আরোগ্য রূপ ফল লাভের নিমিত্ত গৃহে জ্ঞান-শাস্ত্র উপনিষৎ পাঠ করান সেস্থলে সে জ্ঞানশাস্ত্রও ক্রিয়াপর হইল। কেননা জ্ঞান হৃদয়গত-অনুভবেতে ও আত্ম-প্রত্যয়েই সিদ্ধ হয়। যেখানে জ্ঞান-শাস্ত্রের সে মর্য্যাদা রক্ষিত হয় না, কিন্তু কেবল ফলার্থে আদর হয়, সেখানে তাহা বিধির অন্তর্গত হইল। সে ক্ষেত্রে উপনিষৎ শাস্ত্রের সহিত ফলপ্রদ চণ্ডিগ্রন্থের বিশেষ কি? বেদান্ত শাস্ত্রকে অথবা ব্রাহ্মধর্ম্ম গ্রন্থকে যদি ভগবতী সরস্বতী দেবীর পূজার বেদীতে সিন্দূর, চন্দন ও পুষ্প-মালায় সজ্জিত করিয়া পূজা করা হয়, তবে তাহা কর্তৃক ব্রহ্মজ্ঞান লাভ সম্ভবে না। কেবল নয় সাধক ভক্তিতে

গদগদ হইলেন। কিন্তু সে ভক্তি জ্ঞান নহে। তাহা ক্রিয়ামাত্র। সেইরূপ কোন ব্রহ্মজ্ঞানী যখন ক্রিয়ায় ব্যবহৃত মন্ত্র সকলের ব্রহ্মরূপ পরমার্থ অনুভব করেন, কিন্তু অন্ধ হইয়া তাহার পাঠ মাত্রকে আপদ-শান্তিকর বা অদৃষ্ট-ফল-প্রদ না ভাবেন, তখন তাদৃশ মন্ত্র সকলও অক্রিয়াপর অথবা ব্রহ্মপররূপে গণ্য হইয়া থাকে। ফলতঃ জ্ঞান যে ক্রিয়ার অঙ্গ নহে, জ্ঞানশাস্ত্র যে অনিত্য ফলের শাস্ত্র নহে, এবং জ্ঞান যে কেবল ব্রহ্মেরই জ্ঞাপক ইহাই বৈদান্তিক দৃষ্টি। ভগবান ব্যাসদেব নিম্নস্থ সূত্র উত্থাপন করিয়া ঐ দৃষ্টিকে দৃঢ়, এবং তদ্বিরোধী পূর্ব্বোক্ত প্রকারের আপত্তি সমূহের ভঞ্জন করিয়াছেন। তাহাতে আচার্য্যদিগের ব্যাখ্যা দ্বারা বেদ বেদান্তের ব্রহ্মপরতা স্থাপিত হইয়াছে।

ইতি প্রথম অধ্যায়ে প্রথম পাদে তৃতীয়াধিকরণে তৃতীয়
সূত্রের ব্যাখ্যা সমাপ্ত।

প্রথম অধ্যায়।

প্রথম পাদ।

চতুর্থাধিকরণ।

চতুর্থ সূত্র।

সূত্র। তত্তু সমন্বয়াৎ। ৪।

অর্থ। সমন্বয় দ্বারা সমস্ত বেদ বেদান্ত ব্রহ্মেরই জ্ঞাপক।

তাৎপর্য্য।

৪০। মহাত্মা রামমোহন রায় স্বীয় উত্তর-পক্ষে এই সূত্রের নিম্নস্থ তাৎপর্য্য ব্যাখ্যা করিয়াছেন।

"ব্রহ্মই কেবল বেদের প্রতিপাদ্য হয়েন। সকল বেদের তাৎপর্য্য ব্রহ্মে হয়। যেহেতু বেদের প্রথমে এবং শেষে আর মধ্যে পুনঃ পুনঃ ব্রহ্ম কথিত হইয়াছেন। "সর্ব্বে বেদা যৎপদমামনন্তি" ইত্যাদি শ্রুতি ইহার প্রমাণ। কর্ম্মকাণ্ডীয় শ্রুতি-পরম্পরায় ব্রহ্মকেই দেখান। যেহেতু শাস্ত্রবিহিত কর্ম্মে প্রবৃত্তি থাকিলে ইতর কর্ম্ম হইতে নিবৃত্ত হইয়া চিত্তশুদ্ধি হয়। পশ্চাৎ জ্ঞানের ইচ্ছা জন্মে।"

এস্থানে কর্ম্মকাণ্ডীয় বেদমন্ত্র সকল যে সাক্ষাৎ সম্বন্ধে ব্রহ্মের জ্ঞাপক এমত উক্ত হয় নাই। তৎসমূহ কেবল পরম্পরায় ব্রহ্মকে দেখান এই মাত্র কথিত হইয়াছে। সকল বেদের তাৎপর্য্য ব্রহ্মাতে যেহেতু বেদের আদি অন্ত মধ্যে পুনঃ পুনঃ ব্রহ্ম কথিত হইয়াছেন। মহাত্মা রাজা রামমোহন রায়ের এইরূপ ভাষ্যের তাৎপর্য্য এই। যথা—শাস্ত্রের তাৎপর্য্য-নির্ণয়ার্থ যে লিঙ্গষট্‌ক আছে তাহা দ্বারা বিচার করিলে সমগ্র বেদকে সাক্ষাৎ ও পরম্পরা সম্বন্ধে এক মাত্র

ব্রহ্মেতেই সমন্বিত দৃষ্ট হইবে। কিন্তু কেবল বেদান্তই সাক্ষাৎ সম্বন্ধে সর্ব্বতোভাবে একমাত্র ব্রহ্মের প্রতিপাদক। প্রাগুক্ত লিঙ্গ-ষট্ক * কেবল বেদান্তেরই ব্রহ্মপরতার প্রতি বিশদ রূপে সঙ্গত হয়। কিন্তু পূর্ব্বসূত্রের আকাঙ্ক্ষা আছে যে সমস্ত ঋগ্বেদাদি শাস্ত্রই ব্রহ্মের যথাবৎ "স্বরূপ" জ্ঞাপক। তন্মধ্যে সে সমস্ত শাস্ত্রের শিরোভাগ-স্বরূপ বেদান্ত-শব্দ-বাচ্য উপনিষৎ ও ব্রহ্মসূক্ত সকল যে তাদৃশ "স্বরূপ" জ্ঞাপক এবং তদ্ভিন্ন কোনরূপ ক্রিয়ার জ্ঞাপক নহে, তাহা এই বর্ত্তমান সূত্রে শঙ্করাচার্য্য সুন্দররূপে দর্শাইয়াছেন। তৎসমস্ত ব্যাখ্যার সংক্ষেপ বিবরণ পরে উক্ত হইবে। ফলে কর্ম্মকাণ্ডীয় বেদভাগও যে ব্রহ্ম "স্বরূপের" পরম্পরা জ্ঞাপক শঙ্করাচার্য্য প্রভৃতি কেহই তাহার উল্লেখ করেন নাই। তৎসম্বন্ধে তথাসম্ভব কিছু না

* উপক্রম-উপসংহার, অভ্যাস, অপূর্ব্বতা, ফল, অর্থবাদ এবং উপপত্তি এই ষড়বিধ নিয়ম লিঙ্গষট্ক নামে উক্ত হয়। ইহা প্রযোগ দ্বারা শাস্ত্রতাৎপর্য্যের অবগতি হয়। নতুবা অর্থান্তর উপস্থিত হইয়া থাকে। কোন শাস্ত্রের প্রতিপাদ্য বিষয়কে নির্ণয় করিতে হইলে প্রথমতঃ তাহার আরম্ভ ও অন্ত পাঠ করিয়া তাহা করা উচিত। এই নিয়মের নাম "উপক্রমোপসংহার। দ্বিতীয়তঃ দেখা উচিত যে উক্ত প্রতিপাদ্য বিষয় সে শাস্ত্রের মধ্যে পুনঃ পুনঃ প্রতিপাদিত হইয়াছে কি না। এই নিয়মের নাম "অভ্যাস"। তৃতীয়তঃ বুঝিতে হইবে যে প্রতিপাদ্য বিষয়টি তদ্বিরোধী প্রমাণের অবিষয়ীভূত রূপে দর্শিত হইয়াছে কি না। তাহা যদি হইয়া থাকে তবে তাহাই "অপূর্ব্বতা" শব্দে কথিত হয়। চতুর্থতঃ প্রতিপাদ্য বিষয়ের উদ্দেশ্য ও ফল নিরূপণকে "ফল" কহে। পঞ্চমতঃ প্রতিপাদ্য বিষয়ের প্রশংসা ও তদ্বিরোধী বিষয়ের নিন্দা পাঠ দ্বারা প্রতিপাদ্য বিষয়ের অবধারণ। ইহাকে অর্থবাদ কহে। অর্থবাদ বাক্য সকল উদ্দেশ্য জ্ঞাপন করে মাত্র, কিন্তু প্রয়োজনাতিরিক্ত প্রশংসা বা নিন্দার্থপূর্ণ বিধায় তৎসমস্তের যথাশ্রুত অর্থের শাস্ত্রবিচারে প্রামাণ্য নাই। ষষ্ঠতঃ সদর্থযুক্ত যুক্তি দ্বারা প্রতিপাদ্য বিষয় যে হৃদয়ঙ্গম হয় তাহার নাম উপপত্তি। এই ষড়্বিধ নিয়ম যদি বেদান্ত শাস্ত্রে প্রয়োগ-করা যায় তবে নিশ্চয় হইবে যে একমাত্র ব্রহ্মই বেদান্তের প্রতিপাদ্য, তাহার আদ্যন্তে ব্রহ্ম কথিত হইয়াছেন। মধ্যে পুনঃ পুনঃ ব্রহ্মই কথিত হইয়াছেন। তিনি ক্রিয়ার অবিষয়ীভূতরূপে প্রতি-পাদিত হইয়াছেন। ব্রহ্মনিষ্ঠের ব্রহ্ম হইতে অভিন্ন মোক্ষ ফল বর্ণিত হইয়াছে। ব্রহ্মজ্ঞানের ও ব্রহ্মের প্রশংসা এবং কর্ম্মজ্ঞানের ও কর্ম্মের নিন্দা বিবৃত হইয়াছে। এবং আত্মপ্রত্যয় প্রভৃতি অনুভব ও যুক্তিদ্বারা ব্রহ্মজ্ঞান প্রতিপাদিত হইয়াছে।

বলিলে উক্ত আকাঙ্ক্ষার পূরণ হয় না। এবং মহাত্মা রামমোহন রায় তাহার যে সংক্ষেপ উত্তর দিয়াছেন তাহাও উত্তমরূপে বুঝা যায় না। এই কারণে কর্ম্মকাণ্ড ও জ্ঞানকাণ্ড-বিশিষ্ট সমস্ত বেদেরই একমাত্র ব্রহ্মপরতা সম্বন্ধে শাস্ত্রের যে সকল উক্তি ও সিদ্ধান্ত আছে তাহার যৎকিঞ্চিৎ বলা যাইতেছে। রাজা রামমোহন রায় বেদের পরম্পরা ব্রহ্মপরতা ও জ্ঞান-প্রতিপাদকতা সম্বন্ধে আভাষমাত্র দিয়া তৎ-প্রমাণস্থলে যুক্তিযুক্তরূপে যে শ্রুতি উদ্ধৃত করিয়াছেন তাহাই এস্থলে অবলম্বনীয়। সেই শ্রুতি এই।

৪১। "সর্ব্বে বেদা যৎপদমামনন্তি তপাংসি সর্ব্বাণি চ যদ্বদন্তি। যদিচ্ছন্তো-ব্রহ্মচর্য্যঞ্চরন্তি তত্তে পদং সংগ্রহেণ ব্রবীম্যোমিতি।"

নচিকেতা যমকে জিজ্ঞাসা করিয়াছিলেন যে ধর্ম্মক্রিয়া হইতে ভিন্ন, অধর্ম্ম হইতে ভিন্ন, এই সৃষ্টি হইতে ভিন্ন, এবং ত্রিকাল হইতে ভিন্ন ঈদৃশ সর্ব্ব-ব্যবহার-গোচরাতীত যাহা তুমি জান তাহা আমাকে বল। এই প্রশ্নের উত্তরে উক্ত বচনে যমরাজ কহিলেন, সকল বেদ যে পূজনীয়কে অবিভাগে প্রতিপাদন করে, সর্ব্বপ্রকার তপস্যা যাঁহাকে কহে, যাঁহাকে ইচ্ছা করিয়া ব্রহ্মচারীরা ব্রহ্মচর্য্য আচরণ করেন, তাঁহাকে আমি সংগ্রহ পূর্ব্বক বলি, তিনি ওঁ। ওঁ শব্দে ব্রহ্ম। এই শ্রুতি "সর্ব্বে বেদা" শব্দ দ্বারা সমস্ত বেদের ব্রহ্মপরতা প্রতিপাদন করিতেছে। "তপাংসি * সর্ব্বাণি" বাক্য দ্বারা সর্ব্ব-প্রকার বৈদিক ক্রিয়ার ব্রহ্মরূপ পরম উদ্দেশ্য দর্শাইতেছে। শঙ্করা-চার্য্য উপনিষদ্ভাষ্যে উক্ত শ্রুতির "সর্ব্বে বেদা যৎপদনীয়মবিভাগেন প্রতিপাদয়ন্তি" বলিয়া ব্যাখ্যা করত বেদ শাস্ত্রের "অবিভাগে" ব্রহ্ম-প্রতিপাদকত্ব জ্ঞাপন করিয়াছেন। "অবিভাগ" শব্দের অর্থ "বিভাগক্রমে নহে।" অর্থাৎ কর্ম্মকাণ্ডীয় ও জ্ঞানকাণ্ডীয় শ্রুতিবিশিষ্ট

---

* "তপঃ" শব্দের অর্থ সর্ব্বপ্রকার ক্রিয়া। যথা শব্দকল্পদ্রুমে। "তপঃ" বৈধ-ক্লেশজনকং কর্ম্ম। ব্রাহ্মণস্য তপোমূলং যজ্ঞঃ স্বাধ্যায়এবচ।

সমগ্র ঋগ্বেদাদি শাস্ত্র নির্ব্বিশেষে এক বাক্যে ব্রহ্মকে কহিতেছেন এই তাৎপর্য্য। ফলতঃ শুদ্ধ বেদবাক্য দ্বারা তাৎপর্য্যের উপলব্ধি হয় না। যুক্তি ও বিচার দ্বারা অভিপ্রায় নির্ণীত হওয়া প্রয়োজন। কিন্তু লৌকিক যুক্তি শাস্ত্রীয় বিচারে অশ্রদ্ধেয়। এ জন্য ঋষি ও আচার্য্যগণ এ সম্বন্ধে যাহা বলিয়াছেন তাহাই বলিব। ইতিপূর্ব্বে উক্ত হইয়াছে যে ব্রহ্ম হইতে ঋগ্বেদাদি সমস্ত বেদ শাস্ত্র উৎপন্ন হইয়াছে। সেই সমগ্র বেদ শাস্ত্র ক্রিয়া-পর মন্ত্র ও বিধিবাক্যে যেমন পূর্ণ, সেইরূপ ব্রহ্মস্বরূপ-প্রতিপাদক সূক্ত ও উপনিষৎ-বাক্যেও পূর্ণ। ফলকামীদিগের অধিকার-দৃষ্টিতে মন্ত্র ও বিধি, এবং জিজ্ঞাসু ও জ্ঞানীদিগের অধিকারানুসারে ব্রহ্মস্বরূপাববোধক শ্রুতি সমূহের প্রেরণা। মন্ত্রময় যাগাদি ও বিধিবিহিত নিত্য নৈমিত্তিক ক্রিয়া সমুহ অপূর্ব্ব, শুভ ফল ও শুভাদৃষ্ট সঞ্চয়ের জন্য। সেই সমস্ত মন্ত্র ও ক্রিয়া ইন্দ্রাদি দেবতা-ভেদে একমাত্র ঈশ্বরকেই ফলদাতা ও স্ব স্ব অধিষ্ঠাতৃদেবতারূপে নির্দ্দেশ করে, কিন্তু "বেদ্য" রূপে তাঁহার "স্বরূপ" উপদেশ করায় তৎসমূহের অধিকার নাই। সে অধিকার কেবল বেদান্তের। "ফলমত উপপত্তে (৩।২।৩৮) ইত্যাদি কতিপয় সূত্রে বেদান্ত দর্শন মীমাংসা করিয়াছেন যে "কর্ম্মভিরারাধিত-ঈশ্বরঃ ফলদাতা" বেদমন্ত্র দ্বারা কর্ম্ম আরাধিত হইলেও সমস্ত ক্রিয়াতে ঈশ্বরই ফলদাতা। কেন না, "অচেতনস্য কর্ম্মণোহ-পূর্ব্বস্য বা তারতম্যেন প্রতিনিয়তং ফলং দাতুং ন সামর্থ্যমস্তি" অচেতন কর্ম্মের বা অচেতন অপূর্ব্বের তারতম্যরূপে প্রতিনিয়ত ফলদানে সামর্থ্য নাই। অতএব ক্রিয়ার্থ বেদমন্ত্রে ঈশ্বর "স্বরূপতঃ" প্রতিপাদিত না হউন, কিন্তু তাহাতে এবং সমস্ত ক্রিয়াতে ফলদাতা-রূপে তিনি উহ্য আছেন। "সলিলবচ্চ তন্নিয়মঃ।" নানা দেশের নদ নদী সকল যেমন সমুদ্রে প্রবেশ করে সেইরূপ সর্ব্বপ্রকার যজ্ঞ-বন্দনার ঈশ্বরেতেই তাৎপর্য্য। মহর্ষি জৈমিনি স্বয়ং কহিয়াছেন

"নানা দেবতা পৃথক্ জ্ঞানাৎ।" জ্ঞানের ভিন্নতা জন্য নানা দেবতার স্বীকার। ব্যাসদেব কহিয়াছেন "নানাশব্দাদিভেদাৎ।" (৩৷৩৷৫৮) নানা শাস্ত্রাচার্য্যের নানা উপদেশ ও অধিকারের ভিন্নতা হেতু পৃথক্ পৃথক্ যজ্ঞোপাসনা। "বিকল্পবিশিষ্টফলত্বাৎ" পৃথক্ পৃথক্ ক্রিয়াতে পৃথক্ পৃথক্ বিশিষ্ট ফল আছে, এজন্য উপাসনাদি ক্রিয়ার ভিন্নতা। নতুবা বিকল্পে সে সমস্ত এক। কিন্তু সমস্ত প্রকার উপাসনার মধ্যে যে উপাসনা বা কর্ম্ম আত্মবিদ্যাতে যুক্ত তাহাই জ্ঞানের কারণ। ব্যাস কহিয়াছেন "যদেব বিদ্যায়তি হি"। আচার্য্য এই সুত্রের ব্যাখ্যা করিয়াছেন যে "সোপাসননিরুপাসনয়োঃ তারতম্যেন বিদ্যাসাধনত্বমিতি।" সোপাসন কর্ম্ম অর্থাৎ সগুণ-উপাসনা এবং নিরুপাসন কর্ম্ম অর্থাৎ নির্গুণ উপাসনা উভয়ই তারতম্যানুসারে জ্ঞানের উপযোগী। তন্মধ্যে নির্গুণ কর্ম্ম অর্থাৎ নিরুপাসন কর্ম্ম আত্মবিদ্যাতে যুক্ত বিধায় তাহারই মুখ্যত্ব। কেন না তাহার দ্বারা ব্রহ্ম বেদ্য-রূপে প্রকাশ পান। আর আত্মজ্ঞান-বিহীন যে ক্রিয়া, যাহার মন্ত্র সমুহ গৌণ মাত্র অর্থাৎ পরমাক্ষর স্বরূপ ব্রহ্মবোধক নহে, তাহাতে ব্রহ্ম কেবল উহ্য মাত্র। ফলে সেই সকল জ্ঞানহীন ক্রিয়া ও মন্ত্রের যে ব্রহ্মেতে তাৎপর্য্য তাহাতে আর সন্দেহ নাই *। কর্ম্মী সেই পরম তাৎপর্য্যকে হৃদয়ঙ্গম করিতে অপারগ, কেন না, কর্ম্ম-ফল-কামনা প্রযুক্ত তাঁহার চিত্ত

* মনু কহিয়াছেন। "আত্মৈব দেবতাঃ সর্ব্বাঃ" ইন্দ্রাদি সর্ব্বদেবতা পরমাত্মাই। অপরঞ্চ, "এনমেকে বদন্ত্যগ্নিং মনুমন্যে প্রজাপতিং। ইন্দ্রমেকে পরে প্রাণমপরে ব্রহ্ম শাশ্বতং"। পরমাত্মাকে কেহ অগ্নি, কেহ মনু প্রজাপতি, কেহ ইন্দ্র, কেহ হিরণ্যগর্ভ, কেহ বা, ব্রহ্ম শাশ্বত বলেন। গীতাস্মৃতিতেও কহিয়াছেন "কর্ম্মব্রহ্মোদ্ভবং বিদ্ধি ব্রহ্মাক্ষরসমুদ্ভবং। তস্মাৎ সর্ব্বগতং ব্রহ্ম নিত্যং যজ্ঞে প্রতিষ্ঠিতং।" যাগ যজ্ঞাদি বেদোদ্ভূত। বেদ শাস্ত্র ব্রহ্ম হইতে উৎপন্ন। অতএব সর্ব্বগত ব্রহ্ম সর্ব্বদা যজ্ঞেতে প্রতিষ্ঠিত আছেন। তাৎপর্য্যতঃ ব্রহ্মই সর্ব্বকর্ম্মে যজ্ঞেশ্বর রূপে বর্ত্তমান এবং সমস্ত ক্রিয়াবিধি ও মন্ত্র তাঁহাকে ফলদাতা ও যজ্ঞপুরুষ নারায়ণরূপে প্রতিপন্ন করে।

অশান্ত। কিন্তু ব্রহ্মজ্ঞানী সমস্ত ক্রিয়ার ফলদাতা স্বরূপ এবং ঋগ্বেদাদি সর্ব্ববেদের পরমাক্ষরস্বরূপ ব্রহ্মকে জানিয়া অনিত্য কামনা এবং ফলার্থ ক্রিয়া হইতে উদ্ধার লাভ করেন। এতাবতা কর্ম্মকাণ্ডীয় বেদ যে ব্রহ্মকে অজ্ঞাত ও ফলদাতারূপে প্রকাশ করে জ্ঞানকাণ্ডীয় বেদও সেই ব্রহ্মকেই জ্ঞাত, স্বরূপতঃ-বেদ্য ও পরমাত্মা স্বরূপে প্রতিপন্ন করে। অতএব সমস্ত বেদই সামান্যতঃ ব্রহ্মপর। সমস্ত বেদই ব্রহ্মের প্রমাণ। তন্মধ্যে ব্রহ্ম—স্বরূপপ্রতিপাদক যে সমস্ত শ্রুতি তাহাই মুখ্য। তাহারই নাম বেদান্ত। শাস্ত্রেতে সেই মুখ্য শ্রুতি সমূহেরই আদর। তাহা লইয়াই বেদের মহত্ত্ব। তাহাই ব্রহ্মপ্রতিপাদক বলিয়া সমগ্র বেদ ব্রহ্মের প্রমাণ রূপে গণ্য হইয়া থাকে। যদি ব্রহ্মবোধক শ্রুতি সকল সমগ্রবেদের আদ্যন্ত মধ্যে না থাকিত, তবে সমস্ত কর্ম্মের উদ্দেশ্য ব্রহ্মেতে, সমস্ত মন্ত্রেতেই ব্রহ্ম ফলদাতা রূপে অবিষ্ঠিত, এ সকল বেদবিচার সম্ভব হইত না। সুতরাং ব্রহ্ম-প্রতিপাদক শ্রুতি লইয়াই বেদ। কর্ম্মকাণ্ডের দর্শনকার মহর্ষি জৈমিনিও স্বীকার করিয়াছেন, "গুণমুখ্যব্যতিক্রমে তদর্থত্বান্মুখ্যেন বেদসংযোগঃ।" যেখানে গৌণ অর্থাৎ ক্রিয়া-বিধায়ক ও মুখ্য অর্থাৎ ব্রহ্ম-প্রতিপাদক শ্রুতির বিরোধ হইবেক সেই স্থানে মুখ্যের সহিত বেদের সম্বন্ধ মানিতে হইবে। ব্রহ্ম-প্রতিপাদক শ্রুতি সকলের সহিতই বেদের প্রকৃত সম্বন্ধ। এজন্য পর ব্রহ্মকে বেদান্ত-বেদ্য বলিলেই বেদবেদ্য বুঝাইবে। তাহাতে "তিনি কর্ম্মকাণ্ডীয় শ্রুতিরও বেদ্য কি না" এ ক্ষুদ্র প্রশ্ন আর স্থান লাভ করিতে পারে না। এই জন্য শঙ্করাচার্য্য প্রভৃতি ব্রহ্মজ্ঞান-প্রচারকেরা "উপক্রমোপসংহার" প্রভৃতি লিঙ্গষট্ক দ্বারা বেদান্তশাস্ত্রের অক্রিয়াপরত্ব ও ব্রহ্মপ্রতিপাদকতা দর্শাইয়াছেন। তাঁহারদের তাদৃশ সিদ্ধান্ত দ্বারাই সমস্ত বেদের ব্রহ্মপ্রধানতা প্রতিপন্ন হইয়াছে। এবং কর্ম্মকাণ্ডীয় বেদবিহিত

ক্রিয়া যে অনিত্য ও গৌণমাত্র তাহাও প্রদর্শিত হইয়াছে। মহাত্মা রামমোহন রায় এই সমস্ত কথা অতি সংক্ষেপে বলিয়াছেন মাত্র।—যথা "কর্ম্মকাণ্ডীয় শ্রুতি-পরম্পরা ব্রহ্মকেই দেখান।" ফলে এই সংক্ষেপোক্তির মর্ম্ম অতীব গভীর।

৪২। এই উপস্থিত "তত্তু সমন্বয়াৎ" সূত্রে বিচার করিবার অভিপ্রায়ে পূজ্যপাদ শঙ্করাচার্য্য কর্ম্ম-মীমাংসা-পক্ষীয় যে সকল আপত্তিকে পূর্ব্বপক্ষরূপে গ্রহণ করিয়াছেন তাহার সংক্ষেপ তাৎপর্য্য ইতিপূর্ব্বে বলা গিয়াছে। শঙ্করাচার্য্য প্রভৃতি ব্রহ্মজ্ঞগণের অবলম্বনীয় শাস্ত্রই বেদান্ত। সমুদয় উপনিষৎ এবং বেদের মন্ত্র ও ব্রাহ্মণ ভাগে যত জ্ঞানকাণ্ডীয় শ্রুতি আছে, তৎসমস্তই বেদান্ত-শব্দের বাচ্য। এই বেদান্ত-শাস্ত্রের মীমাংসাস্বরূপ সমস্ত শারীরিক-সূত্রও বেদান্ত বলিয়া গৃহীত হয়। এই সমস্ত শাস্ত্র কেবলই ব্রহ্ম-প্রতিপাদক। তাহাতে ক্রিয়ার গন্ধমাত্র নাই। কিন্তু কর্ম্মমীমাংসার অভিপ্রায় অনুসারে তাদৃশ অক্রিয়াপর শাস্ত্র শাস্ত্রই নহে। অক্রিয়ার্থ জন্য তাহার প্রামাণ্য নাই। কর্ম্মীদিগের মতে হয় তাহা কর্ম্ম-মীমাংসার পরিশিষ্ট, না হয় তাহা শ্রবণ মননাদি রূপ স্বতন্ত্র প্রকার ক্রিয়ার প্রবর্ত্তক। বিশেষতঃ তাঁহাদের প্রধান আপত্তি এই যে স্বয়ম্প্রকাশ ও প্রসিদ্ধ-বস্তু-স্বরূপ ব্রহ্মকে প্রতিপাদন করায় হেয়োপাদেয় বা পুরুষার্থ না থাকায় সেরূপ শাস্ত্র সিদ্ধ নহে। এই সকল আপত্তিকে শঙ্করাচার্য্য স্বীয় পূর্ব্ব-পক্ষরূপে গ্রহণ করিয়াছেন। তৎ সমস্তের মীমাংসা নিম্নে প্রদর্শিত হইতেছে। উক্ত মীমাংসায় বেদান্তের ক্রিয়াপরত্ব খণ্ডিত হইয়া ব্রহ্মপরতা স্থাপিত হইয়াছে। ফলে কর্ম্মকাণ্ডীয় বেদসম্বন্ধে শঙ্কর তাদৃশ কোন পূর্ব্ব-পক্ষ গ্রহণও করেন নাই এবং তাহার ব্রহ্মপ্রতিপাদকতা প্রদর্শনার্থ কোন যত্নও করেন নাই। শঙ্কর কহিতেছেন—

"তদ্ব্রহ্ম সর্ব্বজ্ঞং, সর্ব্বশক্তি, জগদুৎপত্তিস্থিতিলয়কারণং বেদান্তশাস্ত্রাদবগম্যতে।

কথং, সমন্বয়াৎ। সর্ব্বেষু হি বেদান্তেষু বাক্যানি তাৎপর্য্যেণ এতস্যার্থস্য প্রতিপাদকত্বেন সমনুগতানি।"

সেই সর্ব্বজ্ঞ, সর্ব্বশক্তি, জগতের উৎপত্তি, স্থিতি, লয়ের কারণ ব্রহ্মকে কেবল বেদান্ত-শাস্ত্র অর্থাৎ জ্ঞানকাণ্ডীয় বেদভাগ হইতেই অবগত হওয়া যায়। কি প্রকারে? না, সমন্বয় দ্বারা। কেন না, সকল বেদান্ত অর্থাৎ সমগ্র উপনিষৎ আর ব্রাহ্মণখণ্ড ও মন্ত্রবর্ণের অন্তর্গত যত জ্ঞানকাণ্ডীয় শ্রুতি আছে, তৎসমস্তই তাৎপর্য্যতঃ ঐ প্রকার অর্থপ্রতিপাদনে অনুগত। সমস্ত উপনিষদের, এবং আর আর জ্ঞানকাণ্ডীয় বেদবাক্য সমূহ বেদের মন্ত্র ও ব্রাহ্মণ-ভাগের যে যে প্রকরণে আছে সেই সমস্ত প্রকরণের, আদি অন্ত মধ্যে ব্রহ্মই প্রতিপাদিত হইয়াছেন। তাহার অন্তর্গত সমুদয় শ্রুতি-বাক্য ব্রহ্ম-স্বরূপ-নির্ণয়ে সমন্বিত।

৪৩। "নচ তেষাং কর্ত্তৃস্বরূপপ্রতিপাদন-পরতাবসীয়তে।"

ঐ সকল শ্রুতি বাক্যের ক্রিয়া-প্রতিপাদন-পরতা নাই। তাহাদিগের কেবল ঐকান্তিকী ব্রহ্মপরতাই দৃষ্ট হয়। তৎসমস্তের কোন অংশে ক্রিয়াকারীরূপ যজমান, ক্রিয়া-সাধনরূপ পদ্ধতি বা বিধিপালন এবং ক্রিয়ার ফলরূপ অলৌকিক স্বর্গাদি প্রতিপাদিত হয় নাই। ঐ সকল শ্রুতিবাক্য কেবল ব্রহ্মস্বরূপকে হৃদয়ঙ্গম করায় মাত্র। নতুবা তাঁহাকে কোন ক্রিয়ার অলৌকিক ফল রূপে নির্দ্দেশ করে না। ব্রহ্মজ্ঞানী তাঁহাকে কোন ভোগ্য ফলরূপে লাভ করেন না; কিন্তু স্বীয় সংসার-বাসনায় জড়িত অমুখ্য জীবত্বকে বিসর্জ্জন পূর্ব্বক তাঁহাকে আপনার মুখ্য আত্মারূপে জানেন। এইরূপ ব্রহ্মাত্মভাব লাভ দ্বারা তিনি স্বীয় যজমানত্ব, ক্রিয়া ও তাহার অনিত্য ফল হইতে উদ্ধার লাভ করেন। তদবস্থায় তিনি কর্ত্তৃত্ব ও ভোক্তৃত্বাভিমান হইতে মুক্ত হন। তখন কেবল সংসারাতীত, জ্ঞানস্বরূপ, রসস্বরূপ, এবং আনন্দস্বরূপ ব্রহ্মই তাঁহার আত্মা-

রূপে প্রত্যক্ষ হন মাত্র। উক্ত শ্রুতি-বাক্য সকলের এইরূপ অদ্বয়-ব্রহ্ম-স্বরূপ-প্রতিপাদন-পরতা আছে, কিন্তু ক্রিয়াকারকতা, ক্রিয়া-সাধনা, ও ফললাভ রূপ ক্রিয়াঙ্গত্ব নাই। বিশেষতঃ ব্রহ্মাত্মভাব লাভ হইলে জীবাত্মাতে প্রকৃতি-সম্বন্ধাধীন জীবত্ব-ব্যবহার থাকে না। সেই হেতু তিনি তখন আপনাকে ব্রহ্মলাভের কর্ত্তা অথবা জ্ঞাতা রূপে এবং ব্রহ্মকে আপনার কোন জ্ঞানানুষ্ঠানের ফল অথবা জ্ঞেয়-রূপে অনুভব করেন না। তখন তিনি সকলের সাধারণ-আত্মা-স্বরূপ অদ্বয় আত্মাকে আত্মা বলিয়া অবগত হন মাত্র। তখন তাঁহার ব্যষ্টি-প্রকৃতি-গত ক্ষুদ্র দ্বৈতভাব, হৃদয়-গ্রন্থি, সংশয়, কর্ম্ম ও কর্ম্ম-ফল বিনাশ প্রাপ্ত হয়। সে অবস্থায় কে কাহাকে দেখিবে বা ভোগ করিবে?

"অথ ধীরা অমৃতত্বং বিদিত্বা ধ্রুবমধ্রুবেষ্বিহ ন প্রার্থয়ন্তে।" ইতিশ্রুতি।

ধীরেরা দেবলোকাদির যে অমৃতত্ব তাহাকে অধ্রুব জানিয়া এবং প্রত্যগাত্মস্বরূপে অবস্থানকে ধ্রুব অমৃতত্ব জ্ঞান পূর্ব্বক ইহ সংসারের অনিত্য বিষয় সকল আর প্রার্থনা করেন না। এতাদৃশ স্বরূপ-জ্ঞান-প্রতিপাদনই বেদান্ত শাস্ত্রের উদ্দেশ্য। একমাত্র ব্রহ্মস্বরূপ বা ব্রহ্মাত্মক-জ্ঞান-প্রতিপাদিকা আদরবতী শ্রুতির পুনঃ কর্ত্তৃস্বরূপাদি ক্রিয়াঙ্গ-প্রতিপাদকতা সম্ভব নহে। তাহার তাদৃশ অর্থান্তর কল্পনা করা সঙ্গত নহে। যদি কেহ তাহা করেন তবে শ্রুতহানি ও অশ্রুত-কল্পনা-দোষ ঘটিবে।

৪৪। "নচ পরিনিষ্ঠিতবস্তুস্বরূপত্বেপি প্রত্যক্ষাদিবিষয়ত্বং। তত্ত্বমসীতি ব্রহ্মাত্মভাবস্য শাস্ত্রমন্তরেণানবগম্যমানত্বাৎ।" "তস্মাৎ সিদ্ধং ব্রহ্মণঃ শাস্ত্রপ্রমাণকত্বং।" ইত্যাদি।

সিদ্ধ বস্তুর প্রতিপাদন যে প্রত্যক্ষাদি প্রমাণের বিষয় এমত নহে। যেহেতু "তত্ত্বমসি" মহাবাক্যের লক্ষ্য যে ব্রহ্মাত্মভাব তাহা শাস্ত্রপ্রমাণ ব্যতীত অবগত হওয়া যায় না। অতএব ব্রহ্ম-

স্বরূপ শাস্ত্র-প্রমাণসিদ্ধ।" এই সমস্ত বিচারের মর্ম্ম এই যে ব্রহ্ম-স্বরূপ চক্ষুকর্ণাদি ইন্দ্রিয়গোচররূপ প্রত্যক্ষ প্রমাণের বিষয় নহে। অনুমান ও উপমানের গোচর নহে। তাহা সিদ্ধবস্তুস্বরূপ। ফলে বিপক্ষপক্ষের আপত্তি এই যে, ব্রহ্ম যদি সিদ্ধ বস্তু হন তবে প্রত্যক্ষ প্রমাণের বিষয় কেন না হইবেন ? এই পূর্ব্বপক্ষের উত্তরে পূজ্যপাদ শঙ্করাচার্য্য কহিতেছেন যে সিদ্ধ বস্তু হইলেই যে প্রত্যক্ষাদি প্রমাণের বিষয় হইবেক এমত নহে। যেমন "আমিত্ব-বোধ"। ইহা প্রত্যক্ষ প্রমাণের বিষয় নহে। তথাপি নিশ্চয় হইতেছে "আমি আছি"। এই "আমিত্ব-বুদ্ধি" আত্মপ্রত্যয়ে সিদ্ধ আছে। এই "আমিত্ব-বুদ্ধি" রূপ প্রত্যয়ে কাহারো সন্দেহ হয় না। অতএব ব্রহ্ম-স্বরূপের অবগতি এই "অহংবুদ্ধির" ন্যায় আত্ম-প্রত্যয়-সিদ্ধ। বরং ব্রহ্মজ্ঞানী ব্রহ্মকে, সাংসারিক জীবের "অহংবুদ্ধি" অপেক্ষা, অধিক বিশদরূপে আত্মা—জ্ঞান করিয়া থাকেন। "আমি আছি" এই সহজ জ্ঞান যেমন জ্ঞানী ব্যক্তির আছে, সেইরূপ মুর্খেরও আছে। তৎসম্বন্ধে উভয় প্রকার ব্যক্তিরই স্থির নিশ্চয় আছে। কিন্তু তারতম্যে আকাশ পাতাল ব্যবধান। যেমন কোন রঙ্গশালাস্থ স্ফটিক-কমল-পরিশোভন আলোকাবলি দর্শনে অবোধ বালক সেই স্ফটিকোপাধি সমূহকেই আলোকের স্বরূপ মনে করে, সেইরূপ সংসার-মোহে বিমূঢ় অদূরদর্শী জনেরা হৃদয়-কমলবাসী, সর্ব্বসাধারণের আত্মাস্বরূপ, সকল জ্ঞানজ্যোতির আশ্রয়-স্বরূপ, সকল রূপের সাগর-স্বরূপ এবং সকল আনন্দ ও সকল রসের উৎস-স্বরূপ পরমাত্মাকে আত্মারূপে গ্রহণ না করিয়া তাঁহার প্রকাশে অনুপ্রকাশিত যে বিষয়ানন্দে প্রমত্ত অল্পজ্ঞ জীব তাহাকে আত্মাপদে বরণ করিয়া থাকে। তদপেক্ষাও মূঢ় জনেরা জীবের পশ্চাৎ প্রকাশিত বুদ্ধি, মন, প্রাণ, দেহ প্রভৃতি যে সকল অনিত্য কোষ আছে তাহার এক একটিকে উত্তরোত্তর আত্মা বলিয়া জানে। কিন্তু জীবাবধি দেহ পর্য্যন্ত ইহারা কেহই

স্বতঃসিদ্ধ, স্বয়ংসিদ্ধ, বা স্বয়ম্প্রকাশ আত্মা নহে। পরমাত্মাস্বরূপ ব্রহ্মের প্রকাশ দ্বারা জীবাবধি দেহ পর্য্যন্ত তারতম্যরূপে অনু-প্রকাশিত হয় বলিয়া মূঢ় জনেরা তৎসমস্তকে আত্মা বলিয়া জ্ঞান করে। কিন্তু সে জ্ঞান অধ্যাস মাত্র।

৪১। পরমাত্মাই আত্ম-বুদ্ধির প্রকাশক। তিনিই কূটস্থ চৈতন্য ও স্বয়ম্প্রকাশ স্বরূপ। তিনি স্বতঃসিদ্ধ। তাঁহার সিদ্ধতা আত্মপ্রত্যয়-মাত্র-সার। তিনি জীবের বুদ্ধি প্রভৃতি ক্ষুদ্র জ্ঞানের বিষয় নহেন। কেন না, তিনি সিদ্ধ বস্তু। তিনিই মুখ্য আত্মা। তাঁহার আলোকে অনুপ্রকাশিত হওয়ায়, জীবাত্মা, বুদ্ধি, মন, প্রাণ ও দেহাদি যে আত্মা বলিয়া গৃহীত হয়, সে আত্ম-ভাবের নিগূঢ় উদ্দেশ্য ও তাৎপর্য্য একমাত্র তাঁহাতেই অর্ষে। ঠিক্ সেই প্রকার; যেমন মূঢ় কর্ত্তৃক স্থিরীকৃত স্ফটিক-কমলের দীপ্তি তত্রাধিষ্ঠিত দীপেতে বর্ত্তিয়া থাকে। এতাবতা লোকে আত্মস্বরূপকে জানুক বা না জানুক তাহাদের ব্যবহৃত "আত্মা" শব্দের নিগূঢ় তাৎপর্য্য পরমাত্মাতে। সেই পরমাত্মা হইতে সহজ জ্ঞান ও আত্ম-প্রত্যয়সিদ্ধ আত্মবোধরূপ আলোকের স্রোত অবিরল ধারে পঞ্চকোষ ভেদ পূর্ব্বক প্রবাহিত হইতেছে। কিন্তু তাঁহাকে আত্মা বলিয়া গ্রহণ না করিয়া লোক সকল অনিত্য কর্ত্তৃভোক্তৃ স্বরূপ জৈবিক ব্যবহার বা দেহাদিকে আত্মা বলিয়া মানিতেছে। সেই সকল কর্ত্তৃভোক্তৃ ও দেহাদি-জনিত সুখ, দুঃখ আত্মাতে আরোপ পূর্ব্বক অশেষ সংসার-তাপ ভোগ করিতেছে। কিন্তু স্বতঃসিদ্ধ পরমাত্মা যিনি সকলের মুখ্য আত্মা তাঁহাতে সুখ দুঃখাদি স্পর্শিতে পারে না। "তিনিই আত্মা," "তিনিই আমি" এজ্ঞান জন্মিলে, প্রকৃতি-সম্বন্ধাধীন অহংভাব এবং আমি সুখী, আমি দুঃখী, ইত্যাদি অশেষ অভিমান বিগত হয়। কিন্তু অল্পজ্ঞ স্বরূপ জীবাত্মা, যিনি, আপনার আত্মজ্যোতির মূল-উৎস-স্বরূপ পরমাত্মাকে দেখিতে না পাইয়া এই দেহ-কুটীরে দিবা-

নিশি মুহ্যমান রহিয়াছেন; তাঁহাকে অহংভাব ও তাহার উপকরণ স্বরূপ দেহ, প্রাণ, মন, বুদ্ধি, কর্তৃত্ব, ভোক্তৃত্ব ইত্যাদি যাবতীয় আবরণ হইতে মুক্ত না করিলে প্রকৃত আত্মজ্ঞান জন্মিতে পারে না। ঐ সকল অনিত্য ও অকিঞ্চিৎকর আবরণ সমস্তকে ব্যতিরেক করিলেই জানা যায় যে পরমাত্মার আভাসরূপ অনুপ্রকাশই জীবাত্মার প্রকাশক। জীব স্বয়ংসিদ্ধ নহেন। তখন সেই জীবাত্মার জ্যোতি ও প্রতিষ্ঠা স্বরূপ পরমাত্মাই মুখ্য আত্মারূপে গৃহীত হন। এই যে অদ্বয় ব্রহ্মাত্মভাব ইহাই "তত্ত্বমসি," "অহংব্রহ্মাস্মি,' "প্রজ্ঞানংব্রহ্ম," ইত্যাদি বৈদান্তিক মহাবাক্য সমূহের তাৎপর্য্য। এ ভাব প্রত্যক্ষ ঘটপটাদি পদার্থের ন্যায় ইন্দ্রিয়গোচর নহে। জীবের সূক্ষ্ম শরীর অথবা পঞ্চভূতের কোন প্রকার অদৃশ্য সূক্ষ্ম লিঙ্গের ন্যায় অনুমেয় ও উপমেয়ও নহে। সুতরাং সেই পরমাত্মা ব্রহ্ম সিদ্ধবস্তু ও আত্মজ্ঞানের মুল উৎস হইলেও, এবং তাঁহার আশ্রয়ে সহজে "আমিত্ব" বোধ জন্মিলেও মিথ্যা ও অধ্যস্ত জ্ঞানের তিরস্কার পূর্ব্বক তাঁহার স্বরূপজ্ঞানোপদেশে শাস্ত্রের অধিকার আছে। ক্রিয়াপর ও ফল-শ্রুতি-জ্ঞাপক শাস্ত্রের সে অমূল্য অধিকার হইতে পারে না। কিন্তু একমাত্র-ব্রহ্ম-প্রতিপাদক উপনিষদাদি জ্ঞানকাণ্ডীয় বেদের এবং তাহার মীমাংসাস্বরূপ শারীরকাখ্য বেদান্ত দর্শনেরই তাহাতে অধিকার। এই সমস্ত বেদান্ত-শাস্ত্রে ক্রিয়া ও বিধির সংস্পর্শ না থাকাতে তাহার যদি অপ্রামাণ্য হয়, তাহা মূঢ় কর্ম্মীদিগের নিকটেই হইবেক। কিন্তু ব্রহ্মজ্ঞান ও ব্রহ্মস্বরূপোপদেশে তাহা অতিমাত্র উপযুক্ত। শুদ্ধ উপযুক্ত নহে, কিন্তু সেই সর্ব্বভুবন-প্রকাশক ব্রহ্মকে তাহা একেবারে সাক্ষাৎ আত্মারূপে হৃদয়ঙ্গম করিয়া দেয়। বেদান্তশাস্ত্র তাঁহাকে কোন ক্রিয়া বা সাধনার ফলরূপে অপ্রত্যক্ষ ভাবে নির্দ্দেশ করে না; কিন্তু জীবের হৃদয়কমলের মধ্যে তাঁহাকে জাজ্বল্যমান আত্মারূপে দেখাইয়া বাসনা-

ঘটিত ইন্দ্রজাল এবং যাগযজ্ঞাদি-ঘটিত কর্ম্মান্ধকারকে বিদূরিত করিয়া দেয়।

৪৬। অতএব কর্ম্মীরা যে কহেন যে সিদ্ধ বস্তু-স্বরূপ আত্মাকে প্রতিপাদন করায় হেয়োপাদেয় না থাকায় কোন পুরুষার্থ নাই সে কথা সঙ্গত নহে। কেননা, তদ্রূপে পরমাত্ম-স্বরূপ-প্রতিপাদনে অবশ্যই হেয়োপাদেয়ত্ব ও পুরুষার্থ আছে। কারণ জীবের প্রকৃতি-সম্বন্ধাধীন যে সকল দেহাত্ম, প্রাণাত্ম, মনাত্ম, ও বিজ্ঞানাত্ম ভাব তাহা যথার্থ আত্মভাব নহে। তৎসমস্তকে তিরস্কৃত করিতেই হইবে। তাহাই হেয়। সে সকল দ্বৈতস্বরূপ মায়িক জ্ঞান পরিত্যক্ত হইলেই স্বয়ম্প্রকাশ ও স্বতঃসিদ্ধ পরমাত্মজ্ঞান আপনিই উদিত হয়। তাহাই উপাদেয়। সুতরাং, এতাদৃশ ভাবে ব্রহ্মস্বরূপকে জীবের সিদ্ধ আত্মারূপে প্রতিপাদন করায় অবশ্য পুরুষার্থ আছে। এই ব্রহ্মাত্মভাব প্রসিদ্ধ হইলেও সকলের অনুভবনীয় নহে। অধিকাংশ লোকই স্বীয় স্বীয় প্রকৃতি-সম্বন্ধাধীন ব্যবহারিক সত্তা ও দেহাদিকে "আমি" বোধ করিয়া সংসারের স্রোতে ভাসিয়া যাইতেছেন। কোন প্রকার সাংসারিক বিদ্যা বুদ্ধি প্রতিপত্তি তাহা হইতে উদ্ধারের উপায় করিয়া দিতে পারিতেছে না। কোনরূপ যাগ, যজ্ঞ, ব্রত, অনশন, তীর্থসেবা এ ভবসাগর হইতে কখন কাহাকেও উদ্ধার করে নাই, করিবেও না। কেবল একমাত্র বৈদান্তিক জ্ঞানই তরণী। বেদান্ত-শাস্ত্র দ্বৈত-স্বরূপ যে অনাত্মা তাহাকে তিরস্কার পূর্ব্বক একমাত্র অদ্বয় পরমাত্মাকে জীবের আমিত্ব পদে বরণ করিয়াছেন। শাস্ত্র-দৃষ্টি দ্বারা জ্ঞানী পুরুষেরা প্রকৃতিসম্বন্ধাধীন মিথ্যা আমিত্বকে বিসর্জ্জন দিয়া সেই পরমাত্মাকেই আমি বলিয়া জানেন। এই প্রকারে ক্ষুদ্রে ও ব্যষ্টিতে আমিত্ব-বোধ তিরস্কৃত এবং মহতে ও সমষ্টিতে আমিত্ববোধ উপার্জ্জিত হওয়ায় জীবের মোক্ষলাভ হয়। সেই মোক্ষ কোন ফল নহে কিন্তু নিত্যসিদ্ধ পরমাত্ম স্বরূপের

প্রকাশ মাত্র। কেবল বেদান্ত-শাস্ত্র হইতেই এই প্রকারে ব্রহ্ম-স্বরূপের অবগতি হয়। অতএব ব্রহ্মের শাস্ত্র-প্রমাণত্ব এবং শাস্ত্রের ব্রহ্ম স্বরূপ-প্রতিপাদন-পরতা সিদ্ধ হইল।

৪৭। উপরে জীবের যেরূপ ব্রহ্মাত্মস্বরূপ মোক্ষাবস্থা কথিত হইল তৎপ্রতি কর্ম্মী প্রভৃতি বাদীদিগের আপত্তি আছে। সেই আপত্তির মর্ম্ম ও তাহার মীমাংসা পশ্চাৎ উক্ত হইবে। সম্প্রতি, অদ্বৈতবাদী বৈদান্তিকেরা কি অভিপ্রায়ে অল্পজ্ঞ জীবকে তিরস্কার পূর্ব্বক পরমাত্মাকে আমি বলিয়া গ্রহণ করেন তাহার সংক্ষেপ বিবরণ জ্ঞাত হওয়া উচিত। তাহা জ্ঞাত না হইলে, ঐ আপত্তি ও তাহার মীমাংসা বুঝা যাইবে না। কেন না এই বর্ত্তমান কালে অধ্যাত্ম-শাস্ত্রের আলোচনা নাই। অনেকে সাংসারিক জীবকে আত্মা বলিয়া গ্রহণ করেন এবং যজ্ঞোপাসনা দ্বারা তাহার পার-লৌকিক মঙ্গল কামনা করেন। সুতরাং "আমি ব্রহ্ম" এবোধ তাঁহাদের বুদ্ধিতে কিছুতেই সংলগ্ন হইবে না। পক্ষান্তরে অনেকের সিদ্ধান্ত এই যে সৃষ্ট জীবাত্মা কখন স্রষ্টা হইতে পারে না, উপাসক কখন উপাস্য হইতে পারে না এবং স্বাধীন জীবাত্মা কখনও ব্রহ্মে মিশিয়া গিয়া নিজে ব্রহ্ম হইতে পারে না। এস্থলে আমরা তাঁহা-দিগের সকলকে সাহস দিয়া বলিতেছি যে, বেদান্ত-শাস্ত্র তাঁহাদিগের সিদ্ধান্ত সমূহের অপলাপ করেন নাই। সৃষ্টি, স্থিতি, প্রলয়, কল্প, কল্পান্তর, অসংখ্য অসংখ্য স্বর্গাদি লোকমণ্ডল এবং অসীম অসীম ভোগকালব্যাপী যে সংসার তাহার অধিকার মধ্যে বেদান্ত শাস্ত্র জীবাত্মার কর্ত্তৃত্ব ভোক্তৃত্ব উপাসকত্ব প্রভৃতি সমস্তই স্বীকার করি-য়াছেন। তৎসম্বন্ধে ভুরি বিচার বেদান্ত দর্শনের পশ্চাতের সূত্রসমূহে আছে। আমরা যত অগ্রসর হইব, ততই তাহার উপাদেয় সিদ্ধান্ত সকল দেখা দিতে থাকিবে। ফলে সার কথা এই যে সে সকল সিদ্ধান্ত কেবল সাংসারিক। কিন্তু এ ক্ষেত্রে অহং ব্রহ্ম ভাবের

পারমার্থিক তাৎপর্য্য কি আমরা কেবল তাহাই বলিয়া প্রকৃত বিষয়ে মনোযোগ করিব।

৪৮। শ্রুতি কহিতেছেন "আত্মন্যেবাত্মানং পশ্যতি" আত্মাতেই পরমাত্মাকে দৃষ্টি করিবে। "হিরণ্ময়ে পরে কোষে বিরজং ব্রহ্ম নিষ্কলং" জীবাত্মারূপ জ্যোতির্ম্ময় কোষে ব্রহ্ম স্থিতি করেন। "তংহ দেবমাত্মবুদ্ধিপ্রকাশং" সেই পরমাত্মা আত্মবুদ্ধির প্রকাশক। এই প্রকারের বিস্তর শ্রুতি আছে। এই সকল শ্রুতির তাৎপর্য্য এই যে ব্রহ্ম পরমাত্মারূপে জীবাত্মার মধ্যে স্বয়ং-প্রকাশ, এবং জীবাত্মা সেই প্রকাশের দ্বারা প্রকাশিত। সুতরাং শ্রুতির স্থূল সিদ্ধান্ত এই যে "আত্মা" শব্দ যত বিশদ রূপে পরমাত্মাতে প্রয়োগ হইতে পারে তত জীবাত্মাতে নহে। সেই হেতু জীবাত্মা যত দূর পরমাত্মাকে আমি বলিতে পারেন তত আপনাকে নহে। কিন্তু স্বতঃসিদ্ধতা ও পরতঃসিদ্ধতা, নিরুপাধিত্ব ও সোপাধিত্ব প্রভৃতির বিচার ব্যতীত জীবের সেই পরমাত্মভাব সিদ্ধ হয় না। এ সংসারে জীবাত্মা প্রকৃতিনিষ্ঠ হইয়া আছেন। প্রকৃতিকে ব্যবহার ও ভোগ করিবার নিমিত্তে জীবাত্মার বিবিধ করণ বিদ্যমান আছে। মনোবুদ্ধি প্রভৃতি অন্তঃকরণ এবং দেহেন্দ্রিয়াদি বাহ্য করণ সমস্ত তাঁহার সহায়। জীবাত্মা এই সকল করণকে স্বীকার পূর্ব্বক স্থূল সূক্ষ্ম প্রাকৃতিক ঐশ্বর্য্য ভোগে উন্মত্ত আছেন। আমরা বিষয়ভোগের মধ্যে থাকিয়া জীবাত্মাকে ঐ সকল লক্ষণাত্মক রূপে বুঝিয়া থাকি। কিন্তু শাস্ত্র জীবাত্মার তদতীত একটি পারমার্থিক অবস্থা জ্ঞাপন করেন। সে অবস্থায় বিষয়-সম্বন্ধ থাকে না। তখন তাঁহাকে লক্ষ্য করা যায় এমন কোন লক্ষণ বা চিহ্ন এ সংসারে পাওয়া যায় না। স্থূল সূক্ষ্ম বিষয়ে প্রবৃত্ত অন্তঃকরণাদি তখন নিবৃত্ত হয়। এই সকল অন্তঃকরণাদি লক্ষণকে উপাধি কহে। জীবাত্মা সংসারাবস্থায় তদভিমানী। অতএব সে অবস্থায় তাঁহাকে সোপাধিক কহা

যায়। আর, পারমার্থিক অবস্থায় তিনি তাদৃশাভিমানশূন্য। সে জন্য তদবস্থায় তাঁহার কোন নির্দ্দেশ নাই। কেবল নিরুপাধিক বলিয়া উক্ত হন। ফলতঃ জীবাত্মার সোপাধিত্ব বিগত হইয়া নিরুপাধিত্ব প্রকাশিত হইলেও তিনি স্বয়ম্প্রকাশরূপ নহেন। পরমাত্মাই স্বয়ম্প্রকাশ ও স্বতঃসিদ্ধ। জীবাত্মা সেই পরজ্যোতিতে প্রকাশিত, সুতরাং পরতঃসিদ্ধ। পারমার্থিক অবস্থায় জীবাত্মা স্বয়ং উপাধিশূন্য বিধায় নিরুপাধিক পরমাত্মাকে দর্শন করিবার অধিকারী হন। দর্শনমাত্রে আপনার ক্ষুদ্রত্ব বিসর্জ্জন করিয়া সেই হৃদয়পুণ্ডরীকস্থ মহান্ আত্মাকে আত্মারূপে গ্রহণ করেন। এ ক্ষেত্রে উভয় আত্মাই নিরুপাধিক বিধায় উভয়ের মধ্যে কোন উপাধিগত ব্যবধান থাকে না। কেবল তাদৃশ পারমার্থিক দৃষ্টিতে ব্রহ্মবাদী "অহংব্রহ্ম" ভাব লাভ করিতে পারেন। তদ্ভিন্ন সে ভাবের কেহই অধিকারী নহেন। ইহাই সিদ্ধান্ত। এই অবস্থাই অমৃত। কিন্তু ইহা জীবাত্মার অত্যন্ত অভাবরূপ কোন লয়ের অবস্থা নহে। ইহা কেবল মাত্র জীবাত্মাভিমান-ত্যাগের এবং পরমাত্মজ্ঞানোদয়ের অবস্থা। ইহাই মোক্ষ।

৪৯। মাণ্ডূক্যোপনিষদে আছে

"সর্ব্বং হ্যেতদ্‌ব্রহ্ম অয়মাত্মা ব্রহ্ম সোঽয়মাত্মা চতুষ্পাৎ"।

এই জগতের সমুদয় বস্তু ব্রহ্ম, এই আত্মাই ব্রহ্ম, এই আত্মার চারি পাদ। এই শ্রুতির এমত অভিপ্রায় নহে যে ব্রহ্ম স্বয়ং এই জগৎ হইয়াছেন। ইহার মর্ম্ম এই যে ব্রহ্মরূপ কারণের অভাবে জগতের অসম্ভাব উপস্থিত হয়। অতএব সমুদয় জগতের যাহা সার, যাহা প্রাণ, যাহা আত্মা, তাহা তিনি। এস্থলে কার্য্যকারণের অভেদ লক্ষণায় সমুদয় জগৎ ব্রহ্মরূপে কথিত হইয়াছে। স্বরূপতঃ নহে। কিন্তু জগৎরূপ ব্যপদেশ দ্বারা যে ব্রহ্মোপদেশ তাহাতে ব্রহ্ম তৃতীয় পুরুষ রূপে নির্দ্দিষ্ট হন মাত্র। কেবল আত্মারূপেই

তিনি প্রত্যক্ষ। এই কারণে এই শ্রুতিতে পশ্চাৎ কহিলেন “এই আত্মাই ব্রহ্ম”। কিন্তু এরূপ উক্তিও সন্দেহশূন্য নহে। এজন্য আত্মার চারি পাদ কল্পনা পূর্ব্বক সোপাধিক ও অপ্রত্যক্ষহেতুক তিন পাদকে ত্যাগ করিয়াছেন। কেবল অবশিষ্ট পাদ যাহা নিরুপাধিক এবং জীবাত্মার প্রত্যক্ষ অন্তরাত্মা, তাঁহাকেই মোক্ষাধিকারে বিজ্ঞেয় বলিয়াছেন। আত্মার সোপাধিক ও অপ্রত্যক্ষ যে পাদত্রয় তাহার নির্দ্দেশ এই। এই জগৎ এবং জীবের স্থূল সূক্ষ্মাদি দেহ এই সমস্ত উপাধি-শব্দের বাচ্য। জগৎ ও দেহের তিন অবস্থা। বীজ বা কারণাবস্থা, অঙ্কুর বা সূক্ষ্মাবস্থা, পরিণত বা স্থূলাবস্থা। এই সর্ব্বাবস্থাতে পরমাত্মা উপহিত বা ঔপাধেয়। এই সমস্ত অবস্থাতেই তিনি স্রষ্টা, পাতা, বিধাতা, অন্তর্যামী ও নিয়ন্তারূপে বর্ত্তমান। জীবেরও ঐ তিন অবস্থা। তাহাও ঔপাধিক। জাগ্রদবস্থায় স্থূলের প্রভাব, স্বপ্নাবস্থায় সূক্ষ্ম শরীরের প্রভাব, এবং সুষুপ্তিতে কারণ-দেহ-স্বরূপিণী অব্যক্ত প্রকৃতির প্রভাব। এই প্রত্যেক অবস্থায় পরমাত্মা উপহিত ও নিয়ন্তা। কিন্তু উহার কোন অবস্থাতেই পরমাত্মা প্রত্যক্ষরূপে দৃষ্ট হন না। এই ত্রিবিধ অবস্থাপন্ন সোপাধিক ঈশ্বরকে জীবের আত্মা বলা শাস্ত্রের অভিপ্রায় নহে কিন্তু তাঁহার যে চতুর্থ-পাদ-স্বরূপ মোক্ষ-জনন নিরুপাধিক অংশ আমাদের আত্মার স্বামি রূপে বা সাক্ষাৎ আত্মা রূপে আমাদের আত্মাতেই বিরাজিত, তিনিই প্রকৃত আত্মা বলিয়া অভিহিত হন। ব্রহ্মজ্ঞানীর জীবাত্মাতে দ্বৈত নাই। তাঁহার সংসার-বুদ্ধি ও তৎসহকারী অন্তঃকরণাদি অর্থাৎ স্থূল, সূক্ষ্ম, কারণ শরীরাভিমান রূপ কোন উপাধি থাকে না। সুতরাং তাঁহার জীবাত্মা নিরুপাধিক। তাঁহার যিনি প্রকাশক আত্মা তিনি সৃষ্টি সংসারের অতীত রূপে নিরুপাধিক। অতএব ব্রহ্মজ্ঞানীর জীবাত্মা সর্ব্বপ্রকার সোপাধিক অহংজ্ঞানের অভাবে, অথচ স্বীয়-

পরতঃসিদ্ধতা হেতু নিরুপাধিক অহংব্রহ্মজ্ঞানে সিদ্ধ হয়। কিন্তু অল্পজ্ঞ স্বরূপ জীবাত্মা যে বাস্তবিক ব্রহ্ম অথবা মোক্ষাবস্থায় ব্রহ্ম হইয়া যায় শাস্ত্রের সে অভিপ্রায় নহে।

৫৭। মহর্ষি বেদব্যাসও স্বীয় ব্রহ্মমীমাংসায় শ্রুতির ঐ তাৎপর্য্যই গ্রহণ করিয়াছেন। তিনি,"শাস্ত্রদৃষ্ট্যা তূপদেশ বামদেববৎ" (১।১।৩০) ইত্যাদি সূত্রে যে বিচার করিয়াছেন তাহা হইতে অতি সুন্দর সিদ্ধান্ত লাভ হইতেছে। ব্রহ্মকে আপনার আত্মা হইতে দূরস্থ ও পৃথক্ জ্ঞান করিবে না। কিন্তু কোন ব্যক্তি যদি শাস্ত্রদৃষ্টিতে বামদেব ঋষির ন্যায় আপনাকেই ব্রহ্মরূপে বর্ণন করেন, তাহাতে এমন মনে করা উচিত নহে যে, তদ্দ্বারা তাঁহার স্বীয় ক্ষুদ্র জীবাত্মা ব্রহ্ম হইয়া গেল। কিন্তু ইহাই বুঝিতে হইবে যে তাঁহার আত্মা এক মাত্র ব্রহ্মজ্ঞানে আলোকিত হওয়ায় তিনি মুখ্য আত্মা স্বরূপ ব্রহ্মকেই আত্মা রূপে দৃষ্টি করিয়াছেন। এস্থলে মহাত্মা রামমোহন রায় "অহং ব্রহ্মাস্মি" প্রভৃতি ব্রহ্মাত্মভাব সম্বন্ধে কহিয়াছেন যে "ইত্যাদি বাক্যের অধিকারী সকলেই হয়েন, এ নিমিত্তে তাঁহাদিগ্যে জগতের স্বতন্ত্র কারণ এবং উপাস্য করিয়া স্বীকার করা যায় না"। অর্থাৎ, পারমার্থিক ভাবে সকলেই অহং ব্রহ্মবাদ অবলম্বন করিতে পারেন। কিন্তু তাই বলিয়া যে তাঁহারা জগৎকারণ ও উপাস্য রূপে গৃহীত হইবেন এমন নহে। এ সম্বন্ধে উক্ত মীমাংসায় "আত্মেতি তূপগচ্ছন্তি গ্রাহয়ন্তি চ" (৪।১।৩) প্রভৃতি সূত্রে ব্যাসদেব আরো সিদ্ধান্ত করিয়াছেন যে মোক্ষের নিমিত্তে ব্রহ্মজ্ঞ সাধু ব্রহ্মকেই আত্মা রূপে গ্রহণ করিবেন ও করাইবেন। এবং উপাসনার নিমিত্তে "মনোব্রহ্মেত্যুপাসীত" প্রভৃতি শ্রুতি অনুসারে নিকৃষ্ট মনাদিকেও উৎকৃষ্ট ব্রহ্মদৃষ্টিতে গ্রহণ করিবে। কিন্তু তাই বলিয়া মনাদি সাক্ষাৎ ব্রহ্ম হইল এমত নহে। কেবল উপাসনার নিমিত্তে তাহা উৎকৃষ্ট অধ্যাসমাত্র। অতএব আচার্য্যেরা কহিতেছেন যে

"অহংব্রহ্মাস্মি, অহমাত্মাব্রহ্মেত্যাদি মহাবাক্যৈঃ তত্ত্ববিদঃ আত্মত্বেন ব্রহ্ম গৃহ্নন্তি, তথা তত্ত্বমসীত্যাদিমহাবাক্যৈঃ স্বশিষ্যান্ গ্রাহয়ন্তি।"

"অহংব্রহ্মাস্মি" "অহমাত্মাব্রহ্ম" ইত্যাদি মহাবাক্য দ্বারা তত্ত্ববিৎ ব্যক্তিগণ ব্রহ্মকেই আত্মারূপে গ্রহণ করিবেন এবং "তত্ত্বমসি" মহাবাক্য দ্বারা সেই ভাব স্বীয় স্বীয় শিষ্যগণকেও গ্রহণ করাইবেন। কিন্তু

"ন বক্তুরাত্মোপদেশাদিতিচেদধ্যাত্মসম্বন্ধভূমাহ্যস্মিন্।" (১।১।২৯)

ব্রহ্মজ্ঞ বক্তা আপনাকে ও শিষ্যকে পরমাত্মারূপে উপদেশ করিলেই সে বক্তার আত্মা যে উপাস্য হয় এমত নহে। এই সকল বাক্যের দ্বারা স্থির হইল যে বেদান্ত শাস্ত্র পরমাত্মাকে স্বয়ম্প্রকাশ ও প্রসিদ্ধ আত্মা রূপে গ্রহণ করিয়াছেন, কিন্তু জীবাত্মাকে ব্রহ্ম বলেন নাই।

৫১। বৈদান্তিক আচার্য্যেরা "জীব-ব্রহ্ম" ও "জগদ্‌ব্রহ্ম" বাদকে যেরূপ তাৎপর্য্যে গ্রহণ করিয়াছেন তাহা অযুক্ত নহে। শ্রুতিবাক্য সকল অতি সংক্ষিপ্ত। অনেক শ্রুতির অর্থ সুস্পষ্ট নহে। শ্রুতমাত্রে তাহার এক প্রকার অর্থ বোধ হয়। কিন্তু লিঙ্গ-ষট্‌ক দ্বারা বিচার করিলে তাহার প্রকৃত অর্থ জ্ঞাত হওয়া যায়। এস্থলে একটি লৌকিক দৃষ্টান্ত গ্রহণ করায় ক্ষতি নাই। যথা, "প্রদীপ"। এই শব্দটি উচ্চারণ মাত্রেই একটি অর্থবোধ হইবে। স্থূলতঃ তৈলাধার পাত্রের সহিত প্রজ্বলিত বর্ত্তিকাকে "প্রদীপ" বলিয়া বুঝাইবে। কিন্তু যাঁহার যৎকালে যেমন নিষ্ঠা তিনি তৎকালে "প্রদীপ" শব্দে সেই অর্থ গ্রহণ করিতে পারেন। চিত্ত যদি আলোকনিষ্ঠ থাকে, তবে প্রদীপ শব্দের আলোকই লক্ষ্য হইবে; আর যদি পাত্রনিষ্ঠ থাকে, তবে তাহার লক্ষ্য তৈলাধার হইবে। দেখ, এই একটি সামান্য শব্দ যাহা লইয়া আমরা প্রত্যহ ব্যবহার করি তাহার অর্থে এত গোল। "শব্দস্যাচিন্ত্যশক্তিত্বাৎ" শব্দের অচিন্ত্য শক্তি। তাহাতে, প্রতি শব্দই নানা অর্থে গৃহীত হইতে

পারে। কিন্তু, প্রকরণগত লিঙ্গষট্‌ক দ্বারা বিচার পূর্ব্বক ঋষি ও আচার্য্যগণ যে অর্থ অবধারণ করেন তাহাই উপাদেয়। কূট ও আভাস চৈতন্য, সর্ব্বংখল্বিদং ব্রহ্ম, তত্ত্বমসি, অহংব্রহ্মাস্মি, প্রভৃতি বৈদান্তিক শব্দ সমূহের যথাশ্রুত অর্থ এই যে জীবব্রহ্ম, জগৎব্রহ্ম, তুমি ব্রহ্ম, আমি ব্রহ্ম, ইত্যাদি। ফলে যথাশ্রুত অর্থে শাস্ত্রের তাৎপর্য্য নহে। দ্বৈতবাদী আচার্য্যগণ অন্বয় ব্যতিরেক দ্বারা ঐ সমস্ত বাক্যেরই অর্থ দ্বৈত পক্ষে গ্রহণ করিয়াছেন। সুতরাং জগৎ ও জীব যে ব্রহ্ম নহে তাঁহারা তাহাই দর্শাইয়াছেন। অদ্বৈতবাদী আচার্য্যেরা ঐ সকল বাক্য দ্বারা কেবল একমাত্র অদ্বয় ব্রহ্মভাব গ্রহণ করিয়াছেন। যেমন আলোকনিষ্ঠ চিত্ত তৈলাধার পাত্রকে অবাধে ব্যতিরেক করে, সেইরূপ অদ্বৈতবাদী আচার্য্যেরা পরম বৈরাগ্য সহকারে জগৎ ও জীবাত্মারূপ দ্বৈতাবরণ ব্যতিরেক পূর্ব্বক আপনাদের অদ্বয় ব্রহ্মনিষ্ঠার পরাকাষ্ঠা দেখাইয়াছেন। ঐ সকল দ্বৈতকে তাঁহারা পারমার্থিক দৃষ্টিতে ত্যাগ করিয়াছেন মাত্র, কিন্তু তৎসমূহকে ব্রহ্ম বলা তাঁহাদের উদ্দেশ্য নহে। জগৎ ও জীবাত্মারূপ দ্বৈত সেই অদ্বয় পরমাত্মার আলোকে প্রকাশিত।

৫২। এই কারণে তাঁহারা পরমাত্মাকে আতপ এবং উক্ত দ্বৈত সমূহকে ছায়া, পরমাত্মাকে সত্যস্বরূপ এবং দ্বৈত জগৎ ও জীবকে মিথ্যা স্বরূপ কহিয়াছেন। একেবারে অলীক কহেন নাই। কেন না ইতিপূর্ব্বে উক্ত হইয়াছে যে, মিথ্যা দুই প্রকার। এক প্রকার মিথ্যা অভাববাচক এবং দ্বিতীয় প্রকার মিথ্যা ভ্রমবাচক। বন্ধ্যার পুত্র, শশশৃঙ্গ, আকাশকুসুম এ সকল অভাববাচক। তৎসমস্ত অস্তিত্বশূন্য-ত্রিকাল-মিথ্যা। জগৎকে এ প্রকার মিথ্যা বলা শাস্ত্রের অভিপ্রায় নহে। কিন্তু তাহাকে মায়িক বলাই উদ্দেশ্য। মায়িক অর্থাৎ অধ্যাস বা ভ্রম। এক বস্তুতে অন্য বস্তুর জ্ঞানের নাম অধ্যাস। অর্থাৎ একটা বস্তু মূলে আছে, তাহা কি জানি না।

সমুদয় জড় ও জীবসমন্বিত এই বিশ্বের নাম মহৎপ্রপঞ্চ। যেমন দগ্ধ লৌহপিণ্ডের সর্ব্বাঙ্গে অগ্নি ওতপ্রোত এই বিশ্বে সেই রূপ ব্রহ্ম ওতপ্রোতভাবে পরিব্যাপ্ত আছেন। "অয়োদহতি" (লৌহ-পিণ্ড দহন করিতেছে) এই কথা বলিলে তাহার সূক্ষ্ম সূক্ষ্ম দুইটি তাৎপর্য্য গ্রহণ করা যাইতে পারে। তাহার একটি বাচ্যার্থ এবং অন্যটি লক্ষ্যার্থ। বাচ্যার্থ এই যে সাগ্নিক যে লৌহপিণ্ড তাহাই কোন পদার্থকে দহন করিতেছে। আর লক্ষ্যার্থ এই যে স্বয়ং লৌহ-পিণ্ডের কোন দাহিকা শক্তি নাই, সুতরাং তাহাতে ওতপ্রোতরূপে ব্যাপ্ত অথচ তাহা হইতে ভিন্ন যে অগ্নি তাহাই দহন করিতেছে। "অয়োদহতি" এই বাক্যের তাহাই লক্ষ্যার্থ। সেইরূপ "সর্ব্বং খল্বিদং ব্রহ্ম" (ব্রহ্মই জগৎ) এই বাক্যটির বাচ্যার্থ ও লক্ষ্যার্থরূপ দুইটি সূক্ষ্ম তাৎপর্য্য আছে। তাহার বাচ্যার্থ এই যে এই জগতে ব্রহ্ম ওতপ্রোতভাবে প্রবিষ্ট থাকায় সমস্ত জগতই ব্রহ্মরূপে গৃহীত হইতে পারে। কিন্তু তাহার লক্ষ্যার্থ অর্থাৎ প্রকৃতার্থ এই যে জগৎ কেবল হেয় উপাধি মাত্র। অনুৎকর্ষ হেতু সেই ভুতমাত্রোপাধিকে তিরস্কার করিতে হইবে। তিরস্কার করিলে তাহাতে সর্ব্বতোভাবে উপহিত, অথচ তাহা হইতে দগ্ধদারুনিঃসৃত অনলের ন্যায় স্বতন্ত্র যে ব্রহ্ম অবশিষ্ট থাকেন তিনিই উপাদেয়। তিনিই লক্ষ্য এবং বেদ্য। অতএব "সর্ব্বং খল্বিদং ব্রহ্ম" এই মহাবাক্যের লক্ষ্য সেই জগৎ হইতে ভিন্ন-স্বভাব-বিশিষ্ট ব্রহ্ম। নতুবা দেহকে আত্ম-বোধ করা যেমন স্থূল বুদ্ধির কার্য্য, দগ্ধ লৌহ-পিণ্ড বা দগ্ধ দারুকে অগ্নিবোধ করা যেমন অবিশুদ্ধ বোধ, জগৎকে ব্রহ্ম বোধ করা সেইরূপ স্থূল বুদ্ধির কার্য্য। জ্ঞানই সর্ব্বপ্রকার প্রচলিত কুসংস্কারের বিনা-শক। ব্রহ্মজ্ঞ ব্যক্তি জ্ঞানযোগে কেবল ভাবই গ্রহণ করিবেন। অসংস্কৃত-চিত্ত শ্রুতকথাগ্রাহী ইতর লোকের ন্যায় তিনি শব্দের বাচ্যার্থ মাত্রে সন্তুষ্ট হইবেন না।

৫৪। শ্রীমান সদানন্দ যোগীন্দ্র "তত্ত্বমসি" মহাবাক্যের বিচারেও পূর্ব্বোল্লিখিত ন্যায়টিকে যোজনা করিয়াছেন। মহর্ষি উদ্দালক স্বীয় পুত্র শ্বেতকেতুকে "তত্ত্বমসি" (তুমিই ব্রহ্ম) এই উপদেশ দিয়াছিলেন; কিন্তু এই উপদেশের যথাশ্রুত অর্থে কোন ঋষি বা আচার্য্য শ্রদ্ধা প্রকাশ করেন নাই। কারণ শ্বেতকেতু একজন মনুষ্য, অথবা শ্বেতকেতুর জীবাত্মা অল্পজ্ঞ মাত্র; তৎপ্রতি ব্রহ্মসম্বোধন সম্ভবে না। সুতরাং ঋষি ও আচার্য্যগণ উহার যথাশ্রুত অর্থ পরিত্যাগ পূর্ব্বক উহার নিগূঢ় ও উপাদেয় অর্থ গ্রহণ করিয়াছেন। পূর্ব্বে "সর্ব্বং খল্বিদং ব্রহ্ম" এই মহা বাক্যের বিচারে ব্রহ্মনিরূপণ করা গিয়াছে তাহাই ব্রহ্মের বিশুদ্ধভাব।

প্রথমতঃ। ব্রহ্ম এই জড় ও জীব-জগতে ব্যাপ্তও আছেন, ইহার অতীতও আছেন। তিনি সমুদয় দেহের কারণ, সুক্ষ্ম, ও স্থূলাবস্থায় উপহিত। তত্তদবস্থা সম্বন্ধে তাঁহার ঈশ্বর, হিরণ্যগর্ব্ভ, ও বিরাট প্রভৃতি নাম হয়। ফলে একমাত্র ব্রহ্মই এ সকল কল্পিত ঈশ্বরাদির আধার চৈতন্য। তিনি অধিকাংশতঃ অনুপহিত। তদুপলক্ষে তাঁহার নাম তুরীয়। সে অবস্থায় তিনি প্রকৃতি ও সংসারধর্ম্মের অতীত। "লোহে দহন করিতেছে" এই কথা বলিলে অগ্নিই যেমন লক্ষিত হয়, লৌহ লক্ষিত হয় না, সেইরূপ "ব্রহ্ম" শব্দ উচ্চারণ করিলে তাহার যে বিশুদ্ধ লক্ষ্যার্থ অর্থাৎ অনুপহিত ও তুরীয় ভাব তাহাই গ্রহণ করিতে হইবে। এবং উক্ত উপহিত ও কল্পিত ঈশ্বরাদি ভাব সমূহকে ত্যাগ করিতে হইবে। অতএব উদ্দালক শ্বেতকেতুকে যে ব্রহ্ম বলিয়া সম্বোধন করিয়াছেন সে কোন্ ব্রহ্ম? ইহার উত্তর এই যে তিনি ঈশ্বর নহেন, হিরণ্যগর্ব্ভ নহেন, বিরাট নহেন। সৃষ্টি, স্থিতি, প্রলয়ে পরমেশ্বরের যে নিয়ন্তৃ রূপ বিদ্যমানতা তাহাও নহেন। তিনি সমস্ত ঈশ্বরদিগের আধার চৈতন্য স্বরূপ পরম মহেশ্বর। তিনি উপাধি-কল্পনা শূন্য।

দ্বিতীয়তঃ। কিন্তু প্রশ্ন এই যে শ্বেতকেতু কি প্রকারে সেই উপাধি-কল্পনা-শূন্য ব্রহ্ম হইবেন? এস্থলে "শ্বেতকেতু" নামের মূল অর্থ কি? শাস্ত্রের উত্তর এই যে সেই মূল অর্থ ব্রহ্ম। তাহা শ্বেতকেতুর সাংসারিক কর্তৃভোক্তৃস্বরূপ অথবা নিরুপাধিক জীবাত্মাকে প্রতিপন্ন করে না, শ্বেতকেতুর কারণ-দেহ-স্বরূপ প্রকৃতিকে প্রতিপন্ন করে না, তাঁহার সূক্ষ্ম শরীররূপ মনোবুদ্ধি প্রাণেন্দ্রিয়াদিকে নির্দ্দেশ করে না এবং সেই সমস্ত শরীরে উপহিত চৈতন্যস্বরূপ প্রাজ্ঞ, তৈজস ও বিশ্ব নামক ঈশ্বরের ব্যষ্টি নিয়ন্তৃরূপ বিদ্যমানতাকেও প্রতিপন্ন করে না। তাহা ব্রহ্মকেই প্রতিপন্ন করে। কেন না দেহ আত্মা নহে এবং দেহের মধ্যে উপহিত থাকিয়া ব্রহ্মচৈতন্যের যে সমস্ত অংশ অজ্ঞাতরূপে দেহব্যাপারকে নিয়মিত করিতেছেন তাহাও আত্মা নহে। কিন্তু তৎসমস্তের আধারভূত, বিশুদ্ধ জীবাত্মার প্রকাশক-স্বরূপ, সংসার-ধর্ম্মের অতীত যে ব্রহ্ম তিনিই আত্মা। তিনিই "অয়োদহতি" বাক্যের লক্ষ্যার্থের ন্যায় শ্বেতকেতুর স্বয়ম্প্রকাশ, স্বতঃসিদ্ধ, আধার-চৈতন্যরূপ প্রত্যক্ষ আত্মা। উদ্দালক পরমার্থ-দৃষ্টিতে স্বীয় পুত্রের সাংসারিক জীবত্বকে ও তাহার ব্রহ্মাশ্রিত বিশুদ্ধ জীবাত্মাকেও অতিক্রম পূর্ব্বক তাহার মূল প্রকাশক স্বরূপ ব্রহ্মজ্যোতিকে তাঁহার আত্মপদে দর্শন করিয়াছেন। সেই বিশুদ্ধ মুখ্য আত্মাকে তিনি "তুমি" বলিয়া লক্ষ্য করিয়াছেন। সামান্য শ্বেতকেতু এস্থলে উপলক্ষ মাত্র। সুতরাং সামান্য শ্বেতকেতু বা তাঁহার সাংসারিক বা অসংসারী জীবাত্মা যে ব্রহ্ম এমন উক্ত হয় নাই। অথবা শ্বেতকেতুর জীবাত্মা যে শরীরাদির নিয়ন্তা অজ্ঞাত ঈশ্বর এমনও কথিত হয় নাই। কিন্তু শ্বেতকেতুর আত্মবোধের যিনি প্রকাশক আত্মা ও জাজ্বল্যমান অবলম্বন তাঁহাকেই ব্রহ্ম বলা হইয়াছে। তিনিই শ্বেতকেতুর মুখ্য ও মূল আত্মা। এতাবতা শ্বেতকেতুর প্রতি "তুমি ব্রহ্ম" বাক্য সংলগ্ন হইল। "যিনি

অপ্রত্যক্ষরূপে জগতের সমষ্টি আত্মা তিনিই প্রত্যক্ষরূপে তোমার ব্যষ্টি আত্মা” এই মোক্ষজনন আত্মোপদেশ শ্বেতকেতুর প্রতি প্রদত্ত হইয়াছে। এস্থানে সমষ্টি, ব্যষ্টি, প্রত্যক্ষ, অপ্রত্যক্ষ প্রভৃতি ভাব সমস্ত আপেক্ষিক ও সম্বন্ধাধীন ভাব মাত্র। তৎসমস্ত ত্যাগ করিলে একমাত্র নিত্য, অদ্বয়, জ্ঞানানন্দ স্বরূপ আত্মাই স্বয়ম্প্রকাশ থাকেন। সেই অদ্বয় আত্মজ্ঞানই একমাত্র মোক্ষের হেতু এবং বেদান্তবেদ্য।

৫৫। কিন্তু জিজ্ঞাস্য এই যে তবে কি আমাদের স্বাধীন জীবাত্মা, স্বাধীন কর্ত্তৃত্ব ভোক্তৃত্ব উৎসন্ন হইল? এ কথার প্রতি বেদান্তের উত্তর এই যে কর্ম্মাধিকারে স্বাধীন ক্রিয়া ও কৃত কর্ম্মের ফলভোগ কোটি কল্পেও রহিত হইবে না। কিন্তু জ্ঞানাধিকারে স্বপ্রকাশ পরাবর আত্মা হৃদয়ে দৃষ্ট হইবামাত্রে ঐ সমস্ত দ্বৈতভাব তিরোহিত হইবে। তখন স্বাধীনতার অহঙ্কার বিদূরিত হইবে। পরমাত্মাতেই জীবের পূর্ণ নির্ভর স্থির হইবে। এবং স্বীয় বুদ্ধি বিদ্যা সেই আত্মার প্রচুর জ্যোতিতে দিবাভাগের খদ্যোতিকার ন্যায় অভিভূত হইয়া যাইবে। সাধনা, উপাসনা, যাগযজ্ঞ, সন্ন্যাস, প্রভৃতি আশ্রম-বিহিত ক্রিয়া এবং নানাবিধ বিদ্যার আলোচনা দ্বারা জীব ইহ-লোকাবধি পরলোক পর্য্যন্ত স্থূল সূক্ষ্ম বিস্তর প্রতিপত্তি লাভ করিতে পারেন। কিন্তু পরমাত্মার সাক্ষাৎকার ব্যতীত সকলই অন্ধকার। শঙ্করাচার্য্য কহিয়াছেন “পরমার্থভাবমপেক্ষ্য দেবা-দয়োপি অসুরাঃ”। যদি পরকালে ব্রহ্মলোকেও গমন হয় এবং পরমাত্মজ্ঞান না থাকে তবে সেই ব্রহ্মলোকও অসুরলোকের তুল্য। কেন না তাদৃশ ব্যক্তির পক্ষে তাহা অজ্ঞানতমসাচ্ছন্ন। অতএব পরমাত্মার সাক্ষাৎ দর্শন কর্ত্তব্য। তাহার নিমিত্তে জীবের দেহাভি-মান, বিজ্ঞানাভিমান, কর্ত্তৃভোক্তৃত্বাভিমান, উপাসনাভিমান পরি-ত্যক্ত হওয়াই প্রয়োজন। কেননা পরমাত্মা স্বয়ংপ্রকাশ স্বরূপ।

ঐ সকল দ্বৈতরূপ অভিমান তিরস্কৃত হইলেই তিনি জীবাত্মাতে আত্মারূপে দৃষ্ট হন।

তত্র বৃত্তৌ প্রতিবিম্বিতং চৈতন্যমপি যথা প্রদীপপ্রভা আদিত্যপ্রভাবভাসনাসমর্থা সতী তয়াভিভূতা ভবতি, তথা স্বয়ংপ্রকাশমানপ্রত্যগভিন্নপরব্রহ্মাবভাসনানর্হতয়া তেনাভিভূতং সৎ স্বোপাধিভূতাখণ্ডবৃত্তের্বাধিতত্বাৎ দর্পণাভাবে মুখপ্রতিবিম্বস্য মুখমাত্রবৎ প্রত্যগভিন্নং পরব্রহ্মমাত্রং ভবতি। (সদানন্দ)

নয়ন-দর্পণে প্রতিবিম্বিত জ্যোতিঃ যেমন নয়নাকারাকারিত, সেইরূপ জীবের অন্তঃকরণ-দর্পণে কূটস্থ ব্রহ্মচৈতন্যের প্রতিবিম্বিত আভাসচৈতন্য তদাকারাকারিত। চক্ষুর দর্শন-ক্রিয়াতে জ্যোতিঃ যেমন সহায়, অন্তঃকরণ-বৃত্তির সাংসারিক ক্রিয়াতে আভাসচৈতন্য সেইরূপ সহায়। কিন্তু জীবের ব্রহ্মদর্শনে উক্ত আভাসচৈতন্য অন্তঃকরণ-বৃত্তি সমূহকে কোন আনুকূল্য করিতে পারে না। বরং জীবের ব্রহ্মদর্শনরূপ সৌভাগ্যোদয় হইলে ঐ আভাস অন্তঃকরণ-বৃত্তির সহিত পরাভূত হইয়া যায়। যেমন দীপের প্রভা সূর্য্য-প্রভাকে প্রকাশ করিতে অসমর্থ হইয়া সূর্য্যপ্রভা কর্ত্তৃক স্বয়ং অভিভূত হয়, তদ্রূপ অন্তঃকরণ-বৃত্তিতে প্রতিবিম্বিত পরিচ্ছিন্ন আভাস-চৈতন্য পরব্রহ্ম চৈতন্যকে প্রকাশ করিতে অসমর্থ হইয়া স্বয়ং অভিভূত হয়। জীবের ব্রহ্মদর্শনরূপ সৌভাগ্যোদয় কালে সংসার-বাসনার অন্ত হওয়ায় অন্তঃকরণের বৃত্তি-প্রবাহ রহিত হয়। সে জন্য উক্ত আভাসচৈতন্য আর তাহাতে প্রতিফলিত হয় না। তখন যেমন দর্পণাভাবে মুখ মুখমাত্রই থাকে তদ্বৎ অন্তঃকরণ-বৃত্তির অভাবে প্রতিবিম্বিত আভাস-চৈতন্য ব্রহ্ম মাত্রই থাকেন। কিন্তু তৎকালে জীবাত্মা ব্রহ্ম হইয়া যান এমত উক্ত হয় নাই। তখন কেবল জীবাত্মার সংসারক্ষেত্রে বিচরণশীল অন্তঃকরণ-বৃত্তি সমূহের নিরোধ হয়। জীবাত্মা স্বীয় বৃত্তিপ্রকাশক আভাসরূপী ব্রহ্ম-জ্যোতিকে পরব্রহ্মের সহিত অভেদরূপে দৃষ্টি করেন। এবং

তাঁহার সংসার ও সাংসারিক জীবাভিমানশূন্য হওয়ায় একমাত্র নির্ব্বিশেষ কূটস্থ পরমাত্ম-চৈতন্য তাঁহার সাক্ষাৎ আত্মারূপে প্রকাশ পাইয়া থাকেন *। স্থূল কথা এই যে জীবের অন্তঃকরণ-বৃত্তিস্থ বুদ্ধি বিদ্যা পরব্রহ্মকে কোন মতেই প্রকাশ করিতে পারে না। তবে বেদান্ত-বিজ্ঞান দ্বারা ব্রহ্ম-স্বরূপাবগতির প্রতিবন্ধকরূপ অজ্ঞান সমস্ত নষ্ট করিতে পারে এই মাত্র।

"ব্রহ্মণ্যজ্ঞাননাশায় বৃত্তিব্যাপ্তিরপেক্ষিতঃ।
স্বয়ং প্রকাশমানত্বাৎ নাভাস উপযুজ্যতে॥"

ব্রহ্ম সম্বন্ধীয় অজ্ঞান-নাশের নিমিত্তে শ্রবণ মননার্থ অন্তঃকরণ-বৃত্তির অপেক্ষা করে। কিন্তু ব্রহ্ম স্বয়ংপ্রকাশ বিধায় অন্তঃকরণ-বৃত্তিস্থ আভাস-চৈতন্য অথবা তদালোক-সম্পাদ্য জীবাত্মা তাঁহাকে প্রকাশ করিতে সমর্থ নহে। অভিপ্রায় এই যে জীবাত্মাতে যখন পরমাত্মার স্বরূপজ্ঞান সমুজ্জ্বলিত হইয়া উঠে, তখন জীবাত্মা স্বয়ং, তাঁহার আভাস-চৈতন্য, এবং তাঁহার বুদ্ধি বিদ্যার সহিত অন্তঃকরণ-বৃত্তি, এ সমস্তই পরব্রহ্মজ্যোতিতে অভিভূত হইয়া যায়। তাহাতে একমাত্র ব্রহ্মই আত্মারূপে প্রকাশ পান।

৫৬। উপরে শ্রুতি, ব্যাস-মীমাংসা, এবং আচার্য্যগণের সিদ্ধান্ত-বাক্য দ্বারা জীবের ব্রহ্মাত্মভাবের যে তাৎপর্য্য দেওয়া গেল তদ্দ্বারা সর্ব্বতোভাবে ইহাই বুঝা যাইবে যে স্বয়ংপ্রকাশস্বরূপ পরমাত্মাই জীবাত্মার জ্যোতিঃ বিধায় শাস্ত্র একেবারে তাঁহাকেই আত্মারূপে গ্রহণ করিয়াছেন। এবং জীবাত্মাকে সাংসারিক ভাব হইতে

* অতিরিক্ত পত্র সংখ্যা ১ দ্রষ্টব্য।

সংশোধন পূর্ব্বক পরমাত্ম-ভাব দ্বারা পূর্ণ করিয়াছেন। জীবেতে বৈরাগ্যের অধিকার আছে বলিয়া জীবের সংসার, দেহ, সুখ, দুঃখ, পুণ্য পাপাদির অভিমান পরিত্যাগের ব্যবস্থা। ফলতঃ সৌভাগ্যবান পুরুষের সম্মুখে এমন এক শুভক্ষণ আসিয়া উপস্থিত হয় যখন তিনি প্রিয়তম ব্রহ্মের জন্য সমস্তই ত্যাগ করিতে পারেন। তখন তিনি ব্রহ্মকে প্রাপ্ত হইয়া আপনার অতি স্নেহের সামগ্রী যে দেহ, দারা, পুত্র, সম্পত্তি এবং আপনার চিরপ্রার্থনীয় যে স্বর্গাদি ভোগ সে সমস্তকে অকিঞ্চিৎকর বলিয়া জানেন। তখন সাংসারিক বাধা ও আবরণের অভাব হেতু জীব ব্রহ্মকেই স্বীয় সম্পৎরূপে লাভ করেন। সংসার-অবস্থায় জীবাত্মা যেমন প্রকৃতির ধাতু দ্বারা সংরচিত হইয়া যান, সেইরূপ পারমার্থিক অবস্থায় তিনি পরমাত্ম-ধাতু দ্বারা পুষ্ট হন। "ব্রহ্মবিৎ ব্রহ্মৈব ভবতি" প্রভৃতি শ্রুতিবাক্যের এই অর্থ। নতুবা জীব কখন সাক্ষাৎ ব্রহ্ম হন না। জীবাত্মা কখন পরমাত্মা নহেন। সাংসারিক আমি জগৎপতি নহি। অথচ জীবের সংসারিভিমানও চিরস্থায়ী নহে। এবং অন্তে ব্রহ্মাত্মভাব রূপ মোক্ষ লাভ হইবেই হইবে। বেদান্ত শাস্ত্র হইতে মোক্ষের অভিন্নরূপ, আত্মার আলোক ও আধার-আত্মাস্বরূপ সাক্ষাৎ ব্রহ্মোপলব্ধির এই প্রকার উপদেশ পাওয়া যায়।

বেদান্তের মোক্ষস্বরূপ সাক্ষাৎ ব্রহ্মপরতা ও ব্রহ্মের শাস্ত্রপ্রমাণসিদ্ধতা বিষয়ে ইতিপূর্ব্বে শঙ্করাচার্য্যের অভিপ্রায় সকল বলা গিয়াছে। এবং জীবের ব্রহ্মাত্মস্বরূপ মোক্ষাবস্থার তাৎপর্য্য কি তাহাও উপরে বলা গেল। সম্প্রতি এই সকল সিদ্ধান্তের প্রতি কর্ম্মী প্রভৃতি বাদীগণের যে সকল আপত্তি আছে তাহার বিচারে প্রবৃত্ত হওয়া যাইতেছে। পূজ্যপাদ শঙ্করাচার্য্য পূর্ব্বপক্ষ রূপে সেই সকল আপত্তির উল্লেখ পূর্ব্বক তাহার মীমাংসা করিয়াছেন, আমরা

এস্থলে তাহার কতিপয়ের বিচার প্রদর্শন করিয়া উপস্থিতে "তত্তু সমন্বয়াৎ" সূত্রের ব্যাখ্যা সমাপ্ত করিব।

৫৭। বেদান্তের মোক্ষস্বরূপ সাক্ষাৎ ব্রহ্মপরতা ও ব্রহ্মের শাস্ত্রপ্রমাণসিদ্ধতার প্রতি কর্ম্মীর আপত্তি এই।

'যদ্যপি শাস্ত্রপ্রমাণকং ব্রহ্ম তথাপি প্রতিপত্তিবিধি-বিষয়তয়ৈব শাস্ত্রেণ ব্রহ্ম সমর্পতে'

যদিও ব্রহ্ম শাস্ত্রসিদ্ধ; তথাপি কেবল এই তাৎপর্য্যে শাস্ত্রসিদ্ধ যে তিনি কেবল প্রতিপত্তি-বিধির বিষয় অর্থাৎ বেদ-বিহিত ক্রিয়ার অঙ্গ। বেদে তিনি সেইরূপেই গৃহীত হইয়াছেন। অতএব বেদান্ত বাক্য সকল তাঁহাকে বিধি-বিরোধী জ্ঞানস্বরূপ প্রসিদ্ধ পরমাত্মা বলিয়া প্রমাণ করে না।

"যথা স্বর্গাদিকামস্য অগ্নিহোত্রাদিসাধনং বিধীয়তে এবমমৃতত্বকামস্য ব্রহ্মজ্ঞানং বিধীয়তে।"

যেমন স্বর্গাদিকামীর পক্ষে অগ্নিহোত্রাদি ক্রিয়া-সাধনের বিধি, সেইরূপ অমৃতত্ব-ভোগরূপ মোক্ষকামীর প্রতি ব্রহ্মজ্ঞান-সাধনের বিধি, এস্থলে মনে রাখিতে হইবে যে কর্ম্মী ব্রহ্মজ্ঞানকে একপ্রকার ক্রিয়ারূপেই নির্দ্দেশ করিতেছেন। আর, তাঁহার উল্লেখিত মোক্ষ স্বর্গ-ফল হইতে কিঞ্চিদধিক অলৌকিক ভোগ্য ফল মাত্র। সুতরাং কর্ম্মী কহিতেছেন যে,

"কার্য্যবিধিপ্রযুক্তস্যৈব ব্রহ্মণঃ প্রতিপাদ্যমানত্বাৎ"

কেবল ক্রিয়াবিধির অনুরোধেই ব্রহ্মের প্রতিপাদন। সেই ক্রিয়াবিধি তাঁহাকে কেবল অলৌকিক ও অদৃষ্ট ভোগ্য ফলস্বরূপে নির্দ্দেশ করে, জ্ঞানস্বরূপে নহে। তোমরা বেদান্ত দ্বারা যেরূপ জ্ঞান-স্বরূপ আত্মপ্রত্যয়সিদ্ধ, সাক্ষাৎ ও প্রসিদ্ধ ব্রহ্মকে প্রমাণ করিতে চাহ তাহা অসম্ভব। বৈদান্তিক জিজ্ঞাস্য ও ফলকে জ্ঞানস্বরূপ ব্রহ্ম ও সাক্ষাৎ মোক্ষরূপে গ্রহণ পূর্ব্বক তাহার সহিত কর্ম্মকাণ্ডীয়

জিজ্ঞাস্য ধর্ম্ম ও স্বর্গাদি ভোগ্য ফলের যে ভেদ স্থাপন করিতে চাহ তাহাও সম্ভব নহে। কেননা শাস্ত্রে কর্ম্মকাণ্ড ভিন্ন আর কিছু নাই। যাগ যজ্ঞ ব্রত অনসন প্রভৃতিও কর্ম্মকাণ্ড, ব্রহ্মজ্ঞানের আবৃত্তি ও মোক্ষসাধনও কর্ম্মকাণ্ড। তোমরা যাহাকে জ্ঞান বলিতেছ তাহা মানসিক ক্রিয়ামাত্র। ক্রিয়ানুপ্রবেশ ব্যতীত জ্ঞান পুরুষার্থসাধক নহে।

"আত্মা বা অরে দ্রষ্টব্যঃ শ্রোতব্যোমন্তব্যোনিদিধ্যাসিতব্যঃ"

পরমাত্মার দর্শন শ্রবণ মনন ও নিদিধ্যাসন করিবেক; "আত্মানমেবলোকমুপাসীত" পরমাত্মাকেই উপাসনা করিবেক; "তপসা ব্রহ্ম বিজিজ্ঞাসস্ব" তপস্যা দ্বারা ব্রহ্মকে জানিতে ইচ্ছা কর; "ব্রহ্মবিদাপ্নোতি পরম্" ব্রহ্মজ্ঞানী ব্রহ্মকে প্রাপ্ত হয়েন। এই সমস্ত প্রকার শ্রবণ, মনন, নিদিধ্যাসন, উপাসনা, তপস্যা, ও ব্রহ্মজ্ঞান কেবল যমনিয়মাদিবিশিষ্ট মানসিক ক্রিয়ামাত্র। যথা পরব্রহ্মের বিশেষ জ্ঞানলাভার্থে আচার্য্যসন্নিধানে শিষ্য গমন করিবেন। তথা শান্ত শমান্বিতচিত্ত হইয়া বিধি অনুসারে উপদেশ গ্রহণ করিবেন। প্রথমে ব্রহ্ম জিজ্ঞাসা, পরে ব্রহ্ম-স্বরূপের শ্রবণ, পরে মনন এবং পশ্চাৎ নিদিধ্যাসন করিবেক। এ সমস্ত ক্রমবিহিত ক্রিয়ামাত্র। এতাবতা বেদান্ত বাক্য সকল বিধিকাণ্ডের অন্তর্গত হইল। এই সকল বিধি অনুসারে ব্রহ্মের উপাসনা করিলে শাস্ত্রোক্ত অদৃষ্ট ফল-স্বরূপ মুক্তি হয়।

কর্ম্মীর আর এক আপত্তি এই যে

"কর্ত্তব্যবিধ্যনন্প্রবেশে তু বস্তুমাত্রকথনে হানোপাদানাসম্ভবাৎ বেদান্তবাক্যানামনর্থক্যমেব স্যাৎ।"

যদি বেদান্ত বাক্য সকলকে ক্রিয়াসাধনপর বিধিবাক্যের অন্তর্গত না বল তবে তৎপ্রতিপাদ্য ব্রহ্ম শব্দটি কেবল নিষ্ফল বস্তুজ্ঞাপক শব্দমাত্র হইবে। তাদৃশ বস্তুমাত্র কথনে কোন হেয়োপা-

দেয় না থাকায় বেদান্তবাক্য সকলের কোন অর্থই থাকিবে না। সেরূপ বস্তুমাত্রের শ্রবণ মনন বা জ্ঞানে কোন ফল নাই। তৎ-শ্রবণে সংসারভয় নিবারণ হয় এই যে এক উক্তি তাহা ভ্রম। কেননা ব্রহ্মস্বরূপ যাঁহারা শ্রবণ করিয়াছেন তাঁহাদের সকলেরই পূর্ব্ববৎ সুখ দুঃখাদি সংসার-ধর্ম্ম দৃষ্ট হইতেছে। অতএব শ্রবণ মনন নিদি-ধ্যাসন রূপ যে কর্ম্মাঙ্গ-বিধি ব্রহ্মকে তাহারি বিষয়রূপে শাস্ত্র-প্রমাণ-সিদ্ধ বলা উচিত।

৫৮। উপরি উক্ত আপত্তি সমূহের উত্তর এই—

"কর্ম্মব্রহ্মবিদ্যাফলযোর্ব্বৈলক্ষণ্যাৎ।"

কর্ম্ম ও ব্রহ্মবিদ্যা উভয়ের ফলের প্রভেদ আছে। এজন্য উক্ত আপত্তি সমুহ অমূলক। কর্ম্মকাণ্ডের মধ্যে যাগযজ্ঞ দেবোপাসনা ব্রহ্মোপাসনা প্রভৃতি যাহা কিছু গ্রহণ করিবে তাহারই ফল শরীর ইন্দ্রিয় ও মন দ্বারা ভোগ্য। ইষ্টাপূর্ত্ত কর্ম্মের ফলে দক্ষিণ মার্গে স্থিত পিতৃস্বর্গেই গতি হউক এবং যজ্ঞ ও উপাসনার ফলে উত্তর মার্গে স্থিত দেবস্বর্গে বা অমৃতাখ্য ব্রহ্মালোকেই গতি হউক কোথাও অক্ষয় ও অনন্ত সুখের প্রত্যাশা নাই। সেই সমস্ত লোক প্রাকৃতিক উপা-দানে বিরচিত। তথায় যে সমস্ত প্রকারের আনন্দ পাওয়া যায় তাহা প্রকৃতিরই পরিণাম। পার্থিব সুখ প্রকৃতির নিকৃষ্ট পরিণাম, আর স্বর্গসুখ উৎকৃষ্ট পরিণাম এই প্রভেদ। এমন কি, ব্রহ্মালোকের ভোগ্য যে অণিমা লঘিমা মহিমা প্রভৃতি সূক্ষ্মতম ঐশ্বর্য্য তাহাও প্রকৃতির অত্যন্ত বিশুদ্ধ পরিণাম-বিশেষ। এই সমস্ত সুখের যে ভোগ-কর্ত্তৃত্ব তাহাও প্রকৃতির পরিণাম। শরীর, ইন্দ্রিয়, বাক্য, মন, বুদ্ধি প্রভৃতি স্থূল সূক্ষ্ম দেহ দ্বারা যে কৃত ধর্ম্মকর্ম্ম ঐ সকল সুখ তাহারই ফল। জীব তাহা শরীর ইন্দ্রিয় বাক্য মন বুদ্ধি প্রভৃতি দ্বারাই ভোগ করিয়া থাকেন। স্বর্গলোকে সে সমস্ত শরীরাদির অভাব হয় না। জীবের স্থূল শরীর, এবং ইন্দ্রিয়, প্রাণ, মন, বুদ্ধির সমষ্টি সূক্ষ্ম শরীর এ

সমস্তই প্রকৃতির পরিণাম। সুতরাং স্বর্গাদি ভোগরাজ্যে প্রকৃতিই উপাদান। ভোগকরণ, ভোগায়তন, ভোগস্থান এবং ভোগোপকরণ সমস্তই প্রাকৃতিক। কিন্তু প্রকৃতি পরিবর্ত্তনীয়া, ক্ষয়শীলা ও চঞ্চলা। সে জন্য ভোগকরণরূপ ইন্দ্রিয় মনাদি, ভোগায়তনরূপ শরীর, ভোগ-স্থানরূপ স্বর্গাদি এবং ভোগোপকরণরূপ স্বর্গীয় সুখাদি এ সমস্তই অনিত্য। অধর্ম্ম জন্য যে দুঃখাদি-ভোগ তাহাও ঐরূপ প্রাকৃতিক ব্যাপার।

"শারীরং বাচিকং মানসঞ্চ কর্ম্ম শ্রুতিস্মৃতিপ্রসিদ্ধং ধর্ম্মাখ্যং যদ্বিষয়া জিজ্ঞাসা অথাতোধর্ম্মজিজ্ঞাসেতি সূত্রিতা।"

শ্রুতি-স্মৃতি-প্রসিদ্ধ যে শারীরিক, বাচনিক, ও মানসিক ধর্ম্মকর্ম্ম তদ্বিষয়ক জিজ্ঞাসা ধর্ম্মমীমাংসায় সূত্রিত হইয়াছে। "অধর্ম্মোপি হিংসাদিঃ" উক্ত বিচার-শাস্ত্রে হিংসাদি অধর্ম্মও পরিত্যজ্যরূপে ব্যবস্থিত হইয়াছে।

"তয়োশ্চোদনালক্ষণয়োরর্থানর্থয়োর্ধর্ম্মাধর্ম্ময়োঃ ফলে প্রত্যক্ষসুখদুঃখে শরীর-বাঙ্মনোভিরেবোপভুজ্যমানে বিষয়েন্দ্রিয়সংযোগজন্যে ব্রহ্মাদিষু স্থাবরান্তরেষু প্রসিদ্ধে। মনুষ্যত্বাদারভ্য ব্রহ্মান্তেষু দেহবৎসু সুখতারতম্যমনুশ্রূয়তে।"

সেই অর্থ-অনর্থ-রূপ ধর্ম্ম ও অধর্ম্মের প্রত্যক্ষ ফল সুখ দুঃখ। তাহা ব্রহ্মাদি স্থাবরান্তে সর্ব্বত্রে বিষয় ও ইন্দ্রিয়-সংযোগ বশতঃ শরীর বাক্য মন দ্বারা উপভোগ হইয়া থাকে। ইহা প্রসিদ্ধ। শ্রুতি আছে—

"সএকোমানুষ আনন্দঃ" (তৈঃ ব্রঃ বঃ ৮।২)

এই মর্ত্ত্যপুরী একগুণ আনন্দ-স্থান। স্বর্গাদিতে তাহারই গুণা-ধিক্য। মনুষ্যলোক হইতে আরম্ভ করিয়া ব্রহ্মলোক পর্য্যন্ত দেহী-দিগের সুখের তারতম্য শ্রুত আছে। ব্রহ্মলোকবাসী হইলেও শরীর-বীজের ধ্বংস হয় না। অনাদি কামকর্ম্মলক্ষণা প্রকৃতি বা মায়াই শরীর-বীজ বা কারণ-দেহ। মনপ্রধান সূক্ষ্ম-দেহ সেই

বীজের গর্ভাঙ্কুর। স্থূল দেহ তাহার ব্যক্ত পরিণাম। কেবল ব্রহ্ম-জ্ঞান দ্বারা এই ত্রিবিধ দেহের অভিমান নিবৃত্ত হইতে পারে। নতুবা, তদভিমান সত্ত্বে কামনা, বাসনা, সুখ, দুঃখ নিবৃত্ত হয় না। তৎসত্ত্বে মোক্ষরূপ ব্রহ্মানন্দ লাভ সম্ভবে না। কিন্তু পূর্ব্বমীমাংসার বিচারিত ও ব্যবস্থাপিত কর্ম্মকাণ্ডের ফলভোগ তাহার বিপরীত। তাহাতে শরীর, বাক্য, মন ও স্বর্গাদি লোকের প্রাদুর্ভাব। তৎ-সমস্ত অক্ষয়ও নহে। সুতরাং ব্রহ্মজ্ঞান ও কর্ম্মকাণ্ডের ফল এক ধাতুর নহে। বিশেষতঃ শ্রুতিতে দৃষ্ট হইতেছে যে—

"ন হ বৈ সশরীরস্য সতঃ প্রিয়াপ্রিয়য়োরপহতিরস্তি"

যিনি শরীর-বিশিষ্ট অর্থাৎ স্থূল, সূক্ষ্ম, বা কারণ কোনরূপ শরী-রের সহিত যিনি বর্ত্তমান তাঁহার ইহ বা পরলোকে কোথাও প্রিয় বা অপ্রিয়-ভোগের নিবৃত্তি হয় না। কর্ম্মকাণ্ডের ব্যবস্থাপিত ফল ও গতি এইরূপ প্রিয়াপ্রিয়-সম্বন্ধ-যুক্ত। কিন্তু জ্ঞানকাণ্ডের জিজ্ঞাস্য, ফল, পরমগতি, পরমলোকস্বরূপ যে ব্রহ্ম তিনি অশরীরী। সর্ব্বপ্রকার দেহ-সম্বন্ধশূন্য হইলেই জীবের সেই মোক্ষরূপ ব্রহ্ম-প্রাপ্তি হয়। সেই রত্নকল্প মোক্ষরাজ্যে ব্রহ্মের ন্যায় জীবের বিদেহ ভাব উদিত হয়। তদবস্থায় শরীর-নিবন্ধন প্রিয় বা অপ্রিয় তিষ্ঠিতে পারে না। তিনি নিস্তরঙ্গ অশরীরী ব্রহ্মকে লাভ করেন। সেই ব্রহ্ম শরীরের ধর্ম্ম প্রিয় এবং অপ্রিয় কর্ত্তৃক স্পৃশ্য নহেন।

"অশরীরং বাব সন্তং ন প্রিয়াপ্রিয়ে স্পৃশতঃ।"

অশরীর হইলে আর প্রিয়, অপ্রিয় স্পর্শ করিতে পারে না। এতাদৃশ অশরীর রূপ মোক্ষ বা অশরীরী ব্রহ্ম লাভার্থে শরীর দ্বারা ভোগ্য-স্বর্গাদি-ফল-প্রদ ধর্ম্মক্রিয়ার সাধন অপেক্ষিত নহে। তাদৃশ কোন প্রকার ক্রিয়ার ফলে তাঁহাকে পাওয়া যায় এমন মনে করাও কর্ত্তব্য নহে। কেন না ক্রিয়া সমস্ত বিধির অধীন। তাহাতে জীবের স্বাধীনতা নাই। তাহা বন্ধন মাত্র। যাহা বন্ধন, যাহা

দাসত্ব তাহা কখন মোক্ষপ্রদ ব্রহ্মপদ হইতে পারে না। যাহা বেদ; যাগ, পুরোহিত এবং অলৌকিক ফল হইতে মুক্ত এবং কেবল মাত্র জ্ঞানস্বরূপ তাহাই মুক্তি। তাহাকে যদি কর্ম্মদ্বারা সাধ্য পদার্থ বল তবে শরীর ইন্দ্রিয় মনাদির আবির্ভাব ও প্রিয়াপ্রিয়সম্ভোগ নিরস্ত হইবে না। নিরস্ত না হইলেই মোক্ষ অন্যান্য ভোগের ন্যায় ক্ষয়শীল হইবে। কিন্তু সর্ব্বশাস্ত্রের সিদ্ধান্ত এই যে মোক্ষ অক্ষয়। শ্রুতি

"অন্যত্র ধর্ম্মাদন্যত্রাধর্ম্মাৎ অন্যত্রাস্মৎকৃতাকৃতাদন্যত্র ভূতাচ্চ ভব্যাচ্চ।"

ব্রহ্ম মোক্ষের অভিন্ন স্বরূপ। তিনি ধর্ম্মাধর্ম্ম হইতে পৃথক্, কার্য্য-কারণ-স্বরূপিণী প্রকৃতি হইতে পৃথক এবং কালত্রয়ের অতীত। তিনি কেবল মাত্র জ্ঞান-স্বরূপ পরমাত্মা।

৫৯। এই জ্ঞান-স্বরূপ পরমাত্মা এবং মোক্ষরূপ অশরীরত্ব বিকার্য্য, সম্পাদ্য বা সংস্কার্য্য নহেন। সাংখ্য শাস্ত্রোক্ত সত্ত্বাদি গুণ সকল যে প্রকার পরিণামী অথচ নিত্য, অর্থাৎ পরিণত ও বিকৃত হইলেও সে গুণ-সকলের অস্তিত্ব নষ্ট হয় না; পরমাত্মা ও মোক্ষ সেরূপ বিকারী-নিত্য নহেন। কিন্তু অপরিণামী কূটস্থ-নিত্য, ব্যোমবৎ-সর্ব্বব্যাপী, নিরবয়ব, ও জ্যোতিঃস্বভাব। পরমাত্মা স্বয়ম্প্রকাশ এবং আত্মা বা মোক্ষরূপে সকলেরই অন্তরে স্থিতি করেন। সুতরাং আত্মদৃষ্টি ব্যতীত অন্য কোন কার্য্য, কোন সাধন, বা কোন প্রকার উপাসনা দ্বারা তিনি আহার্য্য উৎপাদ্য বা সম্পাদ্য নহেন। যাহা অলৌকিক তাহাই সাধনা দ্বারা সম্পাদ্য হইতে পারে, কিন্তু যাহা স্বপ্রকাশ প্রসিদ্ধ ও আত্মপ্রত্যয়সিদ্ধ তাহা কখনও সম্পাদ্য বা কর্ম্মের ফল হইতে পারে না। যাহারা ব্রহ্মাত্মভাবরূপ মোক্ষের মর্ম্ম না বুঝিয়া মোক্ষকে জন্য, বিকার্য্য বা স্বর্গীয় সম্পৎরূপ বলিয়া ভাবে তাহারাই তাহাকে কায়িক বাচিক বা মানসিক কার্য্যের ফল বলে। কিন্তু ইহা নিশ্চয় যে তাহা হইলে মোক্ষ অনিত্য হইবে। যোগ,

যাগ, তপস্যা প্রভৃতি কোন ক্রিয়া দ্বারা মোক্ষরূপ সাক্ষাৎ ব্রহ্মজ্ঞান লাভ হয় না। বরং সে সমস্ত মোক্ষের প্রতিবন্ধক। এই সমস্ত প্রতিবন্ধক-নিবৃত্তি এবং অন্তর্দৃষ্টিই ব্রহ্মসাক্ষাৎকারের হেতু। ব্রহ্মজ্ঞান বা ব্রহ্মদর্শন অনন্তলোকজয়ের ন্যায় কোন ফল নহে। ইহা জীবাত্মা, মন, বা আদিত্যকে ব্রহ্মরূপে দৃষ্টির ন্যায় কোন মিথ্যা অধ্যস্ত, কর্ত্তৃতন্ত্র জ্ঞান নহে। ইহা বায়ু বা প্রাণকে আয়ত্ত করার ন্যায় কোন যোগফল নহে। ইহা যজ্ঞেতে আজ্যাবেক্ষণের ন্যায় কোন ক্রিয়াঙ্গ নহে। ইহা স্বতঃসিদ্ধ। জীবের হৃদয়ে ইহা সদা বর্ত্তমান। বহির্ব্বিষয় হইতে চিত্ত ব্যাবৃত্ত হইলেই উহার প্রকাশ দৃষ্ট হয়। সুতরাং ইহা কোনরূপ সম্পাদ্য জ্ঞান নহে। ইহা সংস্কার্য্যও নহে। কোন স্নানাচমনাদি ক্রিয়া দ্বারা ব্রহ্মজ্ঞানের উন্নতি হয় না। কোনরূপ উপবাসাদি ব্রত দ্বারা, বিবিধ বিজ্ঞান শাস্ত্রের আলোচনা দ্বারা, বহু প্রবচন, বহু শ্রুতি, বহু দর্শন ও মেধা দ্বারা আত্মা বা পরমাত্মার অথবা পরমাত্ম-স্বরূপ মোক্ষের সংস্কার সম্ভবে না। অবিদ্যা-কল্পিত স্থূল সূক্ষ্ম দেহই স্নানাদি দ্বারা সংস্কৃত, চিকিৎসা দ্বারা রোগোন্মুক্ত, ক্রিয়া দ্বারা পবিত্র, বিজ্ঞানাদি দ্বারা মার্জ্জিতবুদ্ধি হইতে পারে। তাহাতে স্থূল-সূক্ষ্ম-দেহাভিমানী জীবেরই আমি পবিত্র, আমি অরোগ, আমি জ্ঞানী বলিয়া অভিমান জন্মিতে পারে। সেই দেহাভিমানী জীবই আমি ফলভোগী বলিয়া অভিমান করেন। প্রত্যুত তাদৃশ জীবেরই ধর্ম্মক্রিয়ার ও বুদ্ধিক্রিয়ার ফলভোগ হইয়া থাকে।

"আত্মেন্দ্রিয়মনোযুক্তভোক্তেত্যাহুর্ম্মনীষিণঃ"

শরীর-ইন্দ্রিয়-মন-বিশিষ্ট যে সংসারী জীবাত্মা তিনিই ভোক্তা, মনীষিরা এই প্রকার বলেন। কিন্তু সেই জীবাত্মার সখা ও অন্তরাত্মা স্বরূপ, মোক্ষের একমাত্র নিকেতন, ব্রহ্মজ্ঞানরূপ পরম জ্যোতির আশ্রয়, পরমাত্মা সে সব কর্ম্মফলের ভোক্তা নহেন।

"তয়োরণ্যঃ পিপ্পলং স্বাদ্বত্ত্যনশ্নন্নন্যোভিচাকশীতি।"

জীবাত্মা ও পরমাত্মা এই উভয়ের মধ্যে কেবল জীবাত্মাই স্বকৃত অনুষ্ঠানের ফলভোগ করেন, পরমাত্মা তাহা ভোগ করেন না, তিনি সাক্ষীমাত্র।

"একোদেবঃ সর্ব্বভূতেষু গূঢ়ঃ সর্ব্বব্যাপী সর্ব্বভূতান্তরাত্মা কর্ম্মাধ্যক্ষঃ সর্ব্বভূতাধিবাসঃ সাক্ষী চেতা কেবলো নির্গুণশ্চ।"

পরমাত্মা একমাত্র সর্ব্বব্যাপি সর্ব্বভূতে অন্তরাত্মা রূপে বর্ত্তমান। তিনি সর্ব্বকর্ম্মের অধ্যক্ষ, সর্ব্বভূতের আশ্রয়, জ্ঞানস্বরূপ, সকলের সাক্ষী, অসঙ্গ এবং সত্ত্ব-রজ-তমোগুণ-রহিত।

"সপর্য্যগাচ্ছুক্রমকায়মব্রণমস্নাবিরং শুদ্ধমপাপবিদ্ধং

তিনি সর্ব্বব্যাপী, নির্ম্মল, নিরবয়ব, শিরা ও ব্রণরহিত, শুদ্ধ, অপাপবিদ্ধ। "ব্রহ্মভাবশ্চ মোক্ষঃ" এই ব্রহ্মভাব লাভের নামই মোক্ষ। এই মোক্ষ এত নির্ম্মল যে কোনরূপ গুণাধান ও দোষাপনয়ন দ্বারা সংস্কৃত হওয়ার অপেক্ষা রাখে না। সুতরাং পরমাত্মা, মোক্ষ, বা ব্রহ্মজ্ঞান সংস্কার্য্য নহেন। স্নান, আচমন, ব্রত, অনসন, জ্ঞান বুদ্ধির আলোচনা, উপাসনা, প্রভৃতি কোনরূপ বাহ্য বা মানসিক ক্রিয়ার দ্বারা তাহার কোনটির সংস্কার করা যায় না।

৬০। জ্ঞান কোন ক্রিয়া নহে। এবং ব্রহ্ম সে ক্রিয়ারও বিষয় নহেন।

"নচ বিদিক্রিয়াকর্ম্মত্বেন কার্য্যানুপ্রবেশোব্রহ্মণঃ।"

জ্ঞানকে যদি একপ্রকার ক্রিয়া বল এবং তদনুসারে যদি ব্রহ্মকে সেই ক্রিয়ার কর্ম্মপদ অর্থাৎ ফলস্বরূপ বল তাহাও যুক্ত হয় না।* কেন না শ্রুতিতে আছে।

"অন্যদেব তদ্বিদিতাদথো অবিদিতাদধি"।

---

* অতিরিক্ত পত্র সংখ্যা ৪ দ্রষ্টব্য।

তিনি বিদিত কি অবিদিত তাবৎ বস্তু হইতে ভিন্ন। সুতরাং জ্ঞানরূপ ক্রিয়ার কর্ম্মরূপে কার্য্যানুপ্রবেশ তাঁহাতে সম্ভবে না।

"যেনেদং সর্ব্বং বিজানাতি তং কেন বিজানীয়াৎ"

যাঁহার দ্বারা সকল পদার্থ প্রকাশ পায় তাঁহাকে কে প্রকাশ করিতে পারে। সূর্য্যকে দীপপ্রভা কখনই প্রকাশ করিতে পারে না। অতএব ব্রহ্মেতে জ্ঞানের কর্ম্মত্ব নিষিদ্ধ হইয়াছে। তিনি উপাসনা রূপ কোন ক্রিয়ারও কর্ম্মপদ নহেন। কেন না তিনি অতি মহৎ এবং স্বয়ম্প্রকাশ। উপাসনা তাঁহাকে কি প্রকারে প্রকাশ করিবে?

"যদ্বাচা নভ্যুদিতং যেন বাগভ্যুদ্যতে তদেব ব্রহ্ম ত্বং বিদ্ধি নেদং যদিদমুপাসতে।"

যিনি বাক্যের বচনীয় নহেন, কিন্তু বাক্য যাঁহার দ্বারা প্রেরিত হয় তাঁহাকেই তুমি ব্রহ্ম বলিয়া জান; লোকে উপাধিভেদে যাঁহার উপাসনা করে তিনি ব্রহ্ম নহেন। প্রকৃত প্রস্তাবে শাস্ত্র, জ্ঞান, উপাসনা ও যম নিয়মাদি কেবল অবিদ্যাকল্পিত ভেদ, মিথ্যা জ্ঞান, অভিমান, এবং আলস্য প্রভৃতির নিবৃত্তি করে, চিত্তশুদ্ধি করিয়া দেয়, এবং সংসারার্ণব মধ্যে জীবন-তরণীর মনোরূপ কর্ণকে ব্রহ্মরূপ কূলের দিকে অভিমুখী করে; কিন্তু সে সমস্ত ব্রহ্মকে বিষয় রূপে প্রতিপন্ন করে না। তিনি সর্ব্বপ্রকার শাস্ত্র, জ্ঞান, উপাসনাদি ক্রিয়ার অবিষয়, স্বয়ংসিদ্ধ, স্বয়ম্প্রকাশ, এবং "একাত্মপ্রত্যয়সারং" একমাত্র আত্মপ্রত্যয়সিদ্ধ।

"যস্যামতং তস্য মতং মতং যস্য ন বেদ সঃ অবিজ্ঞাতং বিজানতাং বিজ্ঞাতমবিজানতাং"।

যাঁহার ইহা নিশ্চয় হইয়াছে যে ব্রহ্মকে জানা যায় না তিনি তাঁহাকে জানিয়াছেন এবং যাঁহার এরূপ নিশ্চয় হইয়াছে যে ব্রহ্মকে আমি জানিয়াছি তিনি তাঁহাকে জানেন নাই। অতএব ব্রহ্ম কোন

জ্ঞানরূপ ক্রিয়ার বিষয় নহেন। ব্রহ্মজ্ঞান ব্রহ্মরূপ পরমবস্তু-তন্ত্র, তাহা জীবকৃত মানসিক ক্রিয়া বা কর্ত্তৃতন্ত্র জ্ঞান নহে।

"ননু জ্ঞানং নাম মানসী ক্রিয়া. ন, বৈলক্ষণ্যাৎ, ক্রিয়া হি নাম সা যত্র বস্তু-স্বরূপনিরপেক্ষ্যৈব চোদ্যতে পুরুষচিত্তব্যাপাবাধীনা চ।"

তথাপি যদি বল ব্রহ্মজ্ঞান জীবকৃত মানসিক ক্রিয়া মাত্র। তাহা যুক্ত নহে। কেন না ক্রিয়ার লক্ষণ ও ব্রহ্মজ্ঞানের লক্ষণ সম্পূর্ণ বিপরীত। বস্তুর স্বরূপ জানিবার অপেক্ষা না করিয়া কোন অলৌকিক ফললাভের নিমিত্তে যে ধ্যান, উপাসনা, সাধনা-রূপ মানস-ব্যাপার তাহার নাম ক্রিয়া। তাহা বিধি বা বাসনা-বিহিত ক্রিয়ামাত্র। তাহা কর্ত্তৃতন্ত্র ও চিত্তব্যাপারাধীন। তাহা করা না করা অথবা এ রূপে বা ও রূপে ভাবা, পুরুষের আয়ত্তাধীন। কিন্তু ব্রহ্মজ্ঞান তাদৃশ লক্ষণ-বিশিষ্ট নহে। তাহা আদৌ কর্ত্তৃতন্ত্রই নহে। কর্ত্তা তাহাকে জন্ম দিতে পারে না, বিধি অনুসারে সহস্র ক্রিয়া করিলেও তাহা উদিত হয় না, বাসনা তাহাকে প্রসব করিতে পারে না এবং সূর্য্য, চন্দ্র, তারা, তড়িৎ তাহা প্রকাশ করিতে পারে না। তাহা কর্ত্তা, করণ, ক্রিয়া ও কর্ম্মপদের অন্তর্গত নহে। তাহা সূর্য্যের ন্যায় স্বতঃসিদ্ধ, স্বয়ম্প্রকাশ। সূর্য্যের প্রকাশ যেমন সূর্য্য-রূপ বস্তুতন্ত্র, মনুষ্যের বুদ্ধি জ্ঞান উপাসনা তাহা প্রকাশ করিতে পারে না, ব্রহ্মজ্ঞান সেইরূপ ব্রহ্মরূপ বস্তুতন্ত্র কিন্তু কদাপি কর্ত্তৃতন্ত্র নহে। তাহাকে করিতে, না করিতে বা অন্যথা করিতে কেহই সমর্থ নহে। পঞ্চাগ্নি বিদ্যা নামে একটি বৈদিক ক্রিয়ার প্রকরণ আছে। তদনুসারে ক্রিয়া করিলে স্বর্গ লাভ হয়। তাহার ব্যবস্থা এই যে দ্যুলোক, পর্জ্জন্য, পৃথিবী, পুরুষ, এবং যোষিৎ এই পঞ্চ পদার্থকে অগ্নি ভাবিয়া পূজা করিতে হয়। সেই অলৌকিক অগ্নি যজমানকে প্রজাকামী পিতৃ-গণের স্বর্গে বহন করে। এস্থলে বেদান্তের বিচার এই যে ঐ সকল পদার্থকে যে অগ্নিবুদ্ধি তাহা কেবল বিধিজন্য এবং মানস ক্রিয়া

মাত্র। তাহা পালন করা না করা পুরুষের ইচ্ছা। কিন্তু অগ্নিতে যে অগ্নি-বুদ্ধি তাহা কল্পনা বা অলৌকিক বিষয়ের ধ্যান নহে। তাহা প্রত্যক্ষ বিষয়। তাহা সিদ্ধবস্তু যে অগ্নি তাহারই অধীন জ্ঞান মাত্র। সে জ্ঞান বিধিজন্য নহে এবং পুরুষের অধীন বা কর্তৃতন্ত্র নহে। তাহা প্রত্যক্ষ বস্তুতন্ত্র জ্ঞান, তাহাকে এরূপে ভাবা বা ওরূপে ভাবা যায় না। ব্রহ্মজ্ঞানও সেইরূপ বস্তুতন্ত্র জ্ঞান মাত্র। তুমি সূর্য্যের উদয়কালীন ছটাকে ব্রহ্মমূর্ত্তি বলিয়া ভাবিতে পার। তাহা হয় বিধিজন্য না হয় তোমার ভাবনা, চিন্তা বা ধ্যানের অধীন। মনেতেও কোন অলৌকিক জ্যোতির ধ্যান পূর্ব্বক সেইটিকে ব্রহ্মজ্যোতি বলিতে পার। তাহা হয় বিধিপালনার্থ না হয় সে তোমার ইচ্ছা। কিন্তু শাস্ত্রের সিদ্ধান্ত এই যে তাহা কল্পিত ও কর্তৃতন্ত্র জ্ঞান মাত্র। ব্রহ্মজ্ঞান সে রূপে জন্মে না, তাহা কেবল ব্রহ্মরূপ পরমবস্তুতন্ত্র। তাহা জ্ঞান, বুদ্ধি, বিদ্যা, ধ্যান, বা ভাবনার বিষয় নহে। তবে যে "আত্মা বা অরে দ্রষ্টব্য ইত্যাদি" শ্রুতি সকল ব্রহ্মকে দর্শন শ্রবণ মননাদি করিবার উপদেশ দিয়াছেন তাহা কেবল মানবকে প্রকৃতি-স্রোত হইতে ব্রহ্মরূপ নিরাপদ ভূমির দিকে অভিমুখ করিবার জন্য। বিশেষতঃ "শ্রবণবৎ অবগত্যর্থত্বান্মননিদিধ্যাসনয়োঃ" মনন ও নিদিধ্যাসন এ উভয়েরই শ্রবণের ন্যায় অবগতি মাত্র অভিপ্রায়, ক্রমবিহিত ক্রিয়া তাহার অভিপ্রায় নহে।

"তস্মান্ন প্রতিপত্তিবিধিশেষতয়া শাস্ত্রপ্রমাণকত্বং ব্রহ্মণঃ সম্ভবতি,"

অতএব কোন প্রকার বিধির অঙ্গরূপে ব্রহ্মকে শাস্ত্রে কহেন নাই, কিন্তু তিনি বেদান্ত বাক্যের সমন্বয় দ্বারা স্বতন্ত্র রূপে অর্থাৎ কেবল মাত্র জ্ঞানস্বরূপে শাস্ত্রসিদ্ধ ইহাই মীমাংসিত হইয়াছে। তাহাই মীমাংসার জন্য মহর্ষি ব্যাস "অথাতোব্রহ্মজিজ্ঞাসা" প্রভৃতি সার্দ্ধ পঞ্চশত সূত্রে গ্রথিত জয়াখ্য উত্তর মীমাংসা প্রণয়ন করিয়াছেন।

যদি ব্রহ্মজিজ্ঞাসা, ব্রহ্মজ্ঞান, ব্রহ্মলাভরূপ মোক্ষ ধর্ম্মক্রিয়ার অন্তর্গত হইত, তাহা হইলে উক্ত মহর্ষি ঐ উত্তর মীমাংসা নামক বেদান্ত-দর্শন প্রকাশ করিতেন না; কেন না তাঁহার পূর্ব্বে মহর্ষি জৈমিনি "অথাতোধর্ম্মজিজ্ঞাসা" অবধি যে পূর্ব্ব মীমাংসা নামক সূত্রসংহিতা প্রচার করিয়া গিয়াছেন তাহা হইতেই অভিলষিত ফল লাভ হইত। আর যদি এমত বল যে জৈমিনি সর্ব্বপ্রকার ধর্ম্মক্রিয়ার বিচার করিয়া গিয়াছেন, কিন্তু ব্রহ্মসাধনরূপ ধর্ম্মক্রিয়া-প্রতিপাদক বিধিবাক্য-সমুহের বিচার করেন নাই বলিয়া ব্যাসদেব বেদান্ত-দর্শনে তাহার সম্পূরণ করিয়াছেন তাহাও সঙ্গত হইবে না। কারণ জৈমিনির বিচারিত ধর্ম্ম এবং ব্যাসের বিচারিত ব্রহ্ম উভয়ই যদি ধর্ম্মক্রিয়ার অন্তর্গত হইত তাহা হইলে ব্যাসদেব "অথাতঃ পরিশিষ্টধর্ম্ম-জিজ্ঞাসা" এই রূপে গ্রন্থারম্ভ করিতেন। কিন্তু পূর্ব্বমীমাংসায় ব্রহ্মস্বরূপের জ্ঞান ও মোক্ষরূপ ব্রহ্মবস্তুর বিচার না থাকায় ব্যাসদেব স্বতন্ত্ররূপে বেদান্তদর্শন প্রকাশ করিয়াছেন। যত দিন পর্য্যন্ত অন্ত-রাত্মা ও মুখ্য আত্মারূপে ব্রহ্ম সাক্ষাৎকার না হন ততদিন পর্য্যন্ত বেদবিধি সকল কার্য্যকারী হইতে পারে কিন্তু অদ্বৈত ব্রহ্মজ্ঞান প্রকাশিত হইলে পর বিধি ও ধর্ম্ম কর্ম্ম সকল মিথ্যা হইয়া যায়। যেমন মলয় মারুত প্রবহমান হইলে তালবৃন্তের প্রয়োজন থাকে না, তদ্বৎ পরব্রহ্মকে দর্শনমাত্রে আর্য্যকুলসেবিত সমস্ত নিয়ম ও বিধি মিথ্যা হইয়া যায়।

৬১। ইতিপূর্ব্বে কর্ম্মীর আর একটী আপত্তির উল্লেখ করা গিয়াছে। যথা ব্রহ্ম শব্দটি কেবল নিষ্ফল বস্তুজ্ঞাপক। তাহার উচ্চারণে কোন ফল নাই। বিশেষতঃ শ্রুতির সে অর্থই নহে।

"প্রবৃত্তিনিবৃত্তিবিধিতচ্ছেষব্যতিরেকেণ কেবল বস্তুবাদী বেদভাগোনাস্তি।"

প্রবৃত্তি-বিধি বা নিবৃত্তি-বিধির অঙ্গ ব্যতিরেকে কেবলমাত্র বস্তুবাদী বেদভাগ নাই। অর্থাৎ বেদে কেবল যাগ যজ্ঞের বিধি ও

তাহার ফলশ্রুতি আছে আর তদ্বিপরীত "ব্রহ্মহত্যা করিবে না" ইত্যাদি নিবৃত্তি-বিধি ও তাদৃশ কর্ম্মের নিন্দাবাদ আছে। তদ্ব্যতীত ব্রহ্মরূপ-বস্তু-জ্ঞাপক শ্রুতি নাই। যেখানে যেখানে ব্রহ্ম শব্দ আছে তাহা ক্রিয়ার ফল-বোধক মাত্র, তদ্ভিন্ন কোন জ্ঞানস্বরূপ পরম বস্তুবোধক নহে। এই আপত্তির প্রতি ব্রহ্মবাদির উত্তর এই যে, বেদে যেমন প্রবৃত্তি নিবৃত্তি বিধি ও ফল-জ্ঞাপক পুষ্পিত বাক্য সকল আছে, সেইরূপ ব্রহ্মরূপ পরম বস্তু-প্রতিপাদক শ্রুতি সমূহও আছে, তাহার অভাব নাই। এই বিবাদের মর্ম্ম এই যে কর্ম্মী কেবল ইহকালে ও পরকালে ভোগার্থ কর্ম্মের ফলকেই শ্রেয়ঃ বলিয়া অভিনন্দন করেন। সমস্ত প্রকার ফলই প্রকৃতির পরিণাম। তদ্ভোগের বাসনা কেবল ভোগ দ্বারাই চরিতার্থ হয়। কোন প্রকার প্রাকৃতিক বা অপ্রাকৃতিক তত্ত্বজ্ঞান লাভ কর্ম্মীর উদ্দেশ্য নহে। কর্ম্মেতে তাদৃশ জ্ঞান-দানের শক্তি নাই। কর্ম্মের ফল কেবল শারীরিক ও মানসিক ভোগ্য মাত্র। তাহাতে প্রজ্ঞা ও আত্মা তৃপ্ত হইতে পারে না। প্রজ্ঞা প্রাকৃতিক তত্ত্বজ্ঞান চাহে, প্রাকৃতিক ভোগ চাহে না; দুগ্ধের যাহা যাহা উপাদান, যাহা যাহা সমবায়ী পদার্থ, যে যে গুণ, আর যে অভিপ্রায়ে তাহা সৃষ্ট হইয়াছে তাহাই জানিতে চাহে, তৎপানে উৎসুক নহে। জীবাত্মা কিন্তু স্বয়ং জ্ঞানস্বরূপ। তিনি শরীর ইন্দ্রিয় মনকে আমি বা আমার বলিয়া যখন অভিমান করেন, তখন প্রাকৃতিক ভোগকে স্বীয় ভোগ্যরূপে স্বীকার ও প্রার্থনা করেন। নতুবা তিনি যখন জানিতে পারেন যে আমি দেহ নহি, প্রাণ নহি, ইন্দ্রিয় নহি, ইন্দ্রিয়গণের নিয়োগকর্ত্তারূপ মনও নহি, তখন কি আর তিনি প্রাকৃতিক ভোগে তৃপ্ত হইতে পারেন? অথবা কেবলমাত্র প্রজ্ঞা-সেব্য প্রাকৃতিক পদার্থের তত্ত্বজ্ঞানকেই পরম পুরুষার্থ বলিয়া গ্রহণ করিতে পারেন? তাদৃশ বিশুদ্ধাবস্থায় জীবাত্মা স্বয়ং যে প্রকার জ্ঞানস্বরূপ বস্তু, সেই প্রকার জ্ঞানের আকর-স্বরূপ পরম

পুরুষরূপ পরম বস্তুর দর্শন প্রার্থনা করেন, প্রার্থনামাত্র স্বীয় হৃদয়-ধামেই তাঁহাকে দেখিতে পান। সেই পরমজ্ঞানে তাঁহার ক্ষুদ্রজ্ঞান অভিষিক্ত হয়। দেহ মনাদির অভিমানী জীব প্রকৃতি বিরচিত বা কর্ম্মজ ফল দেহমনাদি দ্বারা যে প্রকারে ভোগ করেন, বিশুদ্ধ জীবাত্মা সে প্রকারে ব্রহ্মরূপ আনন্দ ভোগ করেন না, কিন্তু জ্ঞানযোগে করিয়া থাকেন। সে ভোগ কেবল জ্ঞানেতেই পরিসমাপ্ত। ক্ষুদ্র ভোগা-কাঙ্ক্ষী দেহ মনাদির তাহাতে অধিকার নাই।

"পরাঞ্চি খানি ব্যতৃণৎ স্বয়ম্ভুস্তস্মাৎ পরাং পশ্যতি নান্তরাত্মন্।"

স্বয়ম্ভু বিষয়-প্রবৃত্ত ইন্দ্রিয় সকলকে হনন করিয়াছেন অর্থাৎ উন্নত জ্ঞানের অধিকার দেন নাই। এই হেতু অনাত্মভূত পদার্থ সমূহের উপলব্ধি ও ভোগাদি হয়। অন্তরাত্মার দর্শন হয় না।

"কশ্চিদ্ধীরঃ প্রত্যগাত্মানমৈক্ষদাবৃত্তচক্ষুরমৃতত্বমিচ্ছন্।"

কোন কোন ধীর ব্যক্তি প্রতিস্রোতে গমনের ন্যায় অশেষ বিষয় হইতে ব্যাবৃত্তচক্ষু হইয়া এবং অমৃতত্ব-রূপ ব্রহ্মপদ ইচ্ছা করিয়া সেই অন্তরাত্মার দর্শন পাইয়াছেন। ব্রাহ্মবাদী কহেন যে বেদে যেখানে যেখানে ব্রহ্মশব্দ আছে তাহা কেবল সেই অন্ত-রাত্মারই জ্ঞাপক। তাহা দেহ, ইন্দ্রিয়, প্রাণ, মন ও বিজ্ঞান-রাজ্যের অতীত, প্রাকৃতিক তত্ত্বজ্ঞানের অতীত, প্রাকৃতিক স্থূল সুক্ষ্ম ভোগের অতীত, যোগবলের অতীত।

৬২। পূজ্যপাদ শঙ্করাচার্য্য কর্ম্মীকে এই বলিয়া পরাস্ত করিয়াছেন যে "ঔপনিষদস্য পুরুষস্যানন্যশেষত্বাৎ" উপনিষৎ-প্রতি-পাদ্য ব্রহ্ম ক্রিয়া প্রভৃতি অন্য কিছুর অঙ্গ নহেন।

"যোসাবুপনিষৎস্বেবাধিগতঃ পুরুষোঽসংসারী ব্রহ্ম" ইত্যাদি।

উপনিষৎ-বেদ্য যে ব্রহ্ম তিনি অসংসারী। তিনি অপরিবর্ত্তনীয়। তিনি সর্ব্বপ্রকার দ্রব্য পদার্থ হইতে বিলক্ষণ। পঞ্চভূত, কাল,

দিক্ এবং অন্তঃকরণ হইতে স্বতন্ত্র। তিনি 'স্বপ্রকরণস্থঃ' স্বয়ংসিদ্ধ এবং 'অনন্যশেষঃ' স্বয়ং সম্পূর্ণ অর্থাৎ ক্রিয়া প্রভৃতি তাঁহার সম্পূরক নহে। তিনি নাই একথা বলা অসম্ভব। কেননা তিনি অন্তরাত্মা রূপে সকলের মুখ্য আত্মা। তাঁহার অধিষ্ঠানে আত্মবোধ প্রকাশ পাইতেছে। তিনি নাই বলিলে আত্মা থাকে না। সুতরাং আত্মার আত্মারূপ পরম বস্তু যে ব্রহ্ম তাঁহাকে অস্বীকার করা অসম্ভব। যদি বল সেই পরমাত্মা অহংজ্ঞানের বিষয়, অহংজ্ঞান তাঁহাকে আমি রূপে প্রকাশ করিতেছে। সুতরাং তিনি কিরূপে কেবল উপনিষদের অর্থাৎ জ্ঞানকাণ্ডের প্রতিপাদ্য হইবেন? অহংজ্ঞানের কর্ত্তা ও কর্ম্মফলভোক্তা-রূপে তিনি কেন কর্ম্মকাণ্ডেরও প্রতিপাদ্য হউন না? ইহার উত্তর এই যে এরূপ আপত্তি যুক্তি-যুক্ত নহে। পরমাত্মা অহংজ্ঞানের বিষয় বা কর্ত্তা বা অহং ইত্যাকার অভিমান বশতঃ কর্ম্মফলের ভোক্তা রূপে কথিত হন নাই। তিনি উপনিষদে "দ্বা সুপর্ণা" প্রভৃতি শ্রুতিতে কেবল অহংজ্ঞানের কর্ত্তা ও স্বকৃত কর্ম্মের ভোক্তাস্বরূপ জীবাত্মার সাক্ষীরূপে কথিত হইয়াছেন। অতএব অহংজ্ঞানের যিনি কর্ত্তা বা বিষয় তাঁহা হইতে সাক্ষী স্বরূপ পরমাত্মা পৃথক্।

"নহি অহংপ্রত্যয়বিষয়কর্ত্তৃব্যতিরেকে পুরুষোবিধিকাণ্ডে তর্কসময়ে বা কেনচিদাঃ সর্ব্বভূতস্থএকঃ সমঃ কূটস্থনিত্যঃ স্যাত্মা।"

কর্ম্মকাণ্ডে জীবাত্মাকেই কর্ত্তা ভোক্তা বলিয়া নির্দ্দেশ করেন। তাহাতে তদীয় স্বাক্ষীস্বরূপ, সর্ব্বভূতস্থ, এক, সর্ব্বত্রসমান, কূটস্থ নিত্য পুরুষকে নির্দ্দেশ করেন না। অনুমানবাদী নৈয়ায়িকদিগের তর্কসময়েও তিনি তর্কের প্রাপনীয়রূপে প্রকাশ পান না। তিনি সকলের আত্মা। সুতরাং কেহ তাঁহাকে অস্বীকার করিতে পারে না। কেহ তাঁহাকে ক্রিয়া বা তর্কের বিষয়রূপে গ্রহণ করিতে পারে না। তিনি স্বয়ংসিদ্ধ। যে বলিবে তিনি নাই, তিনি তাহারই

অন্তরাত্মা। তাঁহাকে ত্যাগ বা আহরণ করা সম্ভবে না। কেননা তিনি পরমাত্মা রূপে বিরাজিত আছেনই।

"সর্ব্বংহি বিনশ্যদ্বিকারজাতং পুরুষান্তং বিনশ্যতি পুরুষোহি বিনাশহেত্বভাবাদ-বিনাশী বিক্রিয়াহেত্বভাবাচ্চ কূটস্থনিত্যঃ, অতএব নিত্যশুদ্ধমুক্তস্বভাবঃ। তস্মাৎ পুরুষান্ন পরং কিঞ্চিৎ সা কাষ্ঠা সা পরা গতিঃ"

সর্ব্বপদার্থই প্রকৃতির পরিণাম। তৎসমস্তই বিনাশশীল। তাহারা সমুদায়ই বিনাশ পাইবে। অথবা প্রবাহরূপে জন্মমৃত্যুর অধীন হইবে। কিন্তু পরম পুরুষ স্বরূপ পরমাত্মা অবিনাশী। কারণ তাঁহাতে বিনাশের কোন কারণ বিদ্যমান নাই। তিনি একরূপে সদা স্থিত, কেননা তাঁহাতে পরিবর্ত্তনেরও কোন হেতু বর্ত্তমান নাই। অতএব তিনি কূটস্থ নিত্য। অন্যান্য পদার্থের ন্যায় বিনাশশীল বা পরিণামী নিত্য নহেন। তিনি নিত্য শুদ্ধবুদ্ধমুক্তস্বভাব। এতাবতা সেই পুরুষ হইতে কিছুই শ্রেষ্ঠ নাই। তিনিই পর্য্যবসান এবং

"গন্তৄণাং সর্ব্বগতিমতাং সংসারিণাং সা পরা প্রকৃষ্টা গতিঃ।"

গন্তৃদিগের অর্থাৎ সংসারিদিগের সম্বন্ধে তিনিই পরম গতি। তাঁহার ঊর্দ্ধে আর গতি নাই।

"'তন্তৌপনিষদং পুরুষং পৃচ্ছ- তত্ত্বজ্ঞানে নিষদত্ববিশেষণং পুরুষস্যোপনিষৎস্বেব প্রাধান্যেন প্রকাশমানত্বাদুপপদ্যতে অতঃ"

'সেই উপনিষৎ-প্রতিপাদ্য পুরুষকে জানিতে ইচ্ছা করি' এই যে বেদবাণি, ইহা সেই পুরুষকে প্রাধান্য রূপে উপনিষদেরই অর্থাৎ জ্ঞানকাণ্ডেরই প্রতিপাদ্য বলিয়া প্রকাশ করিতেছে। তিনি কর্ম্মকাণ্ডের প্রতিপাদ্য হইতে পারেন না এবং কোন কর্ম্মাঙ্গরূপেও উপনিষদে প্রতিপাদিত হন নাই। তিনি উপনিষৎরূপ জ্ঞানকাণ্ডীয় বেদ-ভাগে সর্ব্বত্রই ভূতপুঞ্জক্তি, দিক্, কাল, কর্ত্তৃ, ভোক্তৃ, জীবাত্মা ও সর্ব্বসংসারের অতীত পুরুষ ও সাক্ষীরূপে কথিত হইয়াছেন।

"অতোবস্তুপরোবেদভাগোনাস্তীতি বচনং সাহসমাত্রং।

অতএব ক্রিয়াবিধির অঙ্গ ব্যতীত বস্তুপর বেদভাগ নাই একথা বলা সাহস মাত্র।

৬৩। কর্ম্মকাণ্ডীয় বেদভাগের মীমাংসকেরা যে কহেন "তস্যার্থঃ কর্ম্মাববোধনং" বেদের অর্থ কর্ম্মজ্ঞান মাত্র, একথা কেবল কর্ম্মীদিগেরই অধিকার-দৃষ্টিতে উক্ত হইয়াছে।

"তৎ ধর্ম্মজিজ্ঞাসাবিষয়ত্বাদ্বিধিপ্রতিষেধশাস্ত্রাভিপ্রায়ং দ্রষ্টব্যং"।

তাহা কেবল ধর্ম্ম-জিজ্ঞাসারই অন্তর্গত। অতএব শাস্ত্রের যে সমস্ত প্রবর্ত্তক বিধি ও নিবর্ত্তক বিধি আছে তাহাতেই তাদৃশ বাক্যের উদ্দেশ্য। কেবল সেই অধিকার পক্ষে উহা অভিপ্রেত হইয়াছে ইহা বুঝিতে হইবে। নতুবা "প্রবর্ত্তক বিধি ও নিবর্ত্তক বিধি মাত্রই বেদে আছে," আর "কেবল সেই জন্যই বেদের প্রামাণ্য" এবং "ক্রিয়াসম্বন্ধ শূন্য করিলে বেদের প্রামাণ্য থাকে না" এরূপ স্বীকার করিলে বেদের অনেক উপদেশের আনর্থক্য উপস্থিত হইবে। কেন না ক্রিয়ার সঙ্গে বিন্দুমাত্র সংশ্রব না রাখিয়া বেদ অনেক স্থলে অনেক বস্তুর উপদেশ করেন। যথা প্রাণ, মন, ইন্দ্রিয়, আকাশ, বায়ু, জ্যোতি, জল, পৃথিবী, চন্দ্র, পর্জ্জন্য, ওষধি, বনস্পতি, স্ত্রী, পুরুষ ইত্যাদি। এতাবতা

"প্রবৃত্তিনিবৃত্তিব্যতিরেকেণ ভূতঞ্চেৎ বস্তূপদিশতি ভব্যার্থত্বেন কূটস্থং নিত্যং ভূতং নোপদিশতীতি কোহেতুঃ? নহি ভূতমুপদিশ্যমানং ক্রিয়া ভবতি।"

প্রবৃত্তি নিবৃত্তি ব্যতিরেকে যদি ঐরূপ ভূত পদার্থের উপদেশ করা কর্ত্তব্য হয়, তবে নিত্য ভূত বস্তু যে কূটস্থ, সর্ব্বভূতস্থ আত্মা তাঁহার উপদেশ বেদে কেন না থাকিবে? ভূত বস্তুর উপদেশের নাম ক্রিয়া হইতে পারে না। যাঁহা হইতে এই অনিত্য ও পরিবর্ত্তনশীল ভূত সকল উৎপন্ন হয়, উৎপন্ন হইয়া যাঁহার দ্বারা

জীবিত রহে এবং প্রলয়কালে যাঁহাতে প্রবেশ করে, তিনি ব্রহ্ম। তিনি আনন্দস্বরূপ। তিনি সর্ব্বকালে সমান এবং স্বয়ং প্রকাশমান। অন্যান্য সমস্ত বস্তু তাঁহাতে আশ্রিত। সমস্ত চেতন পদার্থদিগের তিনি চিৎস্বরূপ। সেই চিৎ-স্বরূপ সদ্‌বস্তু কাহারও আশ্রিত, কোন সাধনের ফল, বা অন্য কোন পদার্থের প্রকাশিত নহেন। শঙ্করাচার্য্য আত্মানাত্মবিবেকে কহিয়াছেন,

"চিদ্রূপত্বং নাম সাধনান্তরনিরপেক্ষতয়া স্বয়ং প্রকাশমানং স্বস্মিন্নারোপিতসর্ব্বপদার্থাবভাষকবস্তুত্বং চিদ্রূপত্বমিত্যুচ্যতে।"

অন্য সাধনের অপেক্ষা না করিয়া আপন হইতেই প্রকাশমান আপনাতে আরোপিত সর্ব্বপদার্থের প্রকাশক যে বস্তুধর্ম্ম তাহার নাম চিদ্রূপত্ব। (রা, মো, রা)। জীব মিথ্যাজ্ঞানে আবৃত আছেন। সেই পরমবস্তুর জ্ঞান দ্বারা জাগ্রত হইলেই সংসার-বন্ধন হইতে মুক্ত হন। বেদে এই প্রয়োজন সিদ্ধির নিমিত্তে সর্ব্ব-বস্তুর অতীত রূপে সেই স্বপ্রকাশ চিদ্রূপ প্রেমস্বরূপ অন্তরাত্মাস্বরূপ পরমবস্তুর উপদেশ দিয়াছেন। তাঁহাতে বস্তুধর্ম্মত্ব ব্যতীত কিছু মাত্র ক্রিয়াধর্ম্মত্ব নাই। জ্যোতি যেমন সূর্য্যের বস্তুধর্ম্ম; জ্ঞান-স্বরূপত্ব, প্রেমস্বরূপত্ব প্রভৃতি সেইরূপ ব্রহ্মের বস্তুধর্ম্ম। জ্যোতি যেমন যাগ যজ্ঞাদি কোন বাহ্য ক্রিয়া, বা শ্রবণ মনন নিদিধ্যাসনাদি কোন মানসিক ক্রিয়ার উৎপাদ্য বা ফল নহে, ব্রহ্মজ্ঞানও সেইরূপ তাদৃশ কোন প্রকার ক্রিয়ার ফল নহে। উহা ক্রিয়াকারী, ধ্যানকারী বা কোনরূপ চিন্তাশীল কর্ত্তার বুদ্ধিপরতন্ত্র বা ক্রিয়া-পরতন্ত্র জ্ঞান নহে। উহা একমাত্র সিদ্ধবস্তু স্বরূপ ব্রহ্মরূপ পরম-বস্তু-পরতন্ত্র জ্ঞান।

"অতঃ প্রত্যক্ষাদিপ্রমাণবিষয়বস্তুজ্ঞানবৎ বস্তুতন্ত্রৈব এবম্ভূতস্য ব্রহ্মণস্তজ্জ্ঞানস্য বা ন কদাচিদ্‌যুক্ত্যা শক্যঃ কার্য্যানুপ্রবেশঃ কল্পয়িতুং।"

অতএব ব্রহ্মজ্ঞান কেবল প্রত্যক্ষাদি প্রমাণসিদ্ধ বস্তুজ্ঞানের

ন্যায় বস্তুতন্ত্র মাত্র। এবম্প্রকার ব্রহ্মাত্মজ্ঞানকে কার্য্যের সহিত সমন্বয় করিতে কেহই সমর্থ নহেন।

৬৪। ইহা নিশ্চয় হইল যে কর্ম্মাঙ্গ ব্যতিরেকে বস্তুবাদী শ্রুতি আছে এবং ব্রহ্ম পরমবস্তুরূপে শাস্ত্রসিদ্ধ, কিন্তু কর্ম্মকাণ্ডীয় বেদবিধির বিষয় বা মানস ক্রিয়ার বিষয়রূপে শাস্ত্রসিদ্ধ নহেন। তিনি ভূমা শব্দের বাচ্য।

"যত্র নান্যৎ পশ্যতি নান্যচ্ছৃণোতি নান্যদ্বিজানাতি স ভূমা।"

(ছান্দোগ্য।)

যে পরম বস্তু দর্শন শ্রবণ এবং মননাদি রূপ কোন প্রকার ক্রিয়ার বিষয় নহেন তিনিই ভূমা অর্থাৎ সর্ব্বব্যাপী অপরিচ্ছিন্ন ব্রহ্ম। "ভূমাত্বেব বিজিজ্ঞাসিতব্যমিতি" কেবল সেই ভূমা পদার্থকেই জানিতে ইচ্ছা করিবেক। যাগ যজ্ঞাদি ক্রিয়া করিয়া তাঁহাকে প্রত্যক্ষ জানিব এমত অভিমান করিবে না, কোন ক্রিয়ার ফলে চক্ষুতে তাঁহাকে দেখিব বা শ্রবণে তাঁহার কথা শুনিব এরূপ আশা করিবে না, আপনার মানসিক চিন্তা, বুদ্ধি, জ্ঞান বা অনুমানের বলে তাঁহাকে জানিব ইহা মনেও ভাবিবে না, তাঁহাকে জানার ইচ্ছা হইলে কেবল তাঁহারই প্রতি নির্ভর করিবে। তিনি সর্ব্বপ্রকার কর্তৃনিষ্পন্ন ক্রিয়া ও জ্ঞানের অবিষয়, কেন না হৃদয়ে তাঁহার প্রকাশ মাত্রে জীবের অপর সমস্ত অভিমান, ক্রিয়ার অভিমানই হউক, জ্ঞানাভিমানই হউক সমস্তই সেই পরমজ্ঞান-জ্যোতিতে অভিভূত হইয়া যায়। তাদৃশ সময়ে জীবের মোক্ষরূপ অশরীরত্ব যে সিদ্ধ তাহাই স্বতঃপ্রতীয়মান হয়।

৬৫। এক্ষণে প্রশ্ন এই যে তাদৃশ বস্তু মাত্র ব্রহ্মের উচ্চারণ, শ্রবণ, দর্শন, মনন প্রভৃতি একেবারেই অসম্ভব এবং তাহাতে কোন ফলও নাই। ইহার উত্তর এই যে ফল আছে; কিন্তু তাহার তাৎপর্য্য স্বতন্ত্র। অর্থাৎ সে ফল স্বর্গাদি-জনক অদৃষ্ট নহে কিন্তু প্রত্যক্ষ। কোন ব্যক্তির যদি রজ্জুতে সর্পভ্রম হয় তবে সেই সর্প-

ভ্রম নিবারণের উপায় কেবল রজ্জুরূপ বস্তুর জ্ঞান। সেই জ্ঞানটি "ইহা সর্প নহে, ইহা রজ্জু" এইরূপ উচ্চারণে, শ্রবণে, বা দর্শনে উদয় হইতে পারে। এতাদৃশ বস্তুর জ্ঞানোদয় মাত্রে কর্ত্তৃতন্ত্র ভ্রম নষ্ট হইয়া যায়। তদ্রূপ পরম সত্য-বস্তু-স্বরূপ ব্রহ্মকে আশ্রয় করিয়া এই সংসার সত্যের ন্যায় প্রকাশ পাইতেছে। জীব স্বীয় কর্ত্তৃতন্ত্র স্বার্থবশে সেই ব্রহ্মাশ্রিত সংসারকে সার ও সত্যবোধ করিয়া এবং তাহার মূল সত্যকে বিস্মৃত হইয়া সংসারী হইয়া আছেন। বস্তুরূপ ব্রহ্মের জ্ঞানাভাবে তাঁহার সংসার-ভয়রূপ অজ্ঞানতা জন্মিয়াছে। কিন্তু যদি এমত জ্ঞান হয় যে একমাত্র ব্রহ্মই নিত্য সত্য বস্তু, তিনিই আমার পরম গতি তাহা হইলে সংসার-ভয় থাকে না। তখন জীব সংসারনিষ্ঠ না হইয়া ব্রহ্মনিষ্ঠ হন। তাঁহার পক্ষে তখন সংসার আর থাকে না অর্থাৎ তাঁহার মন হইতে তাহার আকর্ষণ বিগত হয়। ব্রহ্মরূপ বস্তুর জ্ঞানোদয় মাত্রেই জীবাত্মার অসংসারী এবং অশরীর রূপ মোক্ষ সিদ্ধরূপে প্রতীয়মান হয়। ফলে, যেমন সত্য-রজ্জুর জ্ঞানাভাবে তদাশ্রিত মিথ্যা-সর্পজ্ঞান দ্রষ্টাকে মোহিত করিয়া রাখে; উপদেশ ব্যতীত, বস্তুদর্শন ব্যতীত সে মোহ বিগত হয় না; সেইরূপ ব্রহ্মরূপ সত্য পদার্থের জ্ঞানাভাবে তদাশ্রিত সংসারের মায়ায় যে ব্যক্তি বিমোহিত আছে তাহাকে যথার্থ বস্তুর দর্শনে প্রবোধিত করিবার নিমিত্তে অশেষ সংসার-ভয়-বিনাশ-বীজ স্বরূপ "সত্যং জ্ঞানমনন্তং," "একমেবাদ্বিতীয়ং" প্রভৃতি ব্রহ্মজ্ঞান-প্রতিপাদক উপদেশের সার্থক্য হইয়া থাকে। সেই সকল উপদেশ-বাক্য হৃদয়ঙ্গম হইলেই ব্রহ্মরূপ সৎবস্তুর দর্শন ও ধারণা হয়। তাদৃশাবস্থায় জীবের দেহ, মন, বুদ্ধি, ফলভোগ প্রভৃতি সংসারাভিমান নষ্ট হয় এবং অভিমানের অভাবে অসংসারী ও অশরীরী রূপ মোক্ষ যথার্থ সত্য ও স্বরূপাবস্থা বলিয়া প্রতীয়মান হইয়া থাকে।

৬৬। ফলে এস্থলে কর্ম্মীর আপত্তি এই যে প্রাগুক্ত 'রজ্জু সর্প' বিষয়ক দৃষ্টান্ত উপস্থিত ক্ষেত্রে সংলগ্ন হয় না, কেন না রজ্জু-স্বরূপ শ্রবণে বা দর্শনে যেমন দ্রষ্টার তদাশ্রিত সর্পভ্রম নিবারিত হয়, ব্রহ্মস্বরূপ শ্রবণে বা দর্শনানুভবে সেরূপ প্রকার সংসার-ভয় বাধিত হয় না। কারণ, যাঁহারা ব্রহ্মস্বরূপ শ্রবণ করিয়াছেন তাঁহা-দেরও পূর্ব্ববৎ সুখ দুঃখাদি সংসারধর্ম্ম ও দেহব্যাপার দৃষ্ট হইয়া থাকে। ইহার উত্তর এই যে ব্রহ্ম সম্বন্ধীয় শ্রবণ দর্শনাদি সামান্য সাংসারিক শ্রবণাদির ন্যায় নহে। উহা কোন ব্রত-কথা শ্রবণে অদৃষ্ট ফল লাভের তুল্য নহে। উহা সম্পূর্ণরূপে পারমার্থিক এবং ব্রহ্ম-প্রত্যক্ষ উহার পর্য্যবসান। ব্রহ্মপ্রত্যক্ষ মাত্রে জীবের সংসা-রের সহিত আত্ম ও মমত্ব ভাব এবং স্বীয় দেহেন্দ্রিয়মনাদির সহিত আত্ম ও মমত্ব ভাব বিগত হইয়া ব্রহ্মের সহিত পরমাত্ম ভাব ও ব্রহ্মোতে পরম মমত্ব ভাব প্রকাশিত হয়। তাদৃশ ব্রহ্মাত্মভাব লাভের পরে আর সংসারিত্ব থাকিতে পারে না। সংসারা-ভিমানের নামই সংসার। সারাৎসার ব্রহ্মকে বিস্মৃত হইলেই সেই অসার পদার্থে মমত্বাভিমান জন্মে, এবং সুখ দুঃখ ভয় বিপদ উপস্থিত করে। সেই অভিমানটি গেলেই দোষের সংসার, বাস-নার সংসার, প্রকৃতির বিরচিত সংসার নষ্ট হইয়া যায়। তৎ-পরিবর্ত্তে প্রকৃতির অতীত, পবিত্র মোক্ষস্বরূপ ব্রহ্মরাজ্যের দ্বার উদ্ঘাটিত হইয়া থাকে। শরীরও একটি ভয়ানক সংসার, তখন তাহাও নিবৃত্ত হয়।

৬৭। ব্রহ্মাত্ম ভাব লাভ হইলে শরীর নিবৃত্ত হয় ইহা পার-মার্থিক দৃষ্টি মাত্র। নতুবা ব্রহ্মজ্ঞান জন্মিবামাত্রে যে, শরীর চর্ম্ম-চক্ষুর অগোচর হইয়া যায় অথবা মৃত্যুগ্রাসে পতিত হয় এমত অভিপ্রায় নহে। পারমার্থিক দৃষ্টিতে শরীরে আত্মাভিমানশূন্য হওয়ার নামই অশরীরত্ব। ফলে প্রশ্ন এই যে এত স্নেহের শরী-

রের প্রতি কিরূপে আত্মাভিমান রহিত হইতে পারে? উত্তর; রক্ত মাংস অস্থি প্রভৃতির আধার এই দৃশ্যমান স্থূল দেহ, ইন্দ্রিয় প্রাণ মন বুদ্ধিরূপ অনুমিত সূক্ষ্ম কলেবর, এবং প্রকৃতিরূপ কারণ—দেহ এই ত্রিবিধ দেহ বা তাহার ধর্ম্ম আত্মা নহে। আত্মা তাহা হইতে বিলক্ষণ-স্বভাব। তিনি প্রকৃতির অতীত। তিনি বিকৃত, পরিণত বা অন্য পদার্থের সহিত সংযুক্ত বা বিযুক্ত হইয়া ঐ ত্রিবিধ শরীরের কোন প্রকার শরীররূপী হইতে পারেন না। সুতরাং আত্মা শরীর নহেন, বা শরীর আত্মা নহে। কেবল এইরূপ দৃঢ়তর জ্ঞানদ্বারা শরীরে আত্মাভিমান রহিত হইতে পারে। দ্বিতীয়তঃ ঐ ত্রিবিধ শরীরাভাবে আত্মার অস্তিত্ব নষ্ট হয় না। মৃত্যুদ্বারা স্থূলদেহ নষ্ট হইতে পারে, বিদেহ মোক্ষকালে স্থূল সূক্ষ্ম কারণ কোনরূপ দেহই থাকে না, কিন্তু আত্মা থাকেন। অতএব কোন প্রকার দেহ যদি আত্মার নিজস্ব না হইল তবে আত্মার উক্ত ত্রিবিধ-দেহ-সম্বন্ধ কেন হয়, তাহার কারণ কি এবং সে দেহত্রয়ের স্বরূপ কি? উত্তর—প্রাকৃতিক জগতে কর্ম্ম, ধর্ম্ম ও ভোগাদি সাধন করিয়া দিবার জন্য অনাদি কর্ম্মবীজবশাৎ দেহত্রয় জীবাত্মাকে আশ্রয় করে। বাসনারূপিণী প্রকৃতি যাহা কর্ম্ম ধর্ম্ম ভোগাদির বীজরূপে অনাদি কাল হইতে জীবাত্মার সন্নিধিবর্ত্তিনী থাকে তাহাই দেহ সমূহের মুল কারণ। সেই প্রকৃতি দেহের নিমিত্ত-কারণ নহে কিন্তু পরিণামী বা উপাদান কারণ। প্রকৃতির দ্বিবিধ ধাতু স্থূল এবং তৈজস। স্থূলধাতু তাহার অপকৃষ্ট পরিণাম; জড় জগতে তাহা দৃষ্ট হইয়া থাকে। তৈজস ধাতু তাহার উৎকৃষ্ট পরিণাম; তাহাই মন, বুদ্ধি, ইন্দ্রিয়-শক্তি ও প্রাণরূপে জীবকে আশ্রয় করে। এই মন, বুদ্ধি, ইন্দ্রিয়-শক্তি ও প্রাণ একত্রে সুক্ষ্ম শরীর নামে কথিত হয়। মনই সেই সুক্ষ্ম-দেহের মস্তকস্বরূপ। মনই বাসনাময়ী প্রকৃতির ক্ষেত্র। অথবা ইহাই বল যে মনই সেই প্রকৃতির

রূপ বিশেষ। বুদ্ধিশক্তি ও ইন্দ্রিয়শক্তি মনেরই অঙ্গ প্রত্যঙ্গ। প্রাণ সেই সকল অঙ্গপ্রত্যঙ্গের জীবনসাধক। ঐ বাসনারূপী-প্রকৃতি-নিষ্পন্ন সূক্ষ্মদেহে অতি সূক্ষ্মরূপে ও অব্যক্ত বীজরূপে স্থূলধাতুই বিরাজ করে। বস্তুতঃ প্রকৃতির তৈজস ধাতু ও স্থূল ধাতু মূলতঃ একই পদার্থ। মূলতঃ তাহা প্রকৃতিরূপ ঐশী শক্তি মাত্র। তাহাই পূর্ব্বপাদরূপে ভোক্তা কর্ত্তারূপী মানসিক জগৎ এবং উত্তরপাদরূপে ভোগ্যরূপী জড় জগতে পরিণত হইয়াছে। সূক্ষ্ম দেহই স্থূল মূর্ত্তিরূপে মাতৃগর্ভযোগে অবতীর্ণ হয়। বারবার তাদৃশ স্থূল মূর্ত্তি নষ্ট ও উৎপন্ন হইয়া থাকে। ভোগক্ষয় বশতঃ নষ্ট ও পুনর্ভোগার্থে আবির্ভূত হয়। যেমন কার্য্যক্ষমতা-ক্ষয়ে নিদ্রা এবং নিদ্রা-অন্তে পুনর্জ্জাগরণ তদ্বৎ। মনই তাদৃশ সূক্ষ্ম দেহের আধার এবং স্থূল দেহের বীজপ্রকৃতি। সূক্ষ্ম দেহের উত্তমাঙ্গস্বরূপ সেই মনের দেহসঙ্কল্প ব্যর্থ হয় না। স্থূল দেহ নিদ্রা কর্ত্তৃক শয্যায় পতিত হইলে পর মন শত শত স্বপ্নদেহ ধারণ করিতে পারেন। সেইরূপ একদেহ মৃত্যুকর্ত্তৃক নষ্ট হইয়া গেলেও মন আর একদেহ-রূপে জীবাত্মাকে আশ্রয় করিতে পারেন। বাসনাপ্রদা অনাদি প্রকৃতিই তাহার মূল। প্রকৃতি যেমন বাসনা-বীজরূপী সেইরূপ জীবকৃত কর্ম্মেরও ফলরূপী। সেই ফল আবার ভাবি দেহের বীজ-রূপী। অতএব প্রবাহরূপে বাসনাময়ী মানসিক প্রকৃতিই দেহ-ধারণের বীজ। পূর্ব্ব পূর্ব্ব জন্মের সঞ্চিত কর্ম্মফল সমূহ অদৃষ্ট বীজ-রূপে মনেতে স্থিতি করে। তাহা হইতে সংসারে কর্ম্ম করিবার ও ভোগাদি ব্যবহারের প্রবৃত্তি জাগ্রত হয়। কর্ম্ম ও ভোগাদি লই-য়াই সংসার। সৃষ্টিরক্ষার তাহাই উদ্দেশ্য। এই উদ্দেশ্য সফলের নিমিত্তে সেই কর্ম্মবীজ প্রবৃত্তিরূপে অঙ্কুরিত হয় এবং তাহা হইতে সূক্ষ্ম ও সূক্ষ্ম হইতে স্থূলদেহ পরিণত হইয়া জীবাত্মাকে কর্ম্মবিশিষ্ট করিয়া থাকে। অতএব সূক্ষ্ম ও স্থূলদেহ কেবল জীবাত্মার কর্ত্তৃত্ব-

ভোক্তৃত্ব-সম্পাদক অন্তঃকরণ ও বাহ্য-করণ মাত্র। পূর্ব্ব পূর্ব্ব কর্ম্মফলরূপ অনাদি প্রকৃতি তাহার কারণ এবং পর পর কর্ম্ম সাধন তাহার উদ্দেশ্য। এই স্থূল, সূক্ষ্ম, কারণ দেহ কর্ম্ম হইতে উৎপন্ন হয়, এবং প্রাকৃতিক জগতে কর্ম্মই সাধন করে। ধর্ম্মাধর্ম্মের আচরণ এবং সুখ দুঃখ ভোগ সেই কর্ম্মেরই অন্তর্গত। এতাবতা "আত্মার দেহ-সম্বন্ধ কেন হয়" এবং "তাহার কারণ কি" এ প্রশ্নদ্বয়ের উত্তর এই যে দেহ কর্ম্মজন্য। "কর্ম্মভ্যঃ শরীরপরিগ্রহোজায়তে" কর্ম্ম সকল হইতে শরীর-পরিগ্রহ হয়। "রাগাদিভ্যঃ কর্ম্মাণি জায়ন্তে" সংসারের প্রতি অনুরাগ ও ফলস্পৃহা হইতে কর্ম্ম সকল জন্মে। দেহেতে যে আত্মাভিমান তাহাই তাদৃশ অনুরাগের হেতু "অভিমানাদ্রাগাদয়োজায়ন্তে"। সেই অভিমান কেবল অবিবেক হইতে উৎপন্ন হয় অর্থাৎ "আমি শরীর হইতে স্বতন্ত্র" এই বিবেকের অভাবে আত্মা দেহকে আমি বলিয়া অভিমান করেন। "অজ্ঞানাদবিবেকোজায়তে" সেই অভিমানের মুল যে অবিবেক তাহা অজ্ঞান হইতে জন্মে। বাসনাময়ী প্রকৃতিই ঐ অজ্ঞানস্বরূপিণী, কেন না অনাদি কাল হইতে তাহারই সন্নিধান বশতঃ জন্মকর্ম্ম পরম্পরা দেহেতে জীবের আত্মাধ্যাসরূপ মিথ্যাজ্ঞান জন্মে। দেহকে আত্মা বলিয়া মনে করা মিথ্যাজ্ঞান। তাহা বাসনা, অনুরাগ, এবং কর্ম্মজন্য উপস্থিত হয়। অতএব বাসনাদির মুল প্রকৃতি বা তজ্জনিত কর্ম্ম অজ্ঞান-শব্দের বাচ্য। ঐ প্রকৃতি ও কর্ম্মের নামান্তর যে অজ্ঞান তাহা জীবাত্মার নিকট হইতে কিরূপে নিবৃত্ত হইতে পারে? উত্তর

"ব্রহ্মাত্মৈকজ্ঞানে জাতে সতি সর্ব্বাত্মনাঽবিদ্যানিবৃত্তিঃ"

যেরূপ সংসারাবস্থায় দেহের সহিত জীবের একত্বজ্ঞান হয় সেইরূপ ব্রহ্মের সহিত জীবের একত্বজ্ঞান হইলে নিঃশেষে অজ্ঞানের নিবৃত্তি হয়। তখন জীব নিশ্চয়রূপে জানিতে পারেন যে, দেহ

আমি বা আমার নহে, ব্রহ্মই আমার আমিত্ব। এইরূপে ব্রহ্মজ্ঞান প্রকাশিত হইলেই জীবের হৃদয় হইতে মনের সহিত দেহাভিমান বিগত হয়। তাহারই নাম শরীর-নিবৃত্তি। অতএব

"সশরীরত্বস্য মিথ্যাজ্ঞাননিমিত্তত্বাৎ"। (শাঃ ভাঃ)

আত্মার শরীর-সম্বন্ধ মিথ্যাজ্ঞানজনিত মাত্র। ব্রহ্মের প্রতি আত্মনির্ভর করিয়া সেই মিথ্যাজ্ঞানটি ত্যাগ করিতে পারিলে ব্যবহারে স্থূল ও সূক্ষ্ম দৈহ থাকিলেও জীবাত্মার দেহ-সম্বন্ধ রহিত হইয়া যায়। ফলতঃ জীবাত্মার অশরীরত্বই নিত্যসিদ্ধ। প্রকৃতির সম্বন্ধে এবং সৃষ্টিরক্ষার অনুরোধে তাঁহাতে যত অজ্ঞানই আসিয়া পড়ুক তাহা জ্ঞানোদয় মাত্রে তিরোহিত হয়। সে সব জঞ্জাল তাঁহার নিজস্ব বা স্বরূপ নহে। তিনি নিজে নির্ম্মল পদার্থ তাহার আর ব্যভিচার নাই। এখন বুঝিয়া দেখ, কর্ম্ম বা প্রকৃতি আত্মার নিমিত্তে যতই শরীর রচনা করুক, সেই সকল শরীরকে স্বীকার করিয়া আত্মা লোক লোকান্তরে যতই ভোগাদি করুন, সে সমস্তই অজ্ঞানাবস্থা। শাস্ত্রে আব্রহ্মস্তম্ভপর্য্যন্ত সমস্ত অবস্থাকেই অর্থাৎ ব্রহ্মলোকাবধি সমগ্র সংসারকে মায়াকল্পিত বা অজ্ঞানকল্পিত বলেন। ব্রহ্মাত্মজ্ঞান জাতমাত্রে তৎসমস্তের মিথ্যাস্বরূপত্ব প্রতীয়মান হয়। অতএব আত্মার দেহ-সম্বন্ধ প্রত্যক্ষ হইলেও তাহা পরমার্থতঃ ও স্বরূপতঃ মিথ্যা। রজ্জুর বোধ জন্মিবামাত্রে যেমন সর্পভয় নিবারিত হয় সেইরূপ ব্রহ্মরূপ বস্তু দর্শনমাত্র দেহ-সম্বন্ধের সহিত অশেষ সংসার-ভয় রহিত হয়। তদুত্তর কালে আর সংসারিত্ব বা শরীরত্ব থাকে না। সুতরাং পরমবস্তুরূপ ব্রহ্মস্বরূপ উচ্চারণের, শ্রবণের, বা দর্শনের রজ্জুবোধবৎ অভয়রূপ ফল আছে।

৬৮। ইতিপূর্ব্বে উক্ত হইয়াছে যে স্থূল সূক্ষ্ম প্রভৃতি শরীর ও তদ্ভোগ্য সংসার এই উভয়ই মায়িক এবং প্রকৃতির বিকার। আত্মজ্ঞানোদয়ে তাহা যে কেবল মরণান্তে নিত্যকালের নিমিত্ত

রহিত হয় এমত নহে, জীবন কালেও তাহা জ্ঞানতঃ ও বিচারতঃ নিবৃত্ত হইয়া থাকে। এই কারণে বেদান্ত শাস্ত্র সংসার ও দেহ-বীজস্বরূপিণী প্রকৃতিকে মায়া এবং অজ্ঞান কহেন। যখন মূলটি মায়া ও অজ্ঞান হইল, তখন তাহার বিকারস্বরূপ সংসার ও দেহও মায়া ও অজ্ঞানস্বরূপ মাত্র। সুতরাং পরমার্থতঃ তদুভয় মিথ্যা। আত্মার অস্তিত্ব যেরূপ সত্য-স্বরূপ, তদুভয়ের অস্তিত্ব সেরূপ সত্য-স্বরূপ নহে। তাহা কেবল আত্মবিরোধী বিপরীত জ্ঞানজন্য। বাসনা ও ভোগরূপিণী প্রকৃতি সেই বিপরীত জ্ঞানের কারণ। কেবল আত্মজ্ঞান দ্বারাই সেই বিপরীত জ্ঞানটির অসত্যতা প্রতিপন্ন হয়। কিন্তু এস্থলে প্রশ্ন এই যে সংসার ও দেহ যদি স্বরূপতঃ মিথ্যা হইল, তবে সত্যবস্তুস্বরূপ আত্মার সহিত তাহার পরস্পরাধ্যাস কিরূপে সম্ভবে? প্রথমতঃ "সারূপ্যনিমিত্তাশ্চাধ্যাসা ভবন্তি" কোন এক অংশে সাদৃশ্য ব্যতীত ভ্রম বা অধ্যাস জন্মে না, দ্বিতীয়তঃ "স্মৃতিরূপঃ পরত্র পূর্ব্বদৃষ্টাবভাসঃ।" পূর্ব্বদৃষ্ট পদার্থের স্মরণরূপ যে জ্ঞান, সময়ান্তরে অন্য পদার্থে সেই জ্ঞানের আভাস অনুভবের নাম অধ্যাস। এখন সন্দেহ এই যে মিথ্যাস্বরূপ সংসার ও দেহ, আর সত্য-স্বরূপ আত্মা, এ উভয়ের সাদৃশ্য কোথা? যাহা নাই অন্যেতে তাহার ভ্রম বা তাহাতে অন্যের ভ্রম কিরূপে সম্ভবে? তাহার স্মরণও সম্ভবে না। এবং সেই স্মৃতি হইতে উৎপন্ন জ্ঞান অন্য পদার্থে অধ্যস্ত হওয়া অসম্ভব। এই প্রশ্নের উত্তর এই যে সংসার ও দেহাদির বীজস্বরূপ যে অজ্ঞান তাহা আকাশকুসুমবৎ অভাব-রূপী নহে। কিন্তু "জ্ঞানবিরোধী ভাবরূপং।" তাহা জ্ঞানবিরোধী ভাবরূপী পদার্থ, তাহাই মায়া, আর "মায়ান্তু প্রকৃতিং বিদ্যাৎ" সেই মায়াই প্রকৃতি। "অজ্ঞানমনাদ্যনির্ব্বচনীয়ং" সেই মায়া, বা প্রকৃতির নামান্তর অজ্ঞান। তাহা অনাদি ও অনির্ব্বচনীয়। উহা ঈশ্বরের সৃষ্টিশক্তি মাত্র। "দেবাত্মশক্তিং স্বগুণৈর্নিগূঢ়াং" উহা

ঈশ্বরের সৃষ্টিশক্তি এবং স্বীয় স্বত্ত্ব, রজঃ, তমোগুণ দ্বারা বেষ্টিতা। "পরাস্য শক্তির্বিবিধৈব শ্রূয়তে।" ঈশ্বরের সেই শক্তি মহতী এবং বিচিত্রা। জীবাত্মা চিরকাল তাহার মধ্যে এবং তাহার দ্বারা প্রতিপালিত হইয়া কোটি কোটি সংসার ও দেহ উপভোগ করিয়াছেন এবং কুসুমাদি হইতে বায়ুর গন্ধগ্রহণের ন্যায় সেই সমস্ত দেহের ও সংসারের সূক্ষ্মাংশস্বরূপ মন-প্রধান সূক্ষ্মদেহ এবং বাসনা-প্রধান অজ্ঞান প্রকৃতিকে সংস্কাররূপে জন্মজন্মান্তরে বহন করিয়া আসিতেছেন। বীজ আর বৃক্ষে যেমন প্রবাহ রূপ সম্বন্ধ ঐ মায়া বা অজ্ঞান-প্রকৃতির সহিত জীবের দেহধারণ ও সংসারভোগের সেই রূপ প্রবাহরূপ সম্বন্ধ। অজ্ঞান-সমুৎপন্ন ইন্দ্রিয়, প্রাণ, মনাদি-বিশিষ্ট দেহ ও মনো-নিহিত বাসনা চেতনবৎ পদার্থ এবং জীব তৎসমস্ত প্রবাহক্রমে দৃষ্টি ও সংস্কাররূপে ধারণ করিয়া আসিতেছে। ব্যবহার-ক্ষেত্রে সে সমস্ত পদার্থ অলীক নহে। কিন্তু প্রত্যক্ষ বিষয়ের ন্যায় সত্য। জীবাত্মাও "অস্মৎ" জ্ঞানের বিষয়। বিশেষতঃ ঐ সমস্ত মায়িক পদার্থ জীবাত্মার সহিত সামানাধিকরণ্য সম্বন্ধে বর্ত্তমান। এই সমস্ত কারণে তৎসমস্তের সহিত জীবাত্মার কিয়দংশ সৌসাদৃশ্য আছে, এবং তাহাদের আভাস জীবাত্মাতে প্রতিফলিত হইয়া দেহাত্মজ্ঞান ও সংসারাভিমান জন্মে। এরূপ অভিমান না থাকিলে সৃষ্টিসংসার বিশৃঙ্খল হইয়া যায়।

"নচ অনধ্যস্তআত্মভাবেন দেহেন কশ্চিৎ ব্যাপ্রিয়তে" (শাঃ ভাঃ উপক্রঃ)

যে দেহের সহিত আত্মার পরস্পর অধ্যাস না হইয়াছে সে দেহেতেও কোন ব্যবহার হয় না। এবং সে আত্মারও কোন কর্ত্তৃত্ব সম্ভবে না। অতএব অধ্যাসই জীবত্ব ব্যবহারের হেতু। কিন্তু জীবাত্মাতে আত্মজ্ঞানের উদয়মাত্রে বাসনা ও মনের সহিত সংসার ও দেহ-ভ্রম নিবৃত্ত হইয়া যায়। অর্থাৎ প্রকৃতি-রাজ্য হইতে উত্তীর্ণ হইয়া জীবাত্মা আত্ম-রাজ্যে প্রবেশ করেন। এতাবতা সত্যবস্তুস্বরূপ

আত্মার সহিত মায়াবিরচিত পরমার্থতঃ অসত্য দেহাদির পরস্পরাধ্যাস অসম্ভব নহে।

৬৯। আর এক কথা বিচার-সাপেক্ষ। ভ্রম-জন্য এক বস্তুতে অন্য বস্তুর যে জ্ঞান সে জ্ঞান এক জাতীয়; আর, উপমাজন্য এক বস্তুতে অন্য বস্তুর গুণ-সদৃশ কোন আরোপিত গুণ-বিশেষের তাৎপর্য্যজ্ঞান অন্য জাতীয়। ভ্রম-জ্ঞানস্থলে উভয় পদার্থের মধ্যে যে প্রভেদ সে বোধ থাকে না। কিন্তু উপমাস্থলে উভয়েরই ভেদ স্পষ্ট জানা থাকে। সর্প আর রজ্জুর মধ্যে যে প্রভেদ রজ্জুতে সর্পভ্রম কালে দ্রষ্টার সেই প্রভেদ-জ্ঞান থাকে না। ভ্রম-জ্ঞানের এই লক্ষণ। কিন্তু উপমাস্থলে যে আরোপিত গুণের জ্ঞান তাহা ভ্রম নহে। তাহাকে গৌণ বলে। সিংহ শব্দের মুখ্য তাৎপর্য্য সিংহ নামক পশুতে। কিন্তু কোন পুরুষের শৌর্য্য বীর্য্য প্রভৃতি সিংহ-গুণ-তুল্য কোন গুণ প্রকাশার্থে যখন সেই পুরুষের প্রতি সিংহ শব্দের প্রয়োগ হয় তখন তথা উপমা মাত্র উদ্দেশ্য। সে স্থলে সিংহ শব্দের তাৎপর্য্যকে গৌণ তাৎপর্য্য বলা যায়। এরূপ গৌণ-তাৎপর্য্য-গ্রহণ ভ্রম-জ্ঞান নহে। সিংহ ও পুরুষে যে ভেদ এই উপমা বা গৌণার্থ দ্বারা সে ভেদ-জ্ঞানের ব্যত্যয় হয় না। এইক্ষণে প্রশ্ন এই যে জীবাত্মার যে দেহাভিমান তাহা রজ্জুতে সর্পভ্রমের ন্যায় ভ্রম? কি পুরুষের সিংহসদৃশ গুণের ন্যায় গৌণ-বুদ্ধি মাত্র? উত্তর, আত্মা আর দেহেতে যে অনাদি ভেদ প্রসিদ্ধ আছে; সেই ভেদ-জ্ঞান-অভাবেই আত্মার দেহাভিমান জন্মে। সুতরাং দেহাভিমানরূপ জ্ঞান ঔপমেয় বা গৌণ নহে। কিন্তু সম্পূর্ণ মিথ্যা। কেন না সর্প স্বতন্ত্র পদার্থ আর রজ্জু স্বতন্ত্র পদার্থ, এই ভেদ-জ্ঞান উদয় মাত্রে যেমন রজ্জু-আশ্রিত সর্প-ভ্রম নিবারিত হয়, সেই রূপ দেহ স্বতন্ত্র পদার্থ এবং আত্মা স্বতন্ত্র পদার্থ এই পরম-ভেদ-জ্ঞান হৃদয়ঙ্গম মাত্রে আত্মার দেহাভিমান বিদূরিত হয়। সুতরাং দেহাভিমান কেবল ভ্রমমূলক।

"তস্মাৎ মিথ্যাপ্রত্যয়নিমিত্তাৎ সশরীরত্বসিদ্ধং জীবতোপি বিদুষোঽশরীরত্বং" (শাঃভাঃ)

অতএব আত্মার সশরীরত্ব কেবল মিথ্যাজ্ঞান-নিমিত্ত। সুতরাং তত্ত্বজ্ঞানী ব্যক্তির সেই মিথ্যাজ্ঞানটি না থাকায় তাঁহার জীবিতাবস্থাতেও অশরীরত্ব সিদ্ধ হয়। আত্মার যেমন অশরীরত্ব সিদ্ধ, সেই রূপ অসংসারিত্বও সিদ্ধ। তাঁহাতে জাতি, গুণ, বর্ণাশ্রমাচার, যজমানত্ব প্রভৃতি সকলই মিথ্যাজ্ঞানজন্য পরিকল্পিত হইয়া থাকে। ব্রহ্মজ্ঞানী এই সর্ব্বপ্রকার অভিমান ত্যাগ করেন। তাদৃশ ব্যক্তিই জীবন্মুক্ত। জীবন্মুক্ত অবস্থায় জীবাত্মা ব্রহ্মাত্মভাবসম্পন্ন হন।

"সচক্ষুরচক্ষুরিব, সকর্ণোকর্ণইব, সবাগবাগিব, সমনা অমনাইব, সপ্রাণোপ্রাণইব"

তখন তিনি এই সংসারে চক্ষু থাকিতেও অচক্ষুর ন্যায়, কর্ণ থাকিতেও অকর্ণের ন্যায়, বাক্য থাকিতেও বাক্যহীনের ন্যায়, মনসত্ত্বেও মনরহিতের ন্যায়, এবং প্রাণ থাকিতেও অপ্রাণের ন্যায় নিঃস্বার্থ হইয়া বিচরণ করেন। দর্শন, শ্রবণ, বাক্য কথন, মনন, এবং প্রাণন প্রভৃতি যে কোন ক্রিয়া করেন তাহা সাংসারিক সংকল্পবর্জ্জিত হইয়া করিয়া থাকেন। কেননা তখন তিনি একমাত্র ব্রহ্মানন্দে নিমগ্ন, সুতরাং সাংসারিক ভোক্তৃত্ব, ভোগায়তন, ও ভোগ্য পদার্থ সমুদয়ই নিবৃত্ত হইয়া যায়। এতাদৃশ অবস্থায় যে ব্রহ্মভাব প্রকাশ পায় তাহা কখন কর্ম্মকাণ্ডীয় বেদভাগের প্রতিপাদ্য হইতে পারে না। তাহা যজ্ঞাদি কোন ক্রিয়ার ফল বা অঙ্গ হইতে পারে না এবং শ্রবণ মনন নিদিধ্যাসনরূপ কোন ক্রিয়ারও বিষয় হইতে পারে না। তাহা একমাত্র বস্তুতন্ত্র-জ্ঞান এবং তাহার প্রকাশ সমস্ত প্রকার কর্ম্মকাণ্ডের বিনাশক। পরমাত্মাস্বরূপ সেই পরম বস্তুই জ্ঞান স্বরূপে বৈদিক জ্ঞানকাণ্ডের প্রতিপাদ্য এবং কর্ম্মকাণ্ডীয় শ্রুতি সকলেরও পরম্পরা তাঁহাতেই উদ্দেশ্য। তিনি যে জ্ঞানস্বরূপ সর্ব্বজ্ঞ, জগৎকারণ, সর্ব্বকর্ম্মের ফলদাতা এবং মোক্ষের অভিন্ন স্বরূপ, সমস্ত বেদশাস্ত্রের সমন্বয় দ্বারা তাহাই জানা যায়। তন্মধ্যে নির্গুণপ্রতি-

পাদক শ্রুতি সমূহ যাহা তাঁহার পরমাত্মীয় বস্তুস্বরূপত্বকে প্রতিপন্ন করে তাহারই প্রাধান্য। কেননা তাঁহাকে এক মাত্র পরমাত্মা রূপে জানিলেই মোক্ষলাভ হইয়া থাকে। সেই জ্ঞানই প্রত্যক্ষ জ্ঞান; আর তাঁহার জগৎকারণত্ব, সর্ব্বজ্ঞত্ব, ফল-দাতৃত্ব প্রভৃতি ভাব শ্রুতি ও যুক্তিসঙ্গত পরোক্ষজ্ঞান মাত্র। বেদশাস্ত্র কামধেনু। অধিকারী বিশেষে তিনি সর্ব্বতোভাবে সেই এক ব্রহ্মকেই নানা প্রকারে উপদেশ করিয়াছেন। নতুবা কেবল ঈশ্বরশূন্য ক্রিয়া বা কর্ম্মফল মাত্রে বেদের তাৎপর্য্য হইতে পারে না। সমস্ত বেদ কেবল ব্রহ্মপর।

ইতি প্রথম অধ্যায়ে প্রথম পাদে চতুর্থাধিকরণে চতুর্থ
সূত্রের ব্যাখ্যা সমাপ্ত।

প্রথম অধ্যায়।

প্রথম পাদ।

পঞ্চমাধিকরণ।

পঞ্চমাবধি একাদশ সূত্র।

৭০। প্রথমাবধি চতুর্থ অধিকরণে কর্ম্মীদিগের আপত্তি খণ্ডন পূর্ব্বক সিদ্ধান্ত করিয়াছেন যে, ব্রহ্ম-জিজ্ঞাসা পরমাত্মারূপ প্রসিদ্ধ-বস্তু-পরতন্ত্র। ক্রিয়াপরতন্ত্র নহে। ব্রহ্ম এই জগতের জন্ম-স্থিতি-ভঙ্গের কারণ, সর্ব্বজ্ঞ, সর্ব্বশক্তিমান্ ও সকলের মুখ্য আত্মা। তাঁহা হইতে নিশ্বসিত-ন্যায়ে বেদোৎপন্ন হইয়াছে এবং বেদ হইতে তাঁহার স্বরূপজ্ঞান লাভ হয়। সমস্ত বেদ সেই ব্রহ্ম ও মোক্ষকে ক্রিয়ার অবিষয় রূপে প্রতিপাদন করে।

এই সমস্ত সিদ্ধান্তের প্রতি সাংখ্যমতাবলম্বীদিগের যে সকল আপত্তি আছে এই বর্ত্তমান অধিকরণে তাহারই খণ্ডনে প্রবৃত্ত হইতেছেন। সাংখ্যাচার্য্যগণের পূর্ব্বপক্ষ এই—

ছান্দোগ্যোপনিষদের ষষ্ঠ প্রপাঠকে আছে—

> 'সদেব সৌম্য ইদমগ্র আসীৎ একমেবাদ্বিতীয়ং,
> তদৈক্ষত বহুস্যাং প্রজায়েয়েতি তত্তেজোঽসৃজত ইতি'

হে শিষ্য। অগ্রে ইহা (এই জগৎ) সৎ মাত্র ছিল। তিনি একমাত্র অদ্বিতীয়। তিনি সঙ্কল্প করিলেন আমি প্রজা রূপে বহু হইব। পরে তিনি তেজের সৃষ্টি করিলেন অর্থাৎ ক্রম পূর্ব্বক এই জগৎ সৃষ্টি করিলেন।

এই শ্রুতি অনুসারে সাংখ্যমতে জগৎসৃষ্টির নিমিত্তে ব্রহ্ম অপেক্ষিত নহেন। কেন না—

'তচ্ছব্দবাচ্যং সর্ব্বজগৎকারণং প্রধানং নতু ব্রহ্ম; প্রধানস্য সত্ত্বগুণযুক্তত্বয়া পরিণামিত্বয়াচ জ্ঞানশক্তিক্রিয়াশক্তিসম্ভবাৎ; নিগু´ণস্য কূটস্থস্য ব্রহ্মণস্তদসম্ভবাৎ'। (শাঃ ভাষ্য)

এই শ্রুতিতে যে সৎশব্দ আছে তাহার বাচ্য ব্রহ্ম নহেন কিন্তু সর্ব্বজগৎকারণরূপিণী প্রধান (প্রকৃতি)। প্রধানের সত্ত্বগুণও আছে, বহুরূপে পরিণত হওয়ার শক্তিও আছে। সত্ত্বগুণ থাকাতে তাহার জ্ঞান-শক্তি সম্ভব হইতেছে, আর পরিণাম লাভের ক্ষমতা থাকায় তাহার ক্রিয়া-শক্তিও সম্ভব হইতেছে। দেহেন্দ্রিয়াদি-রহিত, নির্ব্বিশেষ, নিগু´ণ, অবিকারী, কূটস্থ চৈতন্য মাত্র ব্রহ্মের ঐরূপ কার্য্যোপযোগী জ্ঞান-শক্তি ও ক্রিয়া-শক্তি অসম্ভব।

অতএব প্রকৃতিই ঐ সৎ শব্দের বাচ্য। উৎপত্তির পুর্ব্বে এই জগৎ সেই এক অদ্বিতীয় প্রকৃতি রূপে ছিল। ছিল বলিয়াই প্রকৃতিই সৎ শব্দের বাচ্য। প্রকৃতিই স্বীয় সত্ত্বগুণের বিকার জ্ঞান-শক্তি এবং রজ স্তমোগুণের বিকার ক্রিয়াশক্তি দ্বারা বহু হইয়াছে। মনোবুদ্ধি ইন্দ্রিয়াদি এবং বাহ্য জগৎ সমুদয়ই তাহার পরিণাম।

'সর্ব্বশক্তিত্বং তাবৎপ্রধানস্যাপি স্ববিকার বিষয়মুপপদ্যতে' (শাঃ ভাঃ)

প্রকৃতির যে স্বীয় বিকার-লক্ষণ আছে তাহাতে তাহার সর্ব্ব-শক্তিত্ব উপপন্ন হয়। কেন না বিকৃত ও পরিণত হইয়া উহা ইন্দ্রিয়, মন, আকাশাদি ক্রমে সমস্ত ব্রহ্মাণ্ডের রূপধারণ করিতে পারে।

'সর্ব্বজ্ঞত্বমপি উপপদ্যতে' (শাঃ ভাঃ)

উহার সর্ব্বজ্ঞত্বও যুক্তিসিদ্ধ। কেন না

'যৎত্বং জ্ঞানং মন্যসে সত্ত্বধর্ম্মঃ সঃ, সত্ত্বাৎ সংজায়তে জ্ঞানমিতিস্মৃতেঃ' (শাঃ ভাঃ)

যাহাকে তুমি জ্ঞান বল তাহা সত্ত্বগুণেরই ধর্ম্ম, কারণ স্মৃতিতে কহেন সত্ত্বগুণ হইতে জ্ঞান জন্মে।

'সত্ত্বস্য হি নিরতিশয়োৎকর্ষে সর্ব্বজ্ঞত্বং প্রসিদ্ধং' (শাঃ ভাঃ)

সত্ত্বগুণের অতিশয় উৎকর্ষে সর্ব্বজ্ঞত্ব জন্মে ইহা প্রসিদ্ধই আছে। তাহার দৃষ্টান্ত সত্ত্বগুণের সাধনে যোগীদের সর্ব্বজ্ঞত্ব।

'ত্রিগুণত্বাত্তু প্রধানস্য সর্ব্বজ্ঞানকারণভূতং সত্ত্বং প্রধানাবস্থায়ামপি বিদ্যতে ইতি। প্রধানস্যাচেতনস্যৈব সতঃ সর্ব্বজ্ঞত্বমুপচর্য্যতে বেদান্তেষু। (শাঃ ভাঃ)

জগদুৎপত্তির পূর্ব্বে মহা প্রলয়কালে প্রকৃতির সত্ত্বরজস্তমঃ এই গুণত্রয়ের যে সাম্যাবস্থা (অব্যক্তাবস্থা) থাকে সেই অবস্থাকে প্রধানাবস্থা কহে। সেই অবস্থাতেও প্রকৃতি সত্ত্বগুণযুক্ত থাকে। সুতরাং প্রকৃতিতে সর্ব্বদাই সর্ব্বজ্ঞানের কারণ বিদ্যমান থাকে। অতএব ইহা বলিতে হইবে যে বেদান্তে যাহাকে সর্ব্বজ্ঞ জগৎকারণ বলিতে চান তাহা সেই প্রকৃতিই। তাহা অচেতন হইলেও বেদান্ত তাহাকে সর্ব্বজ্ঞ বলিতে পারেন।

সাংখ্যপক্ষীয় এই পূর্ব্বপক্ষের মীমাংসা করণার্থে মহর্ষি ব্যাসদেব পঞ্চমাবধি একাদশ পর্য্যন্ত নিম্নস্থ সাতটী সূত্র প্রণয়ন করিয়াছেন। সেই কারণে এই সাতটী সূত্রই এই বর্ত্তমান অধিকরণে গ্রথিত হইয়াছে।

পঞ্চম সূত্র।

সূত্র। ঈক্ষতের্নাশব্দং। ৫।

অর্থ। জড় প্রকৃতির জগৎকর্ত্তৃত্ব বেদে কহেন নাই। কেন না, 'ঈক্ষতি' অর্থাৎ সৃষ্টির সঙ্কল্প করা চৈতন্য অপেক্ষা করে।

তাৎপর্য্য।

৭১। উপরি উক্ত 'সদেব' শ্রুতিতে যে 'সৎ' * শব্দ আছে

* বেদে সৃষ্টির কারণ স্বরূপ যে সৎ শব্দ উক্ত হইয়াছে তাহা ব্রহ্ম-চৈতন্যবাচক। কিন্তু যে স্থলে এমত উক্ত হইয়াছে যে 'পূর্ব্বে সৎ বা অসৎ কিছুই

তাহা জড়-প্রকৃতি-বাচক নহে। বেদে তাদৃশ প্রকৃতিকে জগৎ-কারণ বলেন নাই।

'ঈক্ষতেবীক্ষিতৃত্বশ্রবণাৎ কারণস্য' (শাঃ ভাঃ)

উক্ত শ্রুতিতে স্পষ্ট আছে যে সৎস্বরূপ কারণ সঙ্কল্প পূর্ব্বক সৃষ্টি করিলেন।

এইরূপ সঙ্কল্প করা অচেতন প্রধানের কর্ম্ম নহে। তাহাতে চৈতন্য অপেক্ষা করে। যদিও ঐ শ্রুতিতে স্পষ্ট বাক্যে 'সৎ' কে চৈতন্যস্বরূপ কহেন নাই কিন্তু তত্তুল্য অন্যান্য শ্রুতিতে তাঁহাকে আত্মা সুতরাং চেতন কহিয়াছেন। যথা—

'আত্মা বা ইদমেকএবাগ্র আসীন্নান্যৎ কিঞ্চন মিষৎ সঐক্ষত লোকান্নু সৃজা ইতি স ইমান লোকানসৃজত।'

সৃষ্টির পূর্ব্বে এক আত্মা মাত্র ছিলেন। অন্য কিছু ছিল না। তিনি আলোচনা করিলেন লোক সকল সৃজন করিব। পরে তিনি এই সকল লোক সৃষ্টি করিলেন।

উপরিউক্ত শ্রুতিতে জগৎকারণকে আত্মা কহিয়াছেন। তিনিই সৃষ্টিবিষয়ক আলোচনা ও তপস্যার কর্ত্তারূপে কথিত হইয়াছেন। এই শ্রুতি 'সদেব' শ্রুতির তুল্যার্থবাচী। 'সদেব' শ্রুতির সৎও সে জন্য ঐ আত্মা মাত্র।

ছিল না' তাহার তাৎপর্য্য এই যে 'সৎ' কিনা কার্য্য-রূপী প্রকটিত জগৎ ছিল না এবং 'অসৎ' অর্থাৎ 'অভাব' ছিল না। 'কথমসতঃ সজ্জায়েত?' 'অসৎ' অর্থাৎ 'অভাব' হইতে 'সৎ' কিনা কার্য্যরূপী জগৎ কিরূপে জন্মিবে? পুরাণশাস্ত্রে অনেক স্থলে প্রকৃতিকে 'সদসদাত্মিকা' কহেন। তাহার তাৎপর্য্য 'কার্য্যকারণশক্তিযুক্তা'। যখন সৃষ্টিকালে প্রকৃতি কার্য্যে প্রকাশিত হয় তখন তাহাকে সৎ বলা যায়। প্রলয়ে যখন অব্যক্ত থাকে তখন অসৎ বলা যায়। শাস্ত্রে এমনও আছে যে সৃষ্টির পূর্ব্বে জগৎ 'অসৎ' ছিল। তথা তাৎপর্য্যে 'অব্যাকৃত সৎ'। এ সব 'অসৎ' শব্দে অভাব নহে। 'অভাবস্য কারণত্বনিষেধাৎ' অভাবের জগৎকারণত্ব নাই [illegible] ।

'সদেব সৌম্য ইদমগ্র আসীৎ,' 'আত্মা বা-ইদমেক এবাগ্র আসীৎ,' 'ব্রহ্ম বা একমিদমগ্র আসীৎ'।

এ সমস্ত শ্রুতিরই অর্থসঙ্গতি একই প্রকার। এ সকলের মধ্যে 'সৎ,' 'আত্মা,' 'ব্রহ্ম' শব্দ সমুহ একই চৈতন্যময় ব্রহ্ম-প্রতিপাদক। তৎসমস্ত জড় প্রকৃতিকে প্রতিপাদন করে না। প্রকৃতিতে জড় 'আত্মা' শব্দের প্রয়োগ হইতে পারে না। তাহা কর্ত্তৃক সঙ্কল্পও সম্ভবে না। সৃষ্টি করার সঙ্কল্প কেবল একমাত্র সর্ব্বজ্ঞ সর্ব্বশক্তিমান্ ব্রহ্মেতেই সঙ্গত হয়।

সৃষ্টির পূর্ব্বে প্রকৃতির গুণত্রয় সাম্যাবস্থায় থাকে। সাংখ্যাচার্য্যেরা ঐ 'সৎ' বা 'ব্রহ্ম' শব্দ তদবস্থাপন্ন অচেতন প্রকৃতিবাচক বলেন। তাঁহারা বলেন প্রকটিত হওয়ার পূর্ব্বে এই সৃষ্টি সর্ব্ববিকারের মূল বীজ স্বরূপে স্থিতি করে। ঐ অচেতন মূল বীজই প্রকৃতি। তাহাই সৎ। তাহাই জগৎকারণ ব্রহ্ম। তাহাতে সে অবস্থায় নিগূঢ়ভাবে সত্ত্বগুণ থাকে। অচেতন হইলেও সত্ত্বগুণপ্রভাবে ঐ প্রকৃতি আপনা আপনি সর্ব্বজ্ঞ হয়। বেদান্ত একথার এই উত্তর দেন—

'যদি গুণসাম্যে সতি সত্ত্বব্যপাশ্রয়াং জ্ঞানশক্তিমাশ্রিত্য সর্ব্বজ্ঞং প্রধানমুচ্যতে তর্হি কামং রজস্তমোব্যপাশ্রয়ামপি জ্ঞান-প্রতিবন্ধশক্তিমাশ্রিত্য কিঞ্চিজ্‌জ্ঞত্ব মুচ্যেত। (শাঃ ভাঃ)

প্রকৃতির ঐরূপ গুণ-সাম্যাবস্থাতেও যদি তাহার কেবল সত্ত্বগুণাশ্রিত জ্ঞানশক্তি অবলম্বন পূর্ব্বক তাহাকে সর্ব্বজ্ঞ বল, তাহা হইলে, ঐ অবস্থাতেই তাহাতে রজস্তমোগুণাশ্রিত যে জ্ঞান-প্রতিবন্ধক শক্তি আছে তাহা ধরিয়া তাহার অল্পজ্ঞত্বও স্বীকার কর। কিন্তু অল্পজ্ঞত্ব-মিশ্রিত সর্ব্বজ্ঞত্ব সর্ব্বজ্ঞত্বই নহে। সর্ব্বজ্ঞত্বাভাবে প্রকৃতি জগৎকারণ হইতে পারে না।

৭২। অধিকরণ।

'সাসাক্ষিকা সত্ত্বপ্রবৃত্তির্জানাতি নাতিশীয়তে নচাচেতনস্য প্রধানস্য সাক্ষিত্বমস্তি।
(শাঃ ভাঃ)

সাক্ষিকা অর্থাৎ অধিষ্ঠাতৃ আত্মা ব্যতীত, আত্মারূপ জ্ঞানালম্বন ব্যতীত, পুরুষের অধিষ্ঠান ব্যতীত সত্ত্বগুণের বৃত্তি স্ফূর্ত্তি পাইতে পারে না। সাংখ্যের অচেতন প্রধানেতে আত্মার অধিষ্ঠাতৃত্ব নাই এজন্য তাহার সর্ব্বজ্ঞত্ব অসম্ভব।

অচেতন পদার্থে সত্ত্বগুণ থাকিলেই যে তাহা সচেতন বা সর্ব্বজ্ঞ হইবে এমৎ নহে। অগ্রে সচেতন পুরুষ, ইন্দ্রিয়মনোযুক্ত আত্মা থাকা চাই। তবে সেই পুরুষেতে বা আত্মাতে সন্নিধিবর্ত্তী সত্ত্ব-গুণের প্রভাব সঞ্চরিত হইবে।

'যোগিনাং তু চেতনত্বাৎ' (শাঃ ভাঃ)

সত্ত্বগুণ জন্য যোগীদিগের যে সর্ব্বজ্ঞত্ব হয় তাহা কেবল তাঁহা-দের আত্মাধিষ্ঠিত ইন্দ্রিয়মনোযুক্ত পুরুষত্ব আছে বলিয়াই হয়। কোন জড় প্রতিমূর্ত্তিতে সেরূপ যোগৈশ্বর্য্য আশ্রয় করে না। যাঁহারা যোগবলে সর্ব্বজ্ঞত্ব লাভ করেন তাঁহাদের সর্ব্বজ্ঞত্বে এবং ব্রহ্মের সর্ব্বজ্ঞত্বে বিশেষ আছে। যোগীরা প্রথমে অল্পজ্ঞ থাকেন পরে জ্ঞান-সাধন-প্রভাবে সর্ব্বজ্ঞ হন। কিন্তু

'সবিতৃপ্রকাশবৎব্রহ্মণোজ্ঞানস্বরূপনিত্যত্বেন জ্ঞানসাধনাপেক্ষানুপপত্তেঃ।'
(শাঃ ভাঃ)

সূর্য্য-প্রকাশবৎ ব্রহ্মের নিত্য-জ্ঞানস্বরূপত্ব হেতু যোগীদিগের ন্যায় তাঁহার জ্ঞান সাধনাপেক্ষা নাই। তিনি স্বয়ংই জ্ঞানস্বরূপ আত্মা।

'অবিদ্যাদিমতঃ সংসারিণঃ শরীরাদ্যপেক্ষা জ্ঞানোৎপত্তিঃ স্যাৎ ন জ্ঞানপ্রতি-বন্ধকারণরহিতস্যেশ্বরস্য' (শাঃ ভাঃ)

অবিদ্যাচ্ছন্ন সংসারী জীবেরই শরীর ইন্দ্রিয় মনাদিকে আশ্রয়

করিয়া জ্ঞানোৎপত্তি হয় । কিন্তু জ্ঞানবিরোধী অবিদ্যারহিত ঈশ্বরের শরীর মনাদির অপেক্ষা নাই । তিনি স্বয়ংই জ্ঞানস্বরূপ আত্মা ।

অতএব ঈশ্বরের জ্ঞান-স্বরূপত্ব সত্ত্বগুণ জন্য নহে । প্রকৃতির সত্ত্বগুণ তাঁহার শক্তি'র এক কণামাত্র । যোগীদিগের সর্ব্বজ্ঞত্বও তদ্রূপ ।

'সাক্ষিনিমিত্তমীক্ষিতৃত্বং প্রধানস্য কল্প্যেত যথাগ্নিনিমিত্তময়ঃপিণ্ডাদের্দগ্ধৃত্বং তথা-সতি যন্নিমিত্তমীক্ষিতৃত্বং প্রধানস্য তদেব সর্ব্বজ্ঞং মুখ্যং ব্রহ্ম জগতঃ কারণমিতি যুক্তং । (শাঃ ভাঃ)

অগ্নির অধিষ্ঠানে অয়ঃপিণ্ডের দাহিকা শক্তি জন্মে, তাহার ন্যায় চৈতন্যাধিষ্ঠান বশতঃ যদি প্রধানের ঈক্ষণক্রিয়া স্বীকার কর, তবে প্রধানের ঈক্ষণ মিথ্যা হইবে, কেন না যাঁহার অধিষ্ঠানে প্রধানেতে ঈক্ষণ-শক্তি জন্মে সেই সর্ব্বজ্ঞ মুখ্য ব্রহ্মই জগতের কারণ হইতেছেন ।

৭৩ । এস্থলে পূর্ব্বপক্ষবাদী সাংখ্যাচার্য্যগণ কহেন ।

"অচেতনেপি চেতনবদুপচারদর্শনাৎ" (শাঃ ভাঃ)

অচেতন প্রকৃতির যে চেতনবৎ ব্যবহার তাহা গৌণমাত্র ।

এই পূর্ব্বপক্ষের অভিপ্রায় এই যে, জগৎ সৃষ্টি বিষয়ে অচেতন প্রকৃতি সত্য সত্যই আলোচনা বা সঙ্কল্প করিয়াছে বেদের এমন অভিপ্রায় নহে । অচেতন প্রকৃতির বিকার হইতে জগদুৎপত্তি হইয়াছে ইহাই সত্য । তবে যে বেদে আলোচনা, ঈক্ষণ, সঙ্কল্প প্রভৃতি শব্দ আছে তাহা গৌণপ্রয়োগমাত্র । মুখ্য প্রয়োগ নহে । অচেতন প্রকৃতির মহত্তত্ত্ব, পঞ্চতন্মাত্রাদিক্রমে পরিণত হওয়া কেবল চেতনের ন্যায় কার্য্য । নতুবা সৃষ্টিকার্য্য উদ্ধারের নিমিত্তে তাহাকে যে সত্যই সচেতন হইতে হইবে এমন প্রয়োজন দেখি না । তাহার এমন আশ্চর্য্য শক্তি আছে যে, তদ্দ্বারা তৎকর্ত্তৃক সচেতন ও সর্ব্বজ্ঞের ন্যায় কার্য্য হয় । অতএব তাহার ঈক্ষিতৃত্ব ও সর্ব্বজ্ঞত্ব

গৌণ প্রয়োগ। তাহার প্রমাণ এই যে 'সদেব' শ্রুতির পরেই ঐরূপ গৌণ প্রয়োগ-পর শ্রুতি আছে যথা।

'তত্তেজ ঐক্ষত তা আপঐক্ষন্তেতি'

সৎ যে তেজ সৃষ্টি করিয়াছিলেন সেই তেজ সঙ্কল্প করিল। জলও সঙ্কল্প করিল।

ইত্যাদি গৌণ-সঙ্কল্প তেজ ও জল সম্বন্ধে ব্যবহৃত হওয়ায় বেদের সেই একই প্রকরণান্তর্গত সৎ কর্ত্তৃক যে সঙ্কল্প তাহাকেও গৌণরূপে গ্রহণ করিতে হইবে।

'তস্মাৎ সৎকর্ত্তৃকমপীক্ষণমৌপচারিকমিতি গম্যতে'

অতএব সৎকর্ত্তৃক ঈক্ষণ গৌণ মানিতে হইবে।

পূর্ব্বপক্ষবাদী বেদব্যাকের এই বিপরীত অর্থ উপস্থিত করায় মহর্ষি ব্যাস তদুত্তরে নিম্নস্থ সূত্র অবতারণ করিতেছেন।

ষষ্ঠ সূত্র।

সূত্র—'গৌণশ্চেন্নাত্মশব্দাৎ'। ৬।

অর্থ। প্রকৃতির আলোচনাকে গৌণ বলিলেই যে চলিবে এমন নহে। কেন না বেদে আত্মা শব্দের প্রয়োগ আছে।

তাৎপর্য্য।

৭৪। ছান্দোগ্যোপনিষদের যে প্রকরণে ঈক্ষণশ্রুতি আছে তাহার আদ্যন্ত পাঠ করিলেই বুঝা যাইবে যে সাংখ্যপক্ষীয় এই গৌণবাদ অযুক্ত। কেন না

১। 'তেজোঽবন্নানাং ত্রিবৃত্তা তদেব প্রকৃতং মহাভূতানি চ তেজোবন্নানি দেবতাশব্দেন প্রয়ুক্তানি সেয়ং দেবতৈক্ষত হন্তাহমিমাস্তিস্রো দেবতা অনেন জীবেন আত্মনানুপ্রবিশ্য নামরূপে ব্যাকরবাণীতি' (শাঃ ভাঃ)

সদেব সৌম্যেদমগ্র ইত্যাদি শ্রুতিতে সৎকর্ত্তৃক তেজ, জল ও অন্নের

উৎপত্তি কহিয়াছেন। পরে ঐ প্রকৃত 'সৎ' ও তৎসৃষ্ট তেজ জল ও অন্নকে দেবতা শব্দে উল্লেখ করিয়াছেন। পরে কহিয়াছেন যে, সেই দেবতা আলোচনা করিলেন যে আমি জীবাত্মারূপে ঐ তিন দেবতাতে প্রবিষ্ট হইয়া নাম ও রূপ প্রকাশ করিব।

এস্থানে সৎ হইতে জ্যোতিঃ জল ও অন্ন (অন্ন শব্দে পৃথিবী) উৎপন্ন হওয়ার যে উল্লেখ, তাহা সূক্ষ্ম সৃষ্টি মাত্র। তাহা ব্যবহারের অযোগ্য, অপ্রত্যক্ষ, দ্যোতনাত্মক। ফলতঃ তাহাই নয়ন, রসন, ও ঘ্রাণেন্দ্রিয়ের দীপ্তিদাতা অধিদেবতা। এজন্য ঐ ত্রিবিধ সৃষ্ট পদার্থ দেবতা শব্দে কথিত হইয়াছেন। আকাশ ও বায়ুও ঐরূপ দেবতা। 'তদাকাশং বায়ুঞ্চ সৃষ্ট্বা তেজঃ সৃষ্টবদিত্যর্থঃ' (আনন্দগিরি)। সেই আকাশ ও বায়ুসৃষ্টির পর তেজঃ জল ও পৃথিবী এই তিন দেবতার সৃষ্টি হইয়াছে এই অর্থ। ঐ তিন দেবতার সৃষ্টিকর্ত্তা বিধায় সেই সৎও দেবতা শব্দে কথিত হইয়াছেন। তিনিই আদিদেব—পরম দেব। তিনি স্বয়ম্প্রকাশ। কিন্তু উহাঁরা স্বয়ংপ্রকাশ নহেন। পরন্তু তিনিই তাঁহাদের প্রকাশক, দীপ্তিদাতা, জয়দাতা, ও তাঁহাদের কূটস্থ আত্মা। তিনি তাঁহাদের অধিদেবতা, ভূতাত্মা, ভূতভাবন, ভূতাধিবাস, হৃষীকেশ (হৃষীক = ইন্দ্রিয় + ঈশ = ঈশ্বর = হৃষীকেশ অর্থাৎ ইন্দ্রিয়াধিদেব)। তাঁহার এই অলৌকিক প্রভাব জন্য তিনিও দেবতা শব্দে উক্ত হইয়াছেন। দেবতাশব্দের অর্থ দীপ্তিদাতা। জ্যোতিঃ নয়নের, জল রসনার, ক্ষিতি গন্ধের দীপ্তিদাতা। সুতরাং তাঁহারা দেবতা। নয়ন, রসনা ও ঘ্রাণেন্দ্রিয় ইহাঁরা মনের সংযোগে পদার্থের জ্ঞান প্রকাশ করেন সুতরাং তাঁহারাও দেবতা। পরমাত্মা তাঁহাদের সকলের প্রকাশক। অতএব তিনি পরম দেবতা। এই জন্য উক্ত বেদবাক্যে ইহাঁরা সকলেই দেবতা বলিয়া উক্ত হইয়াছেন। তন্মধ্যে পরমাত্মা সচেতন এবং ভূতেন্দ্রিয়গণ অচেতন। ভূতেন্দ্রিয়-বিদ্যুক্ত স্থূল সূক্ষ্ম দেহও অচেতন।

সৎ কর্ত্তৃক সৃষ্ট হইয়া ঐ তিন দেবতা প্রথমে অস্থি: সূক্ষ্ম, অব্যবহার্য্য ও অপ্রত্যক্ষ ছিলেন। পশ্চাৎ সেই সৎ (পরমাত্মা) আবার আলোচনা করিলেন যে "আমি জীবাত্মা রূপে এই তিন দেবতাতে প্রবেশ করিয়া নাম আর রূপ প্রকাশ করিব"। এস্থলে আনন্দ গিরি কহেন—

"সূক্ষ্মভূতানাং ব্যবহারাঙ্গত্বেন অপ্রত্যক্ষত্বাৎ তেষু দেবতাশব্দোহনেন পূর্ব্বসৃষ্ট্যনুভূতেন জীবেন প্রাণধৃতিহেতুনা আত্মনা সদ্রূপেণ যথোক্তদেবতাঃ স্বর্গান্তরং প্রবিশ্য নাম চ রূপঞ্চেতি বিস্পষ্টং আ সমন্তাৎ করবাণীতি।"

ইহার সংক্ষেপ তাৎপর্য্য এই যে ঐ সকল সূক্ষ্ম ভূতগণ অব্যবহার্য্য ও অপ্রত্যক্ষ থাকায় সদ্রূপ পরমাত্মা তাঁহাদিগকে স্থূলরূপে পরিণত করিলেন। তাঁহারা আপনারা স্থূল হইতে পারেন না। পরমাত্মা তাঁহাদের মধ্যে প্রবেশ করিয়া—তাঁহাদের অধিনায়ক ও নিয়ামক হইয়া তাঁহাদিগকে নামরূপে প্রকাশ করিতে ইচ্ছা করিলেন। এই রূপে সেই সতের যে দেবতাতে অনুপ্রবেশ তাহাই জীবাত্মা শব্দে উক্ত হইয়াছে। ইহা ব্যবহারিক অল্পজ্ঞ জীবাত্মা নহে। তিনি ইন্দ্রিয়াধিপ দেবগণের প্রকাশক, স্থূল শরীরের প্রকাশক এবং জীবেতে আভাস চৈতন্য স্বরূপে, মুখ্য জীবাত্মারূপে, অন্তরাত্মা রূপে অবস্থিত পরমাত্মাই। তিনি স্বীয় সৃষ্ট সূক্ষ্ম ভূত ইন্দ্রিয় ও জীবগণকে নামরূপে প্রকাশ করিয়া এই প্রত্যক্ষ ও ব্যবহারিক বিশ্ব প্রকাশ করিয়াছেন। তিনি এই বিশ্বের সাধারণ আত্মা। প্রত্যেক জীবের তিনি মুখ্য জীবাত্মা। তাঁহা হইতে জীবাত্মাতে অহং ইদং প্রভৃতি বুদ্ধিবৃত্তির উদয় হইতেছে।

৭৫। অতএব যদি প্রকৃতিকে ঐ সৎশব্দে কহ, তাহার আলোচনা ও চেতনত্বকে গৌণমাত্র কহ, ও তাহাকে জড় বলিয়া অঙ্গীকার কর তবে দেবতাতে ও জীবেতে তাহার জীবাত্মা রূপে অনুপ্রবেশ অসম্ভব। উক্ত শ্রুতিতে সতের দেবতাতে অনুপ্রবেশ, ইন্দ্রিয়ে

অনুপ্রবেশ, পরে জরায়ুজ অণ্ডজ প্রভৃতি জীবে অনুপ্রবেশ ক্রমে ক্রমে উক্ত হইয়াছে। যদি সে সৎকে অচেতন প্রকৃতি বল অথচ উক্ত রূপ অনুপ্রবেশ স্বীকার কর তাহা হইলে এ সংসারের সমস্ত জীবের জড়ত্ব-দোষ উপস্থিত হয়। জড় প্রকৃতিকে জীবের মুখ্য আত্মা বলিতে পার না। জীবাত্মা হইতে গেলেই প্রকৃতির মুখ্য চৈতন্য প্রয়োজন। তাহাকে গৌণ দৃষ্টিতে গ্রহণ করিলে চলিবে না। কেবল চৈতন্য স্বরূপ ব্রহ্মই জীবের মুখ্যাত্মা। উক্ত বেদ-বাক্যে যখন সেই সতের প্রতি ঐরূপ আত্মাশব্দের প্রয়োগ আছে, তখন তাহাকে জড় প্রকৃতি কেন বলিব, কেনই বা তাহার ঈক্ষণকে গৌণ বলিব। কেবল চৈতন্য স্বরূপ ব্রহ্মই ঐ সদ্রূপ। 'তত্ত্বমসি শ্বেতকেতো' এই শ্রুতিতেও সেই সৎকেই আত্মা শব্দে উপদেশ করিয়া চেতন শ্বেতকেতুর মুখ্য আত্মা রূপে তাঁহাকেই গ্রহণ করি-য়াছেন।

"সতস্ত্বাত্মশব্দান্ন গৌণমীক্ষিতৃত্বং"। (শাঃ ভাঃ)

অতএব ব্রহ্মেতে যে আত্ম শব্দের ও ঈক্ষিতৃত্বের প্রয়োগ তাহা গৌণ প্রয়োগ নহে। কিন্তু মুখ্য প্রয়োগ। ফলে তেজ, জল, অন্ন প্রভৃতি সৃষ্ট বস্তু সমূহের চৈতন্য নাই। তাহাদের ঈক্ষণ প্রভৃতি যাহা কিছু বেদে আছে তাহাই গৌণ। যেমন লৌহপিণ্ড-সংপৃক্ত অগ্নির অধিষ্ঠান জন্য 'লৌহপিণ্ড দহন করিতেছে' ইত্যাকার বাক্যের ব্যবহার হয়, সেই রূপ তেজ, অপ, অন্ন কর্ত্তৃক যে আলোচনার উক্তি আছে, তাহা তত্রানুপ্রবিষ্ট ব্রহ্মচৈতন্যের অধিষ্ঠান জন্য ব্যবহৃত হইয়াছে। তাৎপর্য্য এই যে ঈক্ষণ, আলোচনা, সঙ্কল্প, প্রভৃতি রূপক বা গৌণরূপে জড় প্রকৃতিতে প্রয়োগ হয় নাই, কিন্তু মুখ্যরূপে সৎ-চৈতন্যময় ব্রহ্মতে প্রয়োগ হইয়াছে।

৭৬। সাংখ্যমতাবলম্বীগণ পুনশ্চ পূর্ব্বপক্ষ করিতেছেন—

"অচেতনেপি প্রধানে ভবত্যাত্মশব্দঃ। প্রধানংহি
পুরুষস্যাত্মনোভোগাপবর্গৌ কুর্ব্বদুপকরোতি' (শাঃ ভাঃ)

অচেতন প্রধানেতেও আত্মশব্দ ব্যবহৃত হইতে পারে। কেন না, প্রধানই আত্মার ভোগাপবর্গ-সাধক। কার্য্যকারী ভৃত্যতে যেমন রাজার আত্ম-বুদ্ধি জন্মে তদ্বৎ। অধিকন্তু—

''এক এব আত্মশব্দশ্চেতনাচেতনবিষয়া ভবিষ্যতি'
'যথৈকএব জ্যোতিঃশব্দ ক্রতুজ্বলনবিষয়ঃ' (শাঃ ভাঃ)

যেমন এক জ্যোতিঃ শব্দ জ্যোতিষ্টোম যজ্ঞকেও বুঝায় এবং আলোককেও বুঝায়, সেইরূপ এক আত্ম শব্দ চেতনকেও যেমন বুঝায়, অচেতন প্রকৃতিকেও তেমনি বুঝাইতে পারে।

অতএব পূর্ব্বপক্ষ এই যে বেদের উল্লিখিত আত্মা শব্দ জড়-স্বভাব সৎপদবাচ্য প্রকৃতিবাচক হইবার বাধা নাই। সেই প্রকৃতি কর্ত্তৃক সৃষ্টি বিষয়ক যে আলোচনা তাহা রূপক বর্ণনা মাত্র। এই পূর্ব্ব পক্ষের উত্তরে ব্যাসদেব কহিতেছেন যে অচেতন প্রধানে আত্ম শব্দ সঙ্গত হয় না, কেন না—

সপ্তম সূত্র।

সূত্র। তন্নিষ্ঠস্য মোক্ষোপদেশাৎ। ৭।

অর্থ—আত্ম-নিষ্ঠের মোক্ষ কথিত হইয়াছে।

তাৎপর্য্য।

৭৭। পরমাত্মনিষ্ঠ পুরুষেরই মোক্ষ হয় ইহা বেদের বাক্য। জড়নিষ্ঠা মোক্ষ-জনিকা নহে। ছান্দোগ্যোপনিষদের ষষ্ঠ প্রপাঠকে শ্বেতকেতুর পিতা আরুণি জগৎ-কারণ-স্বরূপ পূর্ব্বোক্ত সৎকে সর্ব্বপ্রাণির আত্মারূপে বর্ণন করিয়া শ্বেতকেতুকে এইরূপে মোক্ষ উপদেশ দিয়াছেন।

"তৎত্বমসি শ্বেতকেতো"

ইতিপূর্ব্বে জগৎকারণ সৎ ও আত্মা রূপে যিনি কথিত হইয়াছেন, হে শ্বেতকেতো। তিনি তুমি। এস্থলে শারীরক ভাষ্যে আছে—

"চেতনস্য শ্বেতকেতোর্ম্মোক্ষয়িতব্যস্য তন্নিষ্ঠামুপদিশ্য আচার্য্যবান্ পুরুষো বেদ তস্য তাবদেব চিরং যাবন্ন বিমোক্ষ্যেহথ সম্পৎস্য ইতি মোক্ষোপদেশাৎ"

এই বেদবাক্য দ্বারা মোক্ষভাগী চেতন শ্বেতকেতুকে সেই আত্মা রূপে উপদেশ করিয়া মোক্ষ শিক্ষা দিয়াছেন, যথা, আচার্য্যবান পুরুষ তাঁহাকে জানেন। যাবন্মুক্তি না হয় তাবন্মাত্র তাঁহার বিলম্ব। পরে তিনি মুক্ত হন।

জগৎকারণ সদ্রূপ পরম চৈতন্য সকলের সাধারণ আত্মা। তাঁহাকেই শ্বেতকেতুর মুখ্য আত্মারূপে নির্দ্দেশ পূর্ব্বক, শ্বেতকেতুকে স্বীয় সাংসারিক জীবত্ব হইতে উদ্ধার করিয়া মোক্ষের উপদেশ দিয়াছেন। পরমাত্মাই জীবাত্মার অবলম্বন। তাঁহাকে প্রত্যক্ষ আত্মা বলিয়া বোধ হইলে ব্যবহারিক জীবত্বরূপ মোক্ষপ্রতিবন্ধ নিবৃত্ত হইয়া সাক্ষাৎ মুক্তিলাভ হয়। বেদোক্ত সেই আত্মা শব্দকে বলপূর্ব্বক অচেতন-প্রকৃতি-বাচক কহিলে ঐরূপ বৈদিক্ উপদেশ নিষ্ফল হইবে। কেন না তাহা হইলে এই অর্থ হইবে "হে শ্বেতকেতো! তুমি অচেতন প্রকৃতি, তুমি জড়াত্ম, তুনি অনাত্ম, তুমি অচেতন।" অচেতন প্রধানকে এইরূপে সচেতন জীবাত্মার আত্মারূপে উপদেশ করিলে, কোন আত্মনিষ্ঠ জ্ঞাননিষ্ঠ পুরুষ তাহা গ্রহণ করিবেন না। পক্ষান্তরে কোন জ্ঞানবিমুখ মূর্খ ভক্ত যদি তাদৃশ উপদেশ পায় তবে অন্ধের গোলাঙ্গুল * ধারণের ন্যায় সেই জড়

---

* অন্ধের গো-লাঙ্গুল-ধারণ বিষের এই উপন্যাস আছে। এক অন্ধ স্বীয় স্ত্রীর উদ্দেশে শ্বশুরালয়ে যাত্রা করে। পথে এক প্রান্তরে সে শ্বশুর-বাটীর এক গোরক্ষককে প্রাপ্ত হইয়া তাহাকে পথ দেখাইতে কহে। রাখাল গো পরিত্যাগ

প্রকৃতিকেই আত্মা বলিয়া—পরমপদার্থ ভাবিয়া ভক্তিপূর্ব্বক ধারণ করিয়া থাকিবে। কখনই তাহা পরিত্যাগ করিয়া প্রকৃত আত্মানুসন্ধানে তৎপর হইবে না। তাদৃশ ভক্ত যথার্থ আত্মার দর্শনাভাবে অজ্ঞানান্ধকারে পতিত হইয়া থাকিবে। শুভাকাঙ্ক্ষী বেদ শাস্ত্রের এরূপ বিপরীত উদ্দেশ্য অসম্ভব। সুতরাং সচেতন পরমাত্মাই জগৎকারণ সৎশব্দের প্রতিপাদ্য, অচেতন প্রকৃতি নহে।

৭৮। অপরঞ্চ আত্মা শব্দ চেতন অচেতন উভয়-প্রতিপাদক হইতে পারে না।

'চেতনবিষয়এব মুখ্যআত্মশব্দশ্চেতনত্বোপচারাদ্ভূতাদিষু প্রযুজ্যতে ভূতাত্মা ইন্দ্রিয়াত্মা ইতি চ'। (শাঃ ভাঃ)

আত্মা শব্দের যে মুখ্যার্থ তাহা চেতন। ভৌতিক পদার্থে তাহার প্রয়োগ গৌণ মাত্র। চৈতন্যের আরোপে তাদৃশ প্রয়োগ হয়। যথা 'ভূতাত্মা' যিনি ভৌতিক পদার্থে আছেন, 'ইন্দ্রিয়াত্মা' যিনি ইন্দ্রিয়েতে বিদ্যমান। ইহার এমন অর্থ নহে "যে অচেতন ভূত ও ইন্দ্রিয় সেই আত্মা ও সুতরাং আত্মা অচেতন।"

পূর্ব্বক যাইতে অপারক হওয়ায় অন্ধকে একটা ষাঁড় আনিয়া দিয়া কহিল এই ষাঁড় তোমার শ্বশুরের বাটী বেশ চেনে, তুমি যদি বরাবর ইহার লাঙ্গুল ধরিয়া যাও তবে এ তোমাকে নির্ব্বিঘ্নে তথায় লইয়া যাইবে। এই উপদেশানুসারে অন্ধ ঐ ষাঁড়ের লাঙ্গুল ধরিয়া চলিল। লাঙ্গুলে টান পড়ায় ষাঁড় বিরক্ত হইয়া লম্ফ ঝম্ফ ও চিৎকার সহকারে অন্ধকে পদাঘাৎ করিতে লাগিল। পাছে ভ্রষ্ট হয় এই ভয়ে অন্ধ তাহায় লাঙ্গুল আরো দৃঢ় করিয়া ধরিল। ক্রমে রাত্রি হওয়ায় অন্ধ এবং তাহার ষাঁড় পথ হারা হইয়া যায়। তখন দৈবাৎ তাহার শ্বশুরের একজন ভৃত্য স্বীয় প্রভুর ষাঁড়কে একজন অপরিচিত ধরিয়া টানাটানি করিতেছে দেখিয়া তাহাকে চোর বলিয়া নিশ্চয় করিল এবং তাহার হস্ত হইতে ষাঁড়কে মুক্ত করিয়া অন্ধকে বিলক্ষণ প্রহার করিল। অন্ধ তথায় মৃতবৎ পতিত রহিল। আর শ্বশুরালয়ে যাইতে পারিল না। মূর্খ গোরক্ষকের উপদেশে অন্ধের কষ্টসার হইল। বাঞ্ছাপূর্ণ হইল না। তাৎপর্য্য এই যে প্রকৃত উপায় ব্যতীত কেহ গম্য স্থান লাভ করিতে পারে না। একবার যে মূর্খ অজ্ঞ গুরুর উপদেশে অনাত্ম-বাদ ধরিয়াছে, তাহা পরিত্যাগ করিয়া আত্মজ্ঞানে উপনীত হওয়া তাহার পক্ষে বড়ই কষ্টকর ব্যাপার।

বিশেষতঃ আত্মা শব্দকে যদি চেতন অচেতন উভয়-প্রতিপাদকই বল, তথাপি তাহার চেতন-পক্ষেরই জয় হইবে।

'সাধারণত্বেপি আত্মশব্দস্য ন প্রকরণমুপপদং। বা কিঞ্চিৎ নিশ্চায়কমন্তরেণ অন্যতরবৃত্তিতা নির্ধারয়িতুং শক্যতে। নচ অত্র অচেতনস্য নিশ্চায়কং কিঞ্চিৎ কারণমস্তি। প্রকৃতস্তু সদীক্ষিতৃসন্নিহিতশ্চ চেতনঃ শ্বেতকেতুঃ। নহি চেতনস্য শ্বেতকেতোরচেতনআত্মা সম্ভবতীত্যবোচাম'। (শাঃ ভাঃ)

উপরি উক্ত বিচার-বাক্যের তাৎপর্য্য এই। যদি আত্মা শব্দের "প্রকৃতি" ও "চেতন" উভয়-সাধারণ অর্থ কর তথাপি ঐ উভয়ের মধ্যে যে পদার্থে ঐ শব্দ সংলগ্ন হইবার বিশেষ কারণ বর্ত্তমান আছে, কেবল তাহাতেই উহা সংলগ্ন হইতে পারে। তাদৃশ বিশেষ কারণ ব্যতীত বলপূর্ব্বক কোন পদার্থে তাহা প্রয়োগ করা অসম্ভব। অচেতন প্রধানে তাদৃশ কোন কারণ বর্ত্তমান নাই। কিন্তু প্রকৃত চৈতন্য ও সৎস্বরূপ সৃষ্টির ঈক্ষণকর্ত্তা সম্বন্ধে সে কারণ বর্ত্তমান আছে। অপরাপর কারণ যতই থাকুক, যখন চেতন শ্বেতকেতুর জীবাত্মা তাঁহাকে অবলম্বন পূর্ব্বক আত্মা হইয়াছে এবং তন্নিষ্ঠ হইয়া আছে, তখন তিনিও যে চৈতন্যস্বরূপ তাহাতে সন্দেহ নাই। বেদ যাঁহাকে জগতের "সৎ" স্বরূপ ঈক্ষণকর্ত্তা বলিয়াছেন তাঁহাকেই "তৎ" শব্দ দ্বারা নির্দ্দেশ পূর্ব্বক 'তত্ত্বমসি শ্বেতকেতো' এই মহাবাক্যে চেতন শ্বেতকেতুর মুখ্য আত্মা রূপে গ্রহণ করিয়াছেন। এতাবতা বেদ-বাক্য সকল একই চৈতন্য-প্রতিপাদনে সমন্বিত। এইরূপে যিনি শ্বেতকেতুর অন্তরাত্মা, যে আত্মা বিরহে শ্বেতকেতু অন্ধ এবং যাঁহাকে মূল আত্মা জানিয়া শ্বেতকেতু মোক্ষলাভ করিয়াছিলেন তিনিই আত্মা শব্দের প্রতিপাদ্য। এশব্দের উভয়-সাধারণ অর্থ হইবে না। কেবল একতর অর্থেই উহার পর্য্যবসান।

প্রকৃত কথা এই যে সচেতন শ্বেতকেতুর এক অল্পজ্ঞ জীবাত্মা

যথা সৌম্য একেন মৃৎপিণ্ডেন সর্ব্বং মৃণ্ময়ং বিজ্ঞাতং স্যাৎ বাচারম্ভনং বিকারো-নামধেয়মৃত্তিকেত্যেব সত্যং এবং সৌম্য স আদেশোভবতীতি'

হে সৌম্য! যেমন এক মৃৎপিণ্ডের তত্ত্ব জানিলে সকল মৃণ্ময় বস্তুর তত্ত্ব অবগত হওয়া যায়। তদ্বিকার ঘটসরাবাদি, ও সে সমস্ত নাম, বাক্য মাত্র। সেই মৃত্তিকাই একমাত্র সত্য, তদ্রূপ মদুক্ত সেই বিজ্ঞেয় বিষয়।

৮০। পিতা এতাবৎ উপক্রম ও প্রতিজ্ঞা করিলে শ্বেতকেতু পিতার নিকট উক্ত বিষয়ের জিজ্ঞাসু হইলেন। তখন তাঁহার পিতা 'সদেব সৌম্যেদমগ্র আসীদেকমেবাদ্বিতীয়ং' ইত্যাদি শ্রুতিসমূহ দ্বারা তাঁহাকে উপদেশ দিলেন যে, আদিতে কেবল "সৎ" ছিলেন। তিনি একমাত্র অদ্বিতীয়। তখন কোন জীব বা কোন জড় পদার্থ প্রকটিত ছিল না। এই কারণে তাঁহাকে অদ্বিতীয় কহা যায়। এই-কারণেই তাঁহাকে এক কহা যায়। তিনি সঙ্কল্প করিলেন আমি বহু হইব। অমনি তাঁহার স্বরূপ ও শক্তি প্রস্ফুটিত হইয়া জীব ও জড় জগতে পরিণত হইল। ব্যোম, মরুত, তেজ, অপ ও অন্নরূপিণী ধরণী প্রকাশ পাইল। ইন্দ্রিয় প্রাণ মনোবুদ্ধির সহিত জীবাত্মা আসিয়া ভোক্তারূপে অবতীর্ণ হইলেন। সেই সৎ আত্মারূপে সর্ব্বজীবে প্রবেশ করায় নামরূপ প্রকাশ পাইল। সেই এক-মাত্র সর্ব্বশক্তিমান সৎ পরমাত্মা হইতে এইরূপে নানাবর্ণের পদার্থ এবং অসংখ্য জীবন বিকাশিত হইয়াছে। অতএব তিনিই একাকী চেতন অচেতন সকলেরই বীজ। তাঁহাকে জানিলেই চেতন অচেতন সব জানা যায়। তিনিই একমাত্র সত্য। আর নামরূপ সমুদয় মিথ্যা বাক্য মাত্র।

৮১। জীবাত্মা স্বয়ম্ভু ও স্বয়ম্প্রকাশ নহেন। তাঁহার কোন উপাদান কোথাও ছিল না। পরমাত্মাই তাঁহার বীজধাতু। পর-মাত্মার স্বরূপই তাঁহার উপাদান। অচেতন পদার্থেরও স্বতন্ত্র

উপাদান ছিল না। তাঁহার শক্তিই তাহার উপাদান। জীবাত্মার মনোবুদ্ধি ইন্দ্রিয়াদিও সেই শক্তির উৎকৃষ্টাংশসম্ভূত। ফলতঃ জীব বা জড়রূপে তিনি যে স্বয়ং পরিণত ও বিকৃত হইয়াছেন এমন উক্ত হয় নাই। স্বীয় স্বরূপের অন্যথা না করিয়া, তিনি স্বরূপের ভাণ্ডার হইতে জীবাত্মাসমূহকে প্রকাশ করিয়াছেন এবং সৃষ্টিশক্তি হইতে জড় জগৎ ও মনোবুদ্ধি ইন্দ্রিয়াদিকে জীবের ভোগার্থে সৃজন করিয়াছেন। তাঁহার সেই শক্তি স্বতন্ত্র অচেতন প্রকৃতি নহে, কিন্তু তাঁহা হইতে অস্বতন্ত্র। তাহা ঐন্দ্রিয়ক ও জড়সৃষ্টির উপাদান বলিয়া তাহাকে দ্রব্যধাতুময় কহিয়াছেন সত্য, কিন্তু বস্তুতঃ তাহা সত্য সত্যই দ্রব্যবীজ নহে। তাঁহার প্রভাবই দ্রব্যত্ব মাত্র। সুতরাং তাহাকে মায়া কহিয়াছেন। সেই মায়াশক্তি তাঁহারই শক্তি। তাহারই প্রভাব এই বাহ্য এবং মানসিক সৃষ্টি। তাঁহার স্বরূপ যেমন তাঁহার সহিত অভেদ, সেই মায়া-শক্তিও তদ্রূপ। অতএব তিনি উভয়াত্মক। স্বরূপতঃ তিনি জীবাত্মার পিতা এবং ব্রহ্মাণ্ডের নিমিত্ত কারণ। মায়া-শক্তি-বলে তিনি ঐন্দ্রিয়ক ও জড়সৃষ্টির উপাদান। তাঁহার শক্তিই যে জড় ও মনাদি হইয়া গিয়াছে এমন নহে। সেই শক্তির প্রভাবে জড় ও মনাদি উৎপন্ন হইয়াছে ইহাই অভিপ্রায়। অতএব উক্ত হইয়াছে যে সেই শক্তি জড় ও মনাদির উপাদান বটে কিন্তু মায়িক উপাদান। নিজে বিকৃত না হইয়াও জড় ও মনাদি ইন্দ্রিয়গণের আবির্ভাব দেখাইতে পারে ইহাই তাহার অনির্ব্বচনীয় ক্ষমতা। যাহাই হউক তাহা এই মানসিক ও জড় জগতের মূল প্রকৃতি বলিয়া গ্রহীত হইয়াছে। তাহা ব্রাহ্মী—শক্তিমাত্র। সেই জন্য পশ্চাতে এই বেদান্ত শাস্ত্রের উপাদানাধিকরণে ব্যাসদেব কহিয়াছেন "প্রকৃতিশ্চ প্রতিজ্ঞাদৃষ্টান্তানুরোধাৎ" (১।৪।২৩) উপরিউক্ত প্রতিজ্ঞাপূরণের অনুরোধে কহিতে হইবে যে ব্রহ্ম যেমন

জীবাত্মার স্বরূপ ও জগতের নিমিত্ত কারণ সেইরূপ তিনি প্রকৃতি অর্থাৎ ইন্দ্রিয় ও জড়সৃষ্টির মায়াবীজ। জড়বীজ নহেন, কেন না তাহা হইলে সে শক্তি জড় হইত। স্থূলসৃষ্টির অনুরোধে প্রকৃতিকে জড় বলিয়া গ্রহণ করা যায় বটে, কিন্তু প্রকৃত প্রস্তাবে তাহা মহা-মায়া-স্বরূপিণী ব্রহ্মশক্তি মাত্র। তাহার জড়ত্ব মূলতত্ত্ব নহে, কিন্তু অবান্তর কল্পনা মাত্র। সাংখ্যশাস্ত্র এই দ্রব্যময়ী সৃষ্টি-ক্রিয়ার দর্শন। তিনি সেই নিমিত্তে সর্ব্বোপাদানের বীজস্বরূপিণী প্রকৃতিকে তাহার মূলদেশে জড় রূপে দৃষ্টি করিয়াছেন। সেরূপ দৃষ্টিতে প্রকৃতি ও মহত্তত্ত্ব হইতে স্থূল বিশ্ব পর্য্যন্ত যে সৃষ্টিতত্ত্ব তদ্বিজ্ঞানের কোন ব্যাঘাত হয় না বটে। প্রকৃতি ও পুরুষের ভেদজ্ঞান-সমুদ্ভূত কৈবল্য স্বীকারেও কোন আপত্তি হয় না সত্য। কিন্তু বেদের প্রাগুক্ত প্রতিজ্ঞাটি নিষ্ফল হইয়া যায়। ফলতঃ সাংখ্যের মুখ্য তাৎপর্য্য বেদবিরোধী নহে।

৮২। অচেতন-কারণ-স্বরূপিণী প্রকৃতি হইতে অচেতন জগদুৎপত্তির যুক্তিসিদ্ধতা কেহ কখন স্বীকার করিলেও সচেতন জীবোৎপত্তির পক্ষে সেরূপ যুক্তি সংলগ্ন হইবে না। বেদের প্রতিজ্ঞানুসারে সেই অচেতন প্রকৃতির জড়ত্ব-বিজ্ঞান লাভ করিলে সেই বিজ্ঞানের দ্বারা হয়ত তদীয় বিকার-স্বরূপ সমস্ত জড় পদার্থের জ্ঞান লাভ হইতে পারে। তদীয় সাত্ত্বিক ও রাজসাংশের বিকার-স্বরূপ মানসিক প্রকৃতিরও জ্ঞানলাভ সম্ভব। কিন্তু তদ্দ্বারা জীবাত্মার জ্ঞানলাভ অসম্ভব। অথচ বেদের প্রতিজ্ঞা এই যে 'একবিজ্ঞানেন সর্ব্ববিজ্ঞানং প্রতিপদ্যতে' একবস্তুর জ্ঞান দ্বারা সকল বস্তুর জ্ঞান পাওয়া যায়। জীবাত্মা প্রকৃতির অধিকারস্থ নহেন, জড় প্রকৃতি তাঁহার উপাদান নহে, সুতরাং জড় প্রকৃতির জ্ঞানে তাঁহার তত্ত্বলাভ অসম্ভব। আর যদি জড়প্রকৃতিকে জীবাত্মার কারণ বল, তাহা হইলে জীবাত্মার জ্ঞান-স্বরূপ-তত্ত্ব সেই

কারণ-বিজ্ঞানের বিপরীত হইবে। তাহাতে তোমার কোটি নিষ্ফল হইতেছে। কেবল একমাত্র প্রাগুক্ত সৎকে চেতনাচেতন সমগ্র জগতের সর্ব্বজ্ঞ কারণ ও পরমাত্মা বলিয়া জানিলেই ঐ প্রতিজ্ঞা পূর্ণ হইতে পারে। সেই একমাত্র পরমাত্ম-বিজ্ঞান দ্বারা তাঁহার পরম-জ্ঞান-স্বরূপত্ব এবং অনির্ব্বচনীয় সৃষ্টিশক্তির মায়িক উপাদান-তত্ত্ব অবগত হওয়া যায়। সেই সব পরম গুহ্য গভীর তত্ত্বজ্ঞান লাভ হইলে জীবাত্মার অপ্রাকৃতিক, অতীন্দ্রিয়, বিশুদ্ধ ভাব অনুভূত হয়। সৃষ্টির মায়িক তত্ত্ব ও শক্তিমূলকত্ব বুঝিতে পারা যায়। তখন অবিতর্কিত রূপে এই সত্য হৃদয়ে মুদ্রিত হয় যে জ্ঞানস্বরূপ ও সর্ব্বশক্তিমান্ পরমাত্মাই একমাত্র অদ্বিতীয় সত্য ; আর, তাঁহার সৃষ্ট কর্ত্তা ও কর্ম্ম, ভোক্তা ও ভোগ্যঘটিত এই নামরূপে দীপ্যমান সংসার কেবল তাঁহার স্বরূপ ও শক্তির প্রভাব সুতরাং সমস্ত নাম-রূপ কেবল বাক্যমাত্র। এইরূপে সেই এককে জানিলে সকলের ভাব পাওয়া যায়। যাহা শুনা যায় নাই তাহা শুনা যায়, যাহা ভাবা যায় নাই তাহা বুঝা যায়, যাহা জানা যায় নাই তাহা জানা যায় এবং কিছুই জানিবার অবশিষ্ট থাকে না। এই প্রকার তত্ত্বজ্ঞান ব্যতীত বেদের প্রতিজ্ঞা রক্ষা পায় না। ফলতঃ ঐ প্রতিজ্ঞার অবিরোধেই বেদে জগৎকারণকে একমাত্র সর্ব্বজ্ঞ সর্ব্বশক্তিমান আত্মা রূপে বর্ণন করিয়াছেন। সেই শুভ অর্থই গ্রহণ করা উচিত।

৮৩। অনাত্মা প্রকৃতি যেমন "সৎ" পদের বাচ্য নহে, সেইরূপ সেই "সৎ" পরমাত্মজ্ঞানের সোপানভূত কোন অবান্তর আত্মারূপেও বেদে কথিত হন নাই। কেননা, যদি বল "হে শ্বেতকেতো। সেই যে "সৎ" তিনি জড়প্রকৃতি, তিনিই আত্মা, তিনিই তুমি" তাহা হইলে শ্বেতকেতুর তৃপ্তি হইবে না। সচেতন শ্বেতকেতুর আত্মা কখনই সেই অচেতন সৎপ্রকৃতিকে আত্মার অন্তরাত্মা বলিয়া গ্রহণ করিবে না। তাদৃশ স্থলে ঐ সৎকে হেয় পূর্ব্বক শ্বেতকেতু

তদতিরিক্ত মুখ্য আত্মার উপপযাচক হইবেক। কিন্তু বেদে উক্ত সৎকে হেয় করিয়া তদতিরিক্ত মুখ্য আত্মার উপদেশ প্রদত্ত হয় নাই। যথা অরুন্ধতী দেখাইবার জন্য লোকে যেমন তন্নিকটস্থ কোন স্থূল তারাকে অগ্রে দেখায়, পরে তাহারই অবলম্বনে মুখ্য অরুন্ধতী দেখাইয়া থাকে, তদ্রূপ প্রকৃত সৎস্বরূপ পরমাত্মাকে গ্রহণ করাইবার জন্য যদি ঐ সৎকে অচেতন বলিয়াও সোপানভূত অবান্তর আত্মা বল তাহা অযুক্ত। কেননা লোকে যেমন পূর্ব্বোক্ত স্থূল তারাকে হেয় করিয়া (পরিত্যাগ করিয়া) প্রকৃত অরুন্ধতী গ্রহণ করায়, তদ্রূপ ষষ্ঠপ্রপাঠকে "ঐ সৎ আত্মা নহে" এরূপ হেয়ত্ব বচন নাই। ফলতঃ তাদৃশ কোন হেয়ত্ববচন দ্বারা পশ্চাৎ তদতিরিক্ত মূল-আত্মা প্রদর্শন করিলেও উপরি-উক্ত প্রতিজ্ঞা নষ্ট হইত। কিন্তু সে প্রতিজ্ঞার বিন্দুমাত্র হানি হয় নাই, যেহেতু সেই সৎকেই একমাত্র জগৎ-বীজ ও মূল-আত্মা রূপে উপদেশ পূর্ব্বক পর্য্যবসান করিয়াছেন। সেই মুখ্য আত্মার প্রতি জীবাত্মার নিষ্ঠা, কেননা তিনি তাঁহার অন্তরাত্মা, জন্মস্থান, আত্মবুদ্ধি-প্রকাশক ও প্রতিপালক। তাঁহাকে লাভ করিলে জীব স্বীয় তত্ত্বও জানিতে পারেন, জড় জগতের মূলতত্ত্বও জানিতে পারেন।

৮৪। যদি জিজ্ঞাসা কর যে পরমাত্মাকে জানিলে মনুষ্য কি মনস্তত্ত্ব, আত্মতত্ত্ব, প্রভৃতি না পড়িয়াও পণ্ডিত হন? ইহার উত্তর এই যে তিনি তাদৃশ বিজ্ঞান বিষয়ে কোন পাণ্ডিত্য লাভ করেন না বটে, কিন্তু সকল তত্ত্ব সম্বন্ধে এই সার কথা জানেন যে এ সংসারে জীবের জীবত্ব ও ভোগ সমস্তই অনিত্য, স্বপ্নবৎ, বাসনার গগনে মায়া মরীচিকা ও গন্ধর্ব্ব-নগরী তুল্য ভ্রমদৃশ্যবিশেষ; কেবল একমাত্র মূল-তত্ত্ব-স্বরূপ কূটস্থ নিত্য ব্রহ্মই সত্য। তাঁহাকে জানিলে সকলই সিদ্ধি হয়। * প্রত্যুত তিনি যাহা বুঝেন অন্তে প্রত্যেক মানবের

* অতিরিক্ত পত্রসংখ্যা ২ দ্রষ্টব্য।

পক্ষে তাহাই সত্য হয়। সেই পরম জ্ঞানের তুলনায় অন্যান্য জ্ঞান-বিজ্ঞানকে ঋষিরা শিল্পনৈপুণ্য মাত্র কহিয়াছেন।

সৎ শব্দ দ্বারা যে জড়প্রকৃতি লক্ষিত হন নাই তাহা ক্রমে এই-রূপে বুঝাইলেন যথা—বেদে 'ঈক্ষণ' শব্দ আছে, জড় প্রকৃতির ঈক্ষণ অসম্ভব। যখন স্পষ্ট বাক্যে সেই সৎকে আত্মা কহিয়াছেন তখন সে ঈক্ষণের কোন রূপক অর্থ কল্পনা করা অসম্ভব। বিশেষতঃ সেই সৎকেই তন্নিষ্ঠ জীবের মোক্ষস্বরূপ অন্তরাত্মা কহিয়াছেন। অধিকন্তু বেদের প্রতিজ্ঞানুসারে ঐ সৎই মুল আত্মা। তাহা জড়-প্রকৃতি-স্বরূপ সোপানভূত কোন অবান্তর আত্মা হইলে ঐ প্রতিজ্ঞা নষ্ট হইত এবং সোপান বিধায় তাহাকে হেয় পূর্ব্বক মুখ্য আত্মার উপদেশ করিতেন, তাহা না করিয়া একেবারেই সেই সৎকে মুখ্যাত্মা বলিয়া সমাপ্ত করিয়াছেন। এইক্ষণে নিম্নস্থ সূত্রদ্বারা প্রমাণ করিবেন যে বেদে ঐ সৎই জীবাত্মার লয়স্থান ও শান্তিনিকেতন বলিয়া কথিত হইয়াছেন। জড় কখনও চেতনের লয়স্থান হইতে পারে না।

নবম সূত্র।

সূত্র। স্বাপ্যয়াৎ। ৯।

অর্থ। পরমাত্মাতে জীবের লয় হওয়ার শ্রুতি আছে। জড়-প্রকৃতিতে লয়ের শ্রুতি নাই।

তাৎপর্য্য।

৮৫। ছান্দোগ্যোপনিষদের ষষ্ঠ প্রপাঠকে অষ্টম অধ্যায়ে উক্ত হইয়াছে,

"যত্রৈতৎ পুরুষঃ স্বপিতি নাম সতা সোম্য তদা সম্পন্নোভবতি স্বমপীত ভবতি তস্মাদেনং স্বপিতীত্যাচক্ষতে স্বংহ্যপীতোভবতীতি।"

যখন এই পুরুষ 'স্বপিতি' কিনা 'নিদ্রিত' বিশেষণ গ্রহণ করেন, তখন তাঁহার স্বীয় মুখ্যস্বরূপ যে সৎ-পদ-বাচ্য পরমাত্মা তাঁহাতে তিনি বিশ্রাম করেন এবং সেই মুখ্যস্বরূপে যেন একীভূত হইয়া যান। তখন তিনি 'স্ব' স্বীয় অন্তরাত্মাতে নীত সমীকৃত বা মিলিত হন বলিয়া তাঁহাকে "স্বপিতি" বলা যায়। তখন জীবাত্মা আপনার সেই অন্তরাত্মা-স্বরূপে বিলীন হন।

এ সম্বন্ধে শারীরক ভাষ্যে যাহা আছে তাহার তাৎপর্য্য এই যে জীব যখন মন, স্থূল ইন্দ্রিয়ার্থ, ও স্থূলদেহের সহিত যুক্ত হন তখন তাঁহাকে জাগ্রত বলা যায়। যখন অগাঢ় নিদ্রাবস্থায় বিষয়-বাসনাবিষ্ট-চিত্ত হইয়া স্বীয় মানসকৃত সূক্ষ্ম সৃষ্টি ও সূক্ষ্ম দেহের সহিত রমণ করেন, তখন তাঁহাকে স্বপ্নপ্রস্থ বলা যায়। আর যখন জাগ্রত ও স্বপ্ন, অর্থাৎ স্থূল ও সূক্ষ্ম এই উভয় প্রকার উপাধির উপরমে অন্তরাত্মাতে বিলীন হন, তখন তাঁহাকে সুষুপ্ত বলা যায়।

*"আপ এব তদশিতং নয়ন্তে, তেজ এব তৎপীতং নয়ত ইতি"

জল যেমন 'অশিত' (ভুক্তান্ন) বস্তুকে সমীকৃত করায় ক্ষুধার উদ্রেক হয় সে জন্য ক্ষুধাকে "অশনা" কহে; তেজ যেমন 'পীত' (পানকৃত) উদককে বিলীন করায় পিপাসা হয় সেজন্য পিপাসাকে "উদন্য" কহে; তদ্রূপ সেই জগৎকারণ সৎ আত্মা সুষুপ্তি অবস্থায় জীবাত্মাকে সমীকৃত করেন বলিয়া তদবস্থায় জীবকে "স্বপিতি" অর্থাৎ স্বীয় মুখ্য স্বরূপ অন্তরাত্মাতে নীত, সমীকৃত বা বিলীন বলা যায়।

৮৬। যাঁহারা পরমাত্মাতে জীবাত্মার লয় হওয়ার কথা শুনিয়া ভয় পান তাঁহাদিগকে অভয় প্রদানের নিমিত্তে নিম্নে শাস্ত্রের প্রকৃত অভিপ্রায় বলা যাইতেছে। শাস্ত্রে আছে মোক্ষ, প্রলয়, ও নিদ্রা এই তিন অবস্থায় পরমাত্মাতে জীবের লয় হয়। এই সমস্ত লয়ের তাৎপর্য্য ধ্বংস নহে কিন্তু গুপ্ত। এ সূত্রে লয় শব্দ কেবল নিদ্রাকেই

লক্ষ্য করিতেছে। অতএব অগ্রে নিদ্রাবস্থারই লয়ের তাৎপর্য্য বলা যাইতেছে। জীবের দেহ ইন্দ্রিয় মনোবুদ্ধি প্রাণ সমস্তই প্রকৃতির বিকার। তৎসমুহ জীবের সাংসারিক উপাধি মাত্র। প্রকৃতি স্বয়ং তৎসমুদয়ের বীজভূমি এবং কারণ-শরীর-বাচ্য। সেই প্রকৃতি পরব্রহ্মেরই সৃষ্টিশক্তি। তাহার স্বতন্ত্র সত্তা নাই। জীবের নিদ্রাবস্থায় ঐ সমস্ত উপাধি জীবের অন্তরস্থ প্রকৃতিতে অর্থাৎ ভূতেন্দ্রিয়মনাদির বীজভূমিস্বরূপ অন্তরাত্মার আশ্রিত ব্রহ্ম-শক্তিতে গিয়া বিশ্রাম করে। জীবাত্মা স্বয়ং পরমাত্মার স্বরূপ হইতে উৎপন্ন সুতরাং তিনি সে সময়ে স্বীয় হৃদয়স্থ অন্তরাত্মাতে বিলীন হইয়া বিশ্রাম করেন। যদি ধ্বংস অভিপ্রায় হইত তবে সে নিদ্রা হইতে আর জাগরণ হইত না। নিদ্রাকালে জীবের মনাদি উপাধি সমস্ত কারণ-শরীর-রূপিণী ব্রহ্মশক্তি হইতে পুনঃ স্বাস্থ্য ও শান্তি লাভ করে। আর জীবাত্মা স্বয়ং স্বীয় মুখ্য-আত্মা স্বরূপ অন্তরাত্মাতে বিশ্রাম পূর্ব্বক আপনার চেতনানুকুল স্বাস্থ্যলাভ করিয়া থাকে।

এইরূপে পরমাত্মাকে আশ্রয় করিয়া জীবগণ স্ব স্ব শরীর মন এবং জীবাত্মার সহিত নিদ্রা যান। পরমাত্মা অপরিলপ্ত-চৈতন্য-স্বরূপ। তাঁহার নিদ্রা নাই।

> "যএষ সুপ্তেষু জাগর্ত্তি কামঙ্কামম্পুরুষোনির্ম্মিমাণঃ।
> তদেব শুক্রন্তদ্ ব্রহ্ম ইত্যাদি (শ্রুতিঃ)

এই পুরুষ যিনি নিদ্রিত প্রাণি সমুহে জাগিয়া তাহাদের অভিপ্রেত কাম্য বস্তু সকল নির্ম্মাণ করেন তিনি শুক্র তিনি ব্রহ্ম ইত্যাদি।

> "সযথা সৌম্য বয়াংসি বাসোবৃক্ষং সংপ্রতিষ্ঠন্তে।
> এবং হ বৈ তৎ সর্ব্বং পরমাত্মনি সংপ্রতিষ্ঠতে ॥ (শ্রুতিঃ)

হে সৌম্য। যেমন পক্ষি সকল প্রতি রজনীতে স্ব স্ব আবাস-

বৃক্ষকে গিয়া আশ্রয় করে সেই রূপ জীবাত্মা সমুদয় উপাধির সহিত সুষুপ্তিকালে পরমাত্মাতে গিয়া প্রতিষ্ঠিত হয়। কিন্তু তাঁহাতে বিলীন হইয়া ধ্বংস প্রাপ্ত হয় এমত অভিপ্রায় নহে। অথবা চির-নির্ব্বাণ বা ব্রহ্মত্ব লাভ করে এমন অভিপ্রায়ও নহে।

৮৭। নিদ্রা, মৃত্যু, প্রলয় ও মোক্ষ ইহার কোন অবস্থায় জীবাত্মার ধ্বংস নাই। ইহার কোন অবস্থাতেই জীবাত্মা সৃষ্টি-স্থিতিপ্রলয়কর্ত্তা ব্রহ্ম হইয়া যান না। শাস্ত্রের স্থূল অভিপ্রায় এই যে, নিদ্রাকালে জীবাত্মা স্বীয় মুখ্য স্বরূপ অন্তরাত্মাতে বিশ্রামার্থে ক্ষণিক লীন হন, সুস্থ হইয়া আবার দেহমনাদি উপাধির সহিত উত্থান করেন। এই বেদান্ত-শাস্ত্রে "সুষুপ্ত্যুৎক্রান্ত্যোর্ভেদেন" (১।৩।৪২) প্রভৃতি সূত্রে ব্যাস কহিয়াছেন যে সুষুপ্তি-কালে জীব অন্তরাত্মাতে মিলিত হইলেও তদুভয়ের মধ্যে ভেদ থাকে। মৃত্যু-কালেও জীবাত্মা ব্রহ্মেতে বা অন্য কোন পদার্থে মিশ্রিত হন না। তৎকালে তাঁহার আত্ম-স্বাতন্ত্র্য ও সূক্ষ্ম শরীর নিবন্ধন কোন রূপ দেহ লাভ পূর্ব্বক তিনি পুনরাবির্ভূত হইয়া স্বীয় সুকৃতি দুষ্কৃতির ফলভোগ করেন। প্রলয়কাল সর্ব্বভূতের ভোগক্ষয় নিবন্ধন দীর্ঘ নিদ্রা মাত্র। তখন জীবাত্মা আনন্দময় পরমাত্মাতে বিশ্রাম করেন। তাঁহার সূক্ষ্ম শরীরাদি উপাধি কারণ-শরীর-রূপিণী ব্রহ্ম-শক্তিতে বিলীন রহে। পুনঃসৃষ্টি-কালে পরমাত্মা হইতে জীবাত্মার সহিত সে সমুদয় আবির্ভূত হয়। মোক্ষকালে জীবাত্মা স্বীয় মুখ্য আত্মা-স্বরূপ ব্রহ্মেতে প্রবেশ করেন। তখন মহাজাগ্রত জ্ঞান নিবন্ধন পরিবর্ত্তনের অধীন নাম রূপ ও উপাধি সকল না থাকায় সংসারে তাঁহাকে আর নির্দ্দেশ করা যায় না, এইমাত্র। নতুবা তিনি মোক্ষা-বস্থায় একমেবাদ্বিতীয়ং ব্রহ্মের সহিত অভেদে অমৃত লাভ করেন ইহাই উক্ত হইয়াছে। তিনি আনন্দ স্বরূপ ব্রহ্মেতে প্রবেশ

অনন্ত জীবন। তাহা পৃথ্বীর ধূলি বা স্বর্গীয় জ্যোতিতে রচিত নহে, কিন্তু স্বর্গ-সুখাপেক্ষা শ্রেষ্ঠ যে ব্রহ্মানন্দ সেই ধাতুতে বিরচিত। সে মোক্ষাবস্থার জীবনকে নির্দ্দেশ করিবার কোন শব্দ এখানে নাই। এই জন্য শাস্ত্রে তাহাকে নির্ব্বাণ, লয়, লীন, ব্রহ্মভাব, স্বরূপাবস্থা, প্রভৃতি শব্দ দ্বারা বুঝাইবার যত্ন করিয়াছেন। শাস্ত্রের উপক্রম উপসংহারের সহিত সকল শব্দের সমন্বয় কর, তাহা হইলে বুঝিতে পারিবে যে মোক্ষ মহাজাগ্রত জীবন্ত অবস্থা। মোক্ষ-প্রাপ্ত জীব, ভূলোকাবধি সত্যলোক পর্য্যন্ত সপ্ত স্বর্গের পরিবর্ত্তনশীল ভোগাধিকারের বহির্গত হন। অস্থির সংসারের অধিকার হইতে অতিক্রান্ত হইয়া ব্রহ্মস্বরূপ নির্ব্বিশেষ আনন্দ-রাজ্যে প্রতিষ্ঠা লাভ করেন। সেই জন্য আমরা তাঁহাকে "নির্ব্বাণ," "লয়" প্রভৃতির মধ্যে গণ্য করি। কিন্তু মোক্ষাবস্থাকে 'বিনাশ' বলিয়া অর্থ করা কুঅর্থ। ব্রহ্ম-জ্ঞান-রসজ্ঞ পুরুষ তাহা গ্রাহ্য করিবেন না।

এক্ষণে উপরি উক্ত অবান্তর কথা পরিত্যাগ পূর্ব্বক বর্ত্তমান সূত্রের সমাহার করা যাইতেছে। পূর্ব্বে "স্বপিতি" শব্দের যেরূপ তাৎপর্য্য প্রদত্ত হইয়াছে তদনুসারে ইহাই বুঝিতে হইবে যে জীবাত্মা অন্তরাত্মাতেই লীন হইতে পারেন। তিনি চেতন পদার্থ হইয়া কখন সাংখ্যমতোক্ত অচেতন প্রধানে লীন হইতে পারেন না।

অতোযস্মিন্নপ্যয়ঃ সর্ব্বেষাং চেতনানাং তচ্চেতনং সচ্ছব্দবাচ্যং জগতঃ কারণং, ন প্রধানং।

যে মহাজাগ্রত চেতনেতে নিদ্রাকালে সকল চেতনের লয় হয় সেই চেতনই বেদোক্ত জগৎকারণ সৎ শব্দের বাচ্য। অচেতন প্রকৃতি নহে।

কেহ যেন এমন সন্দেহ না করেন যে বেদে সৎস্বরূপ আত্মা ভিন্ন কুত্রাপি প্রধান, পরমাণু, কাল, নিয়তি, স্বভাব, প্রভৃতি অন্য কোন পদার্থের জগৎকারণত্ব উক্ত হইয়াছে। যদি এরূপ সন্দেহ

উপস্থিত হয় তাহা দূর করিবার জন্য মহর্ষি ব্যাসদেব নিম্নস্থ সূত্র উপস্থিত করিতেছেন।

দশম সূত্র।

সূত্র। গতিসামান্যাৎ॥ ১০॥

অর্থ—বেদবাক্য সমুহের সমান অবগতি হেতু সর্ব্বজ্ঞ ব্রহ্মই জগৎকারণ।

তাৎপর্য্য।

৮৮। "সমানৈব হি সর্ব্বেষু বেদান্তেষু চেতনকারণাবগতিঃ" (শাঃ ভাঃ)

সৃষ্টির কারণ নির্দ্দেশ সম্বন্ধে বেদে যেখানে যত বচন আছে তৎসমস্তেরই এক বাক্যে চেতন-ব্রহ্মপক্ষে সমান অবগতি অর্থাৎ সমান তাৎপর্য্য। প্রধান, প্রকৃতি, অব্যক্ত, অনুমান, পরমাণু, অদৃষ্ট, অপূর্ব্ব, নিয়তি, বেদ, হিরণ্যগর্ভ, কাল, আকাশ, জীবাত্মা, প্রাণ, মন, প্রভৃতি যত পদার্থকে শাস্ত্রে জগৎকারণ বলিয়াছেন সে সমস্তই অবান্তর কারণ। যে যে প্রকরণে সে সকল উক্তি আছে তাহার উপক্রম উপসংহার বিচার পূর্ব্বক পাঠ করিলে সে তাৎপর্য্য অনুভূত হইবেক এবং নিঃসন্দেহে এই সিদ্ধান্ত লাভ হইবেক যে সৃষ্টি বিষয়ক সমস্ত বেদবাক্য একমাত্র, অদ্বিতীয়, সৎস্বরূপ, চৈতন্যস্বরূপ, জ্ঞানস্বরূপ, সর্ব্বশক্তিমান, নিরঞ্জন পরমাত্মাকে জগৎকারণ রূপে নির্দ্দেশ করেন। কোথাও তাঁহাকে ব্রহ্ম, কোথাও অক্ষর পুরুষ, কোথাও সৎ ইত্যাদি শব্দে কহিয়াছেন। সে সমস্ত শব্দই চৈতন্যবাচক। ফলে যে যে স্থলে তাঁহাকে আত্মা বলিয়াছেন সেখানে আর তাঁহাকে অচেতন বলিয়া কাহারো সন্দেহ জন্মিতে পারে না। সেরূপ আত্মাবাচক সৃষ্টি সম্বন্ধীয় শ্রুতি অনেক আছে। যথা।—

"আত্মা বা ইদমেকএবাগ্র আসীৎ নান্যৎ কিঞ্চনমিষৎ সঈক্ষত লোকান্নু সৃজা স ইমান্ লোকানসৃজত।"

সৃষ্টির পূর্ব্বে একমাত্র আত্মাই ছিলেন, অন্য কিছুই ছিল না। তিনি আলোচনা করিলেন লোক সকল সৃজন করিব, পরে তিনি এই সকল লোক সৃষ্টি করিলেন।

"যথাগ্নে র্জ্বলতঃ সর্ব্বা দিশোবিস্ফুলিঙ্গা বিপ্রতিষ্ঠেরন্নেবমেবৈতস্মাদাত্মনঃ সর্ব্বে প্রাণা যথাযতনং প্রতিষ্ঠন্তে, প্রাণেভ্যোদেবা দেবেভ্যোলোকা ইতি"

যেমন জ্বলন্ত অগ্নি হইতে বিস্ফুলিঙ্গ সকল সর্ব্বদিকে বিকীর্ণ হয় সেই রূপ এই আত্মা হইতে আয়তন সহিত সমস্ত প্রাণ, প্রাণ হইতে দেবতা এবং দেবতা হইতে লোক সকল উৎপন্ন হয়।

"তস্মাদ্বা এতস্মাদাত্মন আকাশঃ সংভূত ইতি"

সেই আত্মা হইতে আকাশ উৎপন্ন হইয়াছে।

"আত্মন এবেদং সর্ব্বমিতি"

আত্মা হইতে এই সমুদয় সৃষ্টি হইয়াছে।

"আত্মন এব প্রাণ জায়ত ইতি"

আত্মা হইতে প্রাণ জন্মিয়াছে।

এই সকল শ্রুতি পাঠ মাত্রেই বুঝা যায় যে যিনি জগতের কারণ তিনি আত্মা। জীবাত্মা তাঁহার আশ্রিত আত্মা। তাঁহাকে ব্যতিরেক করিলে জীব অনাত্মা হইয়া যায়। ঠিক সেই রূপ, যেমন জ্যোতিকে ব্যতিরেক করিলে নয়ন অন্ধ হয়। সৃষ্টিক্রিয়ার কর্ত্তৃত্ব হইতে আরম্ভ করিয়া জীবের অন্তর্য্যামিত্ব পর্য্যন্ত সেই পরমাত্মাকে আত্মা বলিয়া বেদশাস্ত্র তাঁহার প্রতি অচেতন সন্দেহ দূর করিয়া গিয়াছেন। যখন তাঁহাকে শ্বেতকেতুর আত্মা বলিয়াছেন তখন তাঁহাকে অচেতন জগৎকারণ বলিতে পার না। কেননা শ্বেতকেতু

সচেতন জীব, তাঁহার আত্মবুদ্ধিদাতা যে আত্মা তিনি কি অচেতন হইতে পারেন? বেদে একমাত্র সেই আত্মার আত্মা ব্রহ্মকে জগৎ-কারণ বলিয়াছেন। প্রকৃতি ও পরমাণু প্রভৃতিকে জগৎকারণ বলেন নাই। যেখানে তাহা বলিয়াছেন সেখানে অবান্তর কারণত্ব উদ্দেশ্য।

অতঃপর নিম্নে যে সূত্র অবতারিত হইবে তাহার উপক্রমণিকা স্বরূপে কিঞ্চিৎ বলা যাইতেছে। 'জন্মাদ্যস্য' সূত্রে জগৎকারণ বিধায় ব্রহ্ম 'সর্ব্বজ্ঞ' শব্দে উহ্য হইয়াছেন। 'শাস্ত্রযোনি' সূত্রে তাঁহার সর্ব্বজ্ঞত্ব যুক্তি দ্বারা প্রমাণিত হইয়াছে, যথা সর্ব্বজ্ঞানাকর বেদের যোনি বিধায় তিনি সর্ব্বজ্ঞ, আর মহামান্য বেদ তাঁহার সর্ব্বজ্ঞত্ব প্রভৃতি স্বরূপের জ্ঞাপক বলিয়াও তিনি সর্ব্বজ্ঞ। সাঙ্খ্যা-ধিকরণে 'ঈক্ষতের্নাশব্দং' অবধি 'গতিসামান্যাৎ' পর্য্যন্ত সূত্র সমূহে সিদ্ধান্ত করিয়াছেন যে বেদে যখন জগৎকারণকে সৃষ্টির ঈক্ষণকর্ত্তা, পরমাত্মা, জীবাত্মার অন্তরাত্মা, মোক্ষস্থান, নিদ্রাবস্থায় বিশ্রামস্থান এবং বার বার আত্মা শব্দে কহিয়াছেন, তখন তিনি সচেতন কারণ। কিন্তু উপরি উক্ত কোন সূত্রে বিশেষ করিয়া বেদের এমন কোন অধ্যায় বা প্রকরণ দ্বারা জগৎকারণের সর্ব্বজ্ঞত্ব সপ্রমাণ করেন নাই যাহার উপক্রমাবধি উপসংহার পর্য্যন্ত পাঠ করিলে জগৎকারণ আত্মার সর্ব্বজ্ঞত্ব ও প্রয়োজন-বিজ্ঞবানত্ব-প্রতিপাদক স্পষ্ট শ্রুতি পাওয়া যাইতে পারে। মহর্ষি ব্যাসদেব নিম্নস্থ সূত্র দ্বারা তাদৃশ বেদবাক্য সমূহকে লক্ষ্য পূর্ব্বক সেই অভাব পূরণ এবং এই সাংখ্য বিপ্রতিপত্তিবিচারাধিকরণ সমাপ্ত করিতেছেন।

একাদশ সূত্র।

সূত্র। শ্রুতত্বাচ্চ। ১১।

অর্থ। যিনি জগৎকারণ তাঁহার সর্ব্বজ্ঞত্ব বেদে শ্রুত হয়।

তাৎপর্য্য।

শ্বেতাশ্বতর উপনিষদে স্পষ্ট বাক্যে ব্রহ্মকে আত্মা, জগৎকারণ, সর্ব্বেশ্বর, দেবাধিদেব অথচ সর্ব্বজ্ঞ, সর্ব্ববিৎ, চৈতন্যময় ও আত্ম-বুদ্ধি-প্রকাশক বলিয়াছেন। জগৎকারণ ব্রহ্ম যে সর্ব্বজ্ঞ, প্রধানের পতি, জীবাত্মার পতি, এবং বিশ্বসৃষ্টির মূল কারণ তাহাই উক্ত উপনিষদের বিশেষ বক্তব্য। তাহার উপক্রম হইতে উপসংহার পর্য্যন্ত পাঠ করিলে তাহা সঙ্গতরূপে প্রতীত হইবেক। সৃষ্টি-উৎ-পত্তির কারণ দুই প্রকার। নিমিত্ত এবং উপাদান। নিমিত্ত কারণটী কর্ত্তৃপরতন্ত্র, প্রয়োজন-বিজ্ঞবান, জ্ঞানস্বরূপ এবং ঈশ্বর-পদবাচ্য। যেটি উপাদান কারণ তাহা কর্ম্মপরতন্ত্র, জড়ধর্ম্মী, বিকারী বা পরিণামী। যিনি নিজে বিকৃত বা পরিণত না হইয়া জ্ঞান পূর্ব্বক কোন কার্য্য করেন তিনি নিমিত্ত কারণ। আর যাহা স্বয়ং অবশ হইয়া কার্য্যরূপে পরিণত হয় তাহা উপাদান কারণ। কুম্ভকার ঘটের নিমিত্ত কারণ, দণ্ড চক্র সলিল সূত্র কুম্ভকারের ঘটসৃষ্ট্যর্থ করণ (যন্ত্র) এবং মৃত্তিকা ঘটের উপাদান বা পরিণামী কারণ। পরব্রহ্ম স্বরূপতঃ এই জগতের নিমিত্ত কারণ এবং জীবাত্মার জনক। স্বতন্ত্র উপাদান কারণের অভাবে তাঁহার শক্তিই জগতের উপাদান কারণ রূপে কথিত হইয়াছে। ফলে তাঁহার সে শক্তি মৃত্তিকাদি লৌকিক উপাদানের ন্যায় যে সত্য সত্যই বিকারী এমত উক্ত হয় নাই। কেননা তাহা কোন ধ্রুব সত্য দ্রব্যরূপী নহে। তাহা কেবল ঈশ্বরের অনির্ব্বচনীয় অঘটন-ঘটন-পটীয়সী সৃষ্টি-শক্তি মাত্র। তাহার আশ্চর্য্য প্রভাব, অপরিমিত বিক্রম, বিচিত্র কার্য্য। তাহার প্রভাবে কোটি কোটি ব্রহ্মাণ্ড দৃশ্যমান হইয়াছে। সেই শক্তি স্বয়ং দ্রব্যময়ী না হইয়াও এই বিপুল দ্রব্যসমষ্টিস্বরূপ বিশ্ব প্রকাশ করিয়াছে। এই বিশ্বের কোন উপাদান কারণ ছিল না। যাহা কিছু ছিল সকলই ঐ শক্তি। কাজে কাজেই সেই শক্তিকেই উপাদান কারণ বলি-

য়াছেন। কিন্তু তাহা সামান্য উপাদান কারণের ন্যায় নহে। সুতরাং তাহাকে বিবর্ত্ত উপাদান কারণ কহিয়াছেন। তাৎপর্য্য এই যে পরব্রহ্মের সেই মহতী শক্তি নিজে মূল উপাদান হইয়া আকাশ, বায়ু, জ্যোতিঃ, জল প্রভৃতি উপাদান সকল আপনা হইতে সৃষ্টি করিয়া লইয়াছে। তাহা দ্বারা ক্রমে এই ব্রহ্মাণ্ড রচিত হইয়াছে। এই ব্যাপারটি বুঝিবার দুইটি দৃষ্টি আছে। এক প্রকার দৃষ্টি এই যে সেই শক্তিই দ্রব্যশক্তি। তাহাই আদি উপাদান। তাহা হইতে মহত্তত্ত্বাবধি সংখ্যাক্রমে স্থূল জগৎ অবতীর্ণ হইয়াছে। জীবাত্মা তাহার অধিকার হইতে স্বতন্ত্র। এই দুইটি পদার্থ অর্থাৎ সেই দ্রব্যশক্তি ও জীবাত্মা—প্রকৃতি ও পুরুষ—স্বীকার করিলেই সৃষ্টিক্রিয়া অবধি মোক্ষ পর্য্যন্ত সাধিত হয়। দুইয়ের যোগে সংসার এবং বিয়োগে মোক্ষ। ঐ পুরুষই বন্ধমোক্ষের ভাগী। ঐ দ্রব্যশক্তি বা প্রকৃতির চেতনত্ব কল্পনা বা চৈতন্য-মূলকত্ব সংস্থাপনের প্রয়োজন নাই। কেন না তাহা সর্ব্বশক্তি ও সর্ব্বগুণের আধার এবং সৃষ্টির একমাত্র মূল কারণ। এই দৃষ্টির নাম সাংখ্য দৃষ্টি। দ্বিতীয় প্রকার দৃষ্টি এই যে উহা স্বয়ংসিদ্ধ বা জড় নহে, কিন্তু ঈশ্বরের সৃষ্টিশক্তি। ঐ অনির্ব্বচনীয় শক্তি সহকারে ঈশ্বর ব্রহ্মাণ্ড রচনা করেন। অতএব উক্ত শক্তিতে শক্তিমানরূপে ঈশ্বরই জগৎকারণ। তাহাকে প্রকৃতি বল, অব্যক্ত বল, প্রধান বল, সর্ব্বপদার্থের অণু বা পরমাণুরূপী বীজ বল তাহাতে আপত্তি নাই। কিন্তু ইহা বলিতেই হইবে যে ঈশ্বরই এই জগতের মূল কারণ এবং প্রকৃতি তাঁহারই সৃষ্টি-শক্তি। এই দৃষ্টির নাম ব্রহ্ম-দৃষ্টি। ব্রহ্মদৃষ্টিতে জগৎ মায়িকাবির্ভাব মাত্র। কেন না তাহার দ্রব্যময় কোন সত্য উপাদান ছিল না। ঈশ্বরের শক্তি হইতেই দ্রব্যময় রূপ প্রকাশিত হইয়াছে। সুতরাং ব্রহ্মই সত্য, জগৎ মায়াময়। ব্রহ্মের আশ্চর্য্য শক্তি। তদ্দ্বারা তিনি না করিতে পারেন এমন কার্য্যই নাই। যে সকল দ্রব্যময় আবি-

র্ভাবের কোন দ্রব্য-বীজ ছিল না, তিনি শক্তি প্রকাশ করিলেন, আর তৎক্ষণাৎ সে সমস্ত স্বপ্নের ন্যায় দেদীপ্যমান হইল। সুতরাং ব্রহ্মদ্রষ্টা বেদান্ত বলেন যে তাঁহার সেই শক্তি মহামায়ারূপিণী। তাহাই সমস্ত জগতের ও মানস রাজ্যের মায়াময় উপাদান কারণ। কিন্তু জীবাত্মা সে শক্তির অতীত। তিনি ব্রহ্মের স্বরূপোৎপন্ন। তিনি ঐ মায়ার যোগে বদ্ধ—বিয়োগে মুক্ত।

৯০। এই সকল বৈদান্তিক দৃষ্টি প্রতিপাদন করার উদ্দেশে শ্বেতাশ্বতর উপনিষদের প্রথমেই প্রশ্ন আছে।

"কিং কারণং ব্রহ্ম" ইত্যাদি।

ব্রহ্ম কোন্ প্রকার কারণ? ইত্যাদি

এই প্রশ্নের উত্তরে প্রথমাধ্যায়ের তৃতীয় মন্ত্রে কহিয়াছেন।

"দেবাত্মশক্তিং স্বগুণৈর্নিগূঢ়াম্ যকারণানি নিখিলানি তানি কালাত্মযুক্তান্যধিতিষ্ঠত্যেকঃ।"

পরমাত্মার শক্তি যাহা পরমাত্মার সর্ব্বজ্ঞত্ব ও সর্ব্বেশ্বরত্ব প্রভৃতি গুণের দ্বারা নিগূঢ় তাহাই এই সৃষ্টির কারণ। সেই শক্তি স্বতন্ত্র ও স্বয়ংসিদ্ধ নহে। তাহা সেই পরম দেবতারই আত্মশক্তি। তাহাই প্রকৃতি। যিনি সেই এক অদ্বিতীয় কারণ তিনি পরমাত্মা। তিনি স্বরূপে ও শক্তিরূপে অবস্থিত। স্বরূপে তিনি নিমিত্ত কারণ এবং আত্মার জনক। শক্তিরূপে তিনি জড় ও ঐন্দ্রিয়ক জগতের উপাদান কারণ। তিনি কাল, স্বভাব, প্রকৃতি, জৈবিক অদৃষ্ট, প্রভৃতি অবান্তর কারণ সমূহকে নিয়মিত করেন। অতএব পরমাত্মাই এই সংসারের একমাত্র সর্ব্বগুণযুক্ত কারণ। অন্য কাহারো জগদুৎপাদনের শক্তি নাই।

ইত্যাদি উপক্রমানন্তর বহু উপদেশের পর গ্রন্থশেষে ষষ্ঠাধ্যায়ে সমাহার করিয়াছেন। যথা—

যেনাবৃতং নিত্যমিদং হি সর্ব্বং জ্ঞঃ কালকারো গুণী সর্ব্ববিদ্যঃ।
তেনেশিতং কর্ম্ম বিবর্ত্ততেহ পৃথ্ব্যাপ্‌তেজোনিখিলানি চিন্ত্যম্‌ ॥ ২ ॥

যাঁহার দ্বারা এই ব্রহ্মাণ্ড নিত্যকাল আবৃত রহিয়াছে তিনি সর্ব্বজ্ঞ, কালের সৃষ্টিকর্ত্তা সর্ব্বগুণের ঈশ্বর এবং সর্ব্ববিৎ। তাঁহার আদেশে এই জগৎ বিবর্ত্তিত হইতেছে। প্রথমাধ্যায়ে যে পৃথ্বী অপ্‌ তেজ বায়ু আকাশাদিকে জগৎকারণ বলিয়া সংশয় হইয়া ছিল তাহা এখানে নিরস্ত হইল।

ন তস্য কার্য্যং করণঞ্চ বিদ্যতে ন তৎ সমশ্চাভ্যধিকশ্চ দৃশ্যতে।
পরাস্য শক্তির্বিবিধৈব শ্রূয়তে স্বাভাবিকী জ্ঞানবলক্রিয়া চ ॥ ৮ ॥

তাঁহার শরীর ও ইন্দ্রিয় নাই। কাহাকেও তাঁহার সমান বা তাঁহা হইতে অধিক দেখা যায় না। তাঁহার বিচিত্র ও মহতী শক্তি সর্ব্বত্র শ্রুত হয়। তাঁহার জ্ঞানক্রিয়া ও বল-ক্রিয়া স্বভাবসিদ্ধ।

ন তস্য কশ্চিৎ পতিরস্তি লোকে। ন চেশিতা নৈব চ তস্য লিঙ্গং।
সকারণং করণাধিপাধিপো ন চাস্য কশ্চিজ্জনিতা ন চাধিপঃ ॥ ৯ ॥

জগতে তাঁহার কেহ পতি নাই এবং নিয়ন্তাও নাই। তাঁহার কোন সুক্ষ্ম অবয়বও নাই। তিনি সকলের কারণ। ইন্দ্রিয় প্রভৃতি করণগণের অধিপতি যে মন তিনি তাহারও অধিপতি। তাঁহার কেহ জনক নাই এবং অধিপতিও নাই।

একোদেবঃ সর্ব্বভূতেষু গূঢ়ঃ সর্ব্বব্যাপী সর্ব্বভূতান্তরাত্মা
কর্ম্মাধ্যক্ষঃ সর্ব্বভূতাধিবাসঃ সাক্ষী চেতা কেবলোনির্গুণশ্চ ॥ ১ ॥

এক যে পরমেশ্বর তিনি সর্ব্বভূতেতে গূঢ়রূপে স্থিতি করিতেছেন, তিনি সর্ব্বব্যাপী ও সর্ব্বভূতের অন্তরাত্মা। তিনি সর্ব্বপ্রাণিকৃত সর্ব্বপ্রকার কর্ম্মের অধ্যক্ষ। তিনি সর্ব্বভূতের আশ্রয়। তিনি সকলের সাক্ষী, সকলের চেতা, সঙ্গশূন্য, কৈবল্যস্বরূপ, এবং সত্ত্বাদি জড়গুণ-রহিত।

সবিশ্বকৃদ্বিশ্ববিদাত্মযোনিঃ জ্ঞঃ কালকালোগুণী সর্ব্ববিদ্যঃ।
প্রধানক্ষেত্রজ্ঞপতির্গুণেশঃ সংসারমোক্ষস্থিতিবন্ধহেতুঃ। ১৬।

তিনি বিশ্বকর্ত্তা, বিশ্ববেত্তা, জীবাত্মার প্রভবস্থান, জ্ঞানবান্, কালের কর্ত্তা, গুণবান্, ও সর্ব্ববিৎ। তিনি প্রধানের পতি, জীবাত্মার পতি, সত্বাদি গুণের ঈশ্বর এবং সংসার মোক্ষ, স্থিতি, বন্ধের হেতু।

সতন্ময়োহ্যমৃত ঈশসংস্থোজ্ঞঃ সর্ব্বগোভুবনস্যাস্য গোপ্তা
য ঈশেহস্য জগতোনিত্যমেব নান্যোহেতুর্ব্বিদ্যতে ঈশনায়। ১৭।

তিনি চৈতন্যময় অমৃত এবং সর্ব্বস্বামীরূপে সম্যক্ স্থিতি করিতেছেন। তিনি সর্ব্বজ্ঞ, সর্ব্বত্রগামী, এবং এই ভুবনের প্রতিপালক। যিনি এই জগৎকে নিত্য নিয়মে রাখিয়াছেন, তিনি ভিন্ন বিশ্বশাসনের অন্য হেতু নাই।

যোব্রহ্মাণং বিদধাতি পূর্ব্বং যোবৈ বেদাংশ্চ প্রহিণোতি তস্মৈ
তং হ দেবমাত্মবুদ্ধিপ্রকাশং মুমুক্ষুর্ব্বৈ শরণমহং প্রপদ্যে। ১৮।

যিনি সৃষ্টির আদিতে ব্রহ্মাকে সৃজন করিয়াছেন। যিনি তাঁহার হৃদয়ে বেদ সকলকে প্রকাশ করিয়াছেন, আমি মুমুক্ষু হইয়া সেই আত্ম-বুদ্ধি-প্রকাশক পরমেশ্বরের শরণাপন্ন হই। অর্থাৎ যিনি পূর্ব্বে সকল জীবাত্মার মনোবুদ্ধি ইন্দ্রিয় প্রভৃতি সুক্ষ্মদেহের প্রকাশক স্বরূপে আপনাকে হিরণ্যগর্ত্ত, ব্রহ্মা, বা মহত্তত্ত্ব নামে সৃজন করিয়াছিলেন, যিনি প্রত্যেক জীবের বুদ্ধিতে পরিবেষণ জন্য বেদ-পদ-বাচ্য সকল জ্ঞান স্বকীয় সেই হিরণ্যগর্ত্ত বা মহত্তত্ত্বরূপ সমষ্টিবুদ্ধিতে সমর্পণ করিয়াছিলেন, আমি মোক্ষাভিলাষী হইয়া সেই সর্ব্বজীবের আত্মবুদ্ধিপ্রকাশক দেবতার শরণাপন্ন হই।

৯১। উপরি উক্ত বেদবচন সমূহ হইতে জগৎকারণ আত্মার সর্ব্বজ্ঞত্ব ও প্রয়োজন-বিজ্ঞবানত্ব সুন্দররূপে সংগৃহীত হইতেছে।

যথা 'দেবাত্মশক্তিং' যিনি জগৎকারণ তিনি আত্মা, প্রকৃতি তাঁহারই শক্তি, এবং পরমাত্মাই একমাত্র সর্ব্বগুণ-যুক্ত কারণ। তাঁহার সৃষ্টির বহির্ভূত অন্য কোন পদার্থ নাই। তিনি 'কালকারঃ' কালের স্রষ্টা, তিনি 'গুণী' সর্ব্বগুণের প্রকাশক, প্রকৃতির গুণ তাঁহার সৃষ্ট। তিনি 'জ্ঞঃ' সর্ব্বজ্ঞ এবং সর্ব্ববিৎ। পৃথ্বী, অপ, তেজ প্রভৃতি ভূত-গণও জগৎকারণ নহে। তাহারা তাঁহারই সৃষ্ট। শরীর, ইন্দ্রিয়, পঞ্চভূত, প্রাণবায়ু প্রভৃতি কাহারই তিনি অধীন নহেন। তিনি একাকী সর্ব্বকারণ, 'ন তস্য কার্য্যং' তিনি সৃষ্টিরূপ ক্রিয়া-প্রকাশের জন্য কার্য্যরূপী হন নাই, অর্থাৎ বিরাটাদি শরীর ধারণ করেন নাই। 'ন করণঞ্চ' কুম্ভকারের যেমন দণ্ড চক্র সলিল সূত্র 'করণ' (যন্ত্র), তাঁহার তাদৃশ কোন 'করণ' নাই। তাঁহার শক্তি পরা ও বিবিধা, তাঁহার জ্ঞানক্রিয়া ও বলক্রিয়া স্বভাবসিদ্ধ ইহা সর্ব্ববেদে কহেন। তাঁহার জ্ঞান যোগীদিগের জ্ঞানের ন্যায় জড়প্রকৃতির গুণ-সম্পাদিত নহে। তাঁহার বলক্রিয়াও প্রাকৃতিক-শক্তি-জনিত নহে। সে সমস্ত তাঁহার স্বীয় স্বভাবসিদ্ধ। তাঁহার মুলে কোন কারণরূপ অধিপতি, তাঁহার বীজরূপে কোন কারণশরীর বা লিঙ্গশরীর নাই। তিনিই কারণ, 'সকারণং'। সকলের 'করণাধিপঃ' যে মন তিনি তাহারও অধিপতি। তিনি 'একোদেবঃ' অথচ 'সর্ব্বভুতান্তরাত্মা'। তিনি 'কর্ম্মাধ্যক্ষঃ'। যদি বল ফলপ্রদ কর্ম্মই সংসারের হেতু সে জন্য কহিলেন তিনিই কর্ম্মাধ্যক্ষ। কর্ম্ম অচেতন, ফলদাতা তিনি। তিনি 'সাক্ষী' সকল কর্ম্মের জীবন্ত পরিদর্শক। 'চেতা' সকলের চেতয়িতা জ্ঞানদাতা। তিনি 'কেবলঃ' অসঙ্গ। তিনি মোক্ষাধিকারে কৈবল্য স্বরূপ। 'নির্গুণশ্চ' তিনি প্রকৃতির গুণের স্রষ্টা হইয়াও স্বয়ং তাহাতে লিপ্ত নহেন। 'সবিশ্বকৃৎ' এমন যে পরমেশ্বর তিনিই বিশ্বসৃজন করিয়াছেন, 'বিশ্ববিৎ' তিনি বিশ্বকে সর্ব্বতোভাবে জানেন, 'আত্মযোনিঃ' জীবাত্মার জন্মস্থানস্বরূপ মহানাত্মা,

'জ্ঞঃ' সর্ব্বজ্ঞ, 'প্রধানপতিঃ' প্রকৃতির প্রকাশক, 'ক্ষেত্রজ্ঞপতিঃ' জীবাত্মার প্রকাশক, এবং ,সংসাররূপ বন্ধন ও মোক্ষরূপ স্বাধীনতার হেতু।

"তস্মাৎ সর্ব্বজ্ঞং ব্রহ্ম জগতঃ কারণং। নাচেতনং প্রধানমন্যদ্বেতি সিদ্ধং।" (শাঃ ভাঃ)

এতাবতা সর্ব্বজ্ঞ ব্রহ্মই জগতের কারণ। অচেতন প্রকৃতি বা অন্য কিছু জগৎ-কারণ নহে ইহা সপ্রমাণ হইল।

৯২। পরব্রহ্মের সর্ব্বজ্ঞত্ব সম্বন্ধে আরো কিঞ্চিৎ না বলিয়া এ অধিকরণ সমাপ্ত করিতে পারি না। পূজ্যপাদ শঙ্করাচার্য্য ব্রহ্মসূত্রের লক্ষিত স্পষ্টার্থ-প্রতিপাদক বেদবাক্য অবলম্বন পূর্ব্বক এ স্থানে পরব্রহ্মের যে সর্ব্বজ্ঞত্ব স্থাপন করিলেন তাহার প্রকারান্তর ব্যাখ্যা মাণ্ডুক্যোপনিষদে দৃষ্ট হয়। সেই ব্যাখ্যার সহিত এই সকল সূত্রের তাৎপর্য্য সমন্বয় পূর্ব্বক পাঠ করিলে এ সম্বন্ধে বেদান্তের অভিপ্রায় উত্তমরূপে বুঝা যাইবে।

উক্ত উপনিষদে দ্বিতীয় শ্রুতিতে আছে 'সর্ব্বং হ্যেতদ্ব্রহ্ম' এই সমস্তই ব্রহ্ম। এই শ্রুতিবাক্য ইতিপূর্ব্বের ব্যাখ্যাত "সৎ" শব্দকেই প্রকারান্তরে নির্দ্দেশ করিতেছে। ছান্দোগ্যের প্রতিজ্ঞা এই যে সেই "সৎ" কে জানিলেই সব জানা যায়। এখানেও সেই প্রতিজ্ঞা ফলিতেছে। "এই সমস্ত জগৎই ব্রহ্ম।" কেন না মূলেতে "সৎ" পদবাচ্য ব্রহ্মরূপ বীজ ছিলেন। তিনিই বস্তু হওয়ায় "এই সমস্ত বস্তুই ব্রহ্ম" এরূপ বলা যাইতে পারে। কিন্তু শুদ্ধ তাহা বলিলে বেদান্তবাক্যের সঙ্গতি থাকে না। যদি আপত্তি করা যায় যে ঐ ব্রহ্মটি জড়প্রকৃতি, উপাদানকারণ, এবং পরিণামী মূলতত্ত্ব, তাহা হইলেই বেদান্ত অপদস্থ। বেদান্তের অন্তরের কথা এই যে তিনি সচেতন কারণ সুতরাং স্বয়ং কিছু হন নাই। ঐ অন্তরের কথাটী ঐ শ্রুতির মধ্যে ও শেষাংশে কহিয়াছেন। যথা

'অয়মাত্মাব্রহ্ম।' ব্রহ্ম জড় নহেন কিন্তু এই প্রত্যক্ষ আত্মা। এ কথাতেও আপত্তি গেল না। কারণ সন্দেহ হইতে পারে তিনি কি তবে জীবাত্মা? এই জন্য সমাহার বাক্য দিতেছেন, যথা 'সোঽয়মাত্মা চতুষ্পাৎ" এই আত্মা চারি পদে বিভক্ত। উত্তরোত্তর শ্রুতি সমুহে ঐ কথার ব্যাখ্যা আছে।—যথা—

৯৩। জীবের জাগ্রত অবস্থায় স্থূল শরীরের প্রভাব, স্থূল ভোগের প্রভাব এবং স্থূল জগতের প্রভাব। সেই জাগ্রদবস্থাপন্ন সোপাধিক জীবাত্মার সত্তা এবং স্থূল জগতের সত্তা পরমাত্মার আশ্রিত। পরমাত্মা প্রকাশ না করিলে তাহা প্রকাশ পায় না। ঐ প্রকাশকার্য্য সাধনের নিমিত্তে জীবাত্মাতে ও স্থূল জগতে পরমাত্মার যে অধিষ্ঠান তাহাই আত্মার 'প্রথমপাদ বৈশ্বানর' বা 'বিরাট' শব্দে কথিত হয়। পরমাত্মার এই অধিষ্ঠানটী কি স্থূল জগৎ? উপরিউক্ত ব্যাখ্যা উত্তর দিতেছে যে, উহা স্থূল জগৎ নহে, কিন্তু স্থূল জগতের আত্মা। দ্বিতীয়তঃ ঐ অধিষ্ঠানটী কি জাগ্রদবস্থার স্থূলভুক্ জীবাত্মা? ঐ ব্যাখ্যাই উত্তর দিতেছে যে উহা জাগ্রদবস্থার স্থূলভোগী জীবাত্মাও নহে কিন্তু তাহার অন্তঃরাত্মা ও তাহার স্থূল দেহের নিয়ামক। তৃতীয়তঃ ঐ অধিষ্ঠানটী কি জগৎকারণ ও সর্ব্বজ্ঞ ব্রহ্ম? ইহার উত্তর এই যে, যে অধিষ্ঠান স্থূলে, তাহা কারণ ও সর্ব্বজ্ঞ পদবাচ্য হইতে পারে না কেন না, স্থূলের মুলে সুক্ষ্ম সৃষ্টি আছে। যথা—

জীবের স্বপ্নাবস্থা সুক্ষ্ম দেহের পরিচয় দেয়। তখন জীব ঈশ্বর নিয়মিত মানসিক শক্তিবলে কেবল মনের কর্তৃত্বে এবং কেবল মনেরই উপাদানে আপনার স্বপ্নদেহ বিন্যাস করে, সুক্ষ্ম ভোগ্য রচনা করে এবং সুক্ষ্ম ভাবে তাহা ভোগ করে। বেদান্তের সিদ্ধান্ত এই যে পরমাত্মার আশ্রয় ভিন্ন জীব তাহা করিতে পারে না। অতএব পরমাত্মা এ অবস্থায়ও জীবের অন্তর্যামি ও নিয়ামকরূপে

অধিষ্ঠিত। তদ্রূপ স্থূল সৃষ্টি প্রকটিত হওয়ার পূর্ব্বে সৃষ্টি যখন বিভাগক্রমে পঞ্চতন্মাত্র ও সূক্ষ্ম ইন্দ্রিয়ের সহিত এবং মনোবুদ্ধি ও প্রাণের সহিত সূক্ষ্মরূপে অবস্থিতি করে, তখনও পরমাত্মা তন্মধ্যে নিয়ন্তারূপে অধিষ্ঠান করেন। জীবের সূক্ষ্মদেহে বা সৃষ্টির সূক্ষ্মাবস্থায় পরমাত্মার এই যে অধিষ্ঠান তাহা আত্মার 'তৈজস' বা 'হিরণ্যগর্ভ' নামক দ্বিতীয় পাদ। এই 'তৈজসাত্মা' কি সূক্ষ্ম জগৎ? তিনি কি স্বয়ং সূক্ষ্মাবস্থার বা স্বপ্নাবস্থার সোপাধিক জীবাত্মা? অথবা তিনি কি সর্ব্বজ্ঞ জগৎকারণ? উপরিউক্ত ব্যাখ্যা দ্বারা বুঝা যাইতেছে যে, তিনি সূক্ষ্ম জগতের, সূক্ষ্মদেহের, ও সূক্ষ্মদেহাবচ্ছিন্ন সোপাধিক জীবাত্মার অন্তরাত্মা ও নিয়ামক মাত্র। নতুবা তিনি স্বয়ং সূক্ষ্মজগৎও নহেন, সূক্ষ্ম উপাধিগত জীবাত্মাও নহেন। অতঃপর সেই অধিষ্ঠানকে সর্ব্বজ্ঞ জগৎকারণও বলা যাইতে পারে না। কেন না সূক্ষ্মের মূলে কারণাবস্থা আছে। যথা—

জীবের সুষুপ্তি অবস্থায় কেবল কারণ শরীরের প্রভাব তখন স্থূল সূক্ষ্ম দেহ কার্য্য করে না এবং স্থূল সূক্ষ্ম কোন ভোগও থাকে না। তখন জীবাত্মা পরমাত্মাতে নিদ্রা যান। তখন সমস্তই একীভূত। এক ঘোরা রজনী। সে অবস্থাতেও পরমাত্মা জীবের অন্তর্যামিরূপে অধিষ্ঠিত। জীবের কারণাবস্থারূপ ঘন নিবিড় উপাধি যে প্রকার এই সুষুপ্তি অবস্থা তাহারই প্রতিকৃতি। সূক্ষ্ম ও স্থূলাবস্থার আদিতে এই চেতনাচেতন জগৎও ঐরূপ নিশ্চেষ্ট, গভীর ও অবিভক্ত অবস্থায় থাকে। তখন নামরূপ ও ভেদজাত থাকে না। তখন সকলই একীভূত। এক ঘোরা মহা রজনী। সে রজনীতে সর্ব্ব জীবের ও সর্ব্বজগতের অন্তর্যামিরূপে যে ব্রহ্মাধিষ্ঠাতৃত্ব বিদ্যমান থাকিয়া সমগ্র কারণাবস্থাকে রক্ষা করেন, সেই অধিষ্ঠানটি আত্মার 'প্রাজ্ঞ বা সর্ব্বজ্ঞ' নামক তৃতীয় পাদ। এই অধিষ্ঠান কি কারণাবস্থার সোপাধিক জীবাত্মা? এই অধিষ্ঠান কি

অপ্রকটিত কারণীভূত জড় জগৎ? প্রাগুক্ত ব্যাখ্যায় প্রতিপন্ন করিতেছে যে আত্মার সে অধিষ্ঠান তাদৃশ সুষুপ্ত বা প্রলয়-নিদ্রাভিভূত সোপাধিক জীবাত্মাও নহে এবং জগতের উপাদান কারণস্বরূপ কোন দ্রব্যধাতুও নহে। এখন প্রশ্ন এই যে এই কারণপাদস্থ পরমাত্মাধিষ্ঠান কি সর্ব্বজ্ঞ? উত্তর হাঁ, তিনিই সর্ব্বজ্ঞ।

"এষ সর্ব্বেশ্বর এষ সর্ব্বজ্ঞ এষোন্তর্যাম্যেষ যোনিঃ।
সর্ব্বস্য প্রভবাপ্যয়ৌ হি ভূতানাং" (মাণ্ডুক্যে ৬) ॥

জগতের কারণাবস্থার মূলে অন্য কোন অবস্থা না থাকায় ইনিই সর্ব্বেশ্বর, সমস্ত ভেদজাতের ঈশ্বর, ইনিই 'সর্ব্বজ্ঞ' সর্ব্বভেদাবস্থার জ্ঞাতা, ইনিই 'অন্তর্যামী' সর্ব্বভূতের অন্তরে থাকিয়া তাহাদিগকে নিয়মিত করেন, ইনিই 'যোনি' ইনি সমস্ত ভেদজাতের জন্মস্থান। এবং সর্ব্ব ভূতের প্রভব ও অপ্যয়ের কারণ।

এতাবতা পরমাত্মা কোন অবস্থায় স্বয়ং জগতও হন নাই, জীবও হন নাই। তিনি কারণাবস্থাতেও জীবাত্মার অন্তর্যামী মাত্র। তিনি সর্ব্বকাল ও সর্ব্বাবস্থাতেই জীবাত্মার অন্তরাত্মা। সুতরাং তিনি সচেতন আত্মা এবং জীবাত্মার প্রাণবিধায় তিনিই প্রত্যক্ষ আত্মা। জীবাত্মার সুষুপ্তি এবং প্রলয়কালীন কারণাবস্থাতে তিনি সাক্ষীরূপে উপহিত থাকেন বলিয়া তিনি সর্ব্বজ্ঞ এবং সেই অবস্থা অবধি স্থূলাবস্থা পর্য্যন্ত সর্ব্বাবস্থাকে নিয়মিত করেন বলিয়া তিনি সর্ব্বেশ্বর শব্দের বাচ্য। এ পর্য্যন্ত আত্মার যে তিন পাদ উক্ত হইল, তাহার মধ্যে কোন পাদই যে স্বয়ং জীবাত্মা বা জগৎ নহে তাহা বুঝা গেল। এক্ষণে আত্মার চতুর্থ পাদটি কিপ্রকার তাহা বলা যাইতেছে।

৯৪। মাণ্ডুক্যোপনিষদের 'নান্তঃপ্রজ্ঞং' প্রভৃতি শ্রুতিতে কহিয়াছেন যে সেই পাদটী 'প্রপঞ্চোপশমং' জাগ্রত, স্বপ্ন, সুষুপ্তি বা স্থূল সূক্ষ্ম কারণ কোন অবস্থায় লিপ্ত নহে। তাহা প্রকৃতির

অতীত এবং মায়া-রাজ্যের ঊর্দ্ধে প্রতিষ্ঠিত। প্রলয়াবস্থা, অঙ্কুরাবস্থা, ও ব্যক্তাবস্থা ইহার কিছু না থাকিলেও ঐ পাদ বিদ্যমান থাকে। ঐ পাদ অবিদ্যা-সংস্পর্শ-শূন্য অনাদি অনন্ত জাগ্রত-স্বভাব পরমচৈতন্য স্বরূপ। তাহা 'অগ্রাহ্য' বুদ্ধির অগম্য, 'অলক্ষণ' কোন লক্ষণদ্বারা নিরূপণের অযোগ্য, 'অব্যপদেশ্য' কোনরূপ নির্দ্দেশের বিষয় নহে, 'অচিন্ত্যং' চিন্তা, ধ্যান; প্রভৃতি মানস ব্যাপারের বিষয় নহে। তাহা 'একাত্মপ্রত্যয়সারং' একমাত্র আত্মপ্রত্যয়ের গম্য। 'সেই পাদটি একমাত্র আত্মারূপে আছেন,' সকলেরই আত্মা তন্নিষ্ঠ বিধায় তাঁহাকে প্রমাণ করিতেছে। সেই পাদ 'অদ্বৈত', দ্বৈতস্বরূপ সৃষ্টির সর্ব্বাবস্থার অতীত বিধায় তাহা 'অদ্বিতীয়' অর্থাৎ একমাত্র। 'স আত্মা' তাহাই আত্মা। পরমাত্মার জগদন্তর্যামিত্ব কেবল কারণাবধি স্থূলপর্য্যন্ত পরিবর্ত্তনশীল উপাধিতে বিদ্যমান, কিন্তু সেই অনিত্য উপাধি সমস্ত হইতে স্বতন্ত্র করিয়া দেখিলে তাঁহার যে শুদ্ধ ভাব পাওয়া যায় তাহাই 'আত্মা' শব্দের বাচ্য। তিনিই সৎপদবাচ্য। 'সবিজ্ঞেয়ঃ' তিনিই মোক্ষাধিকারে জানিবার যোগ্য। তিনিই মুখ্য আত্মা। এইটীই বেদান্তের অন্তরের কথা।

'সংবিশতি আত্মনা স্বেনৈব স্বং পরমার্থিকং য এবং বেদ'।

যিনি এপ্রকার জানেন তিনি স্বীয় মুখ্য স্বরূপ সেই পারমার্থিক আত্মাতেই প্রবেশ করেন। অর্থাৎ তাঁহার জীবাত্মা প্রকৃতির অধিকার হইতে উত্তীর্ণ হইয়া স্বীয় পারমার্থিক ও পরমাত্মীয় আনন্দ-রাজ্যে প্রবেশ করেন। তাঁহার জীবাত্মা ব্রহ্মাত্মভাবরূপ অমৃত লাভ করেন, অপরিলুপ্ত জাগ্রদবস্থায় উপনীত হন এবং এ সংসার হইতে তাঁহাকে নির্দ্দেশ করিবার কোন উপায় থাকে না। যদি জিজ্ঞাসা কর যে ঐ চতুর্থ পাদ স্বরূপ যে আত্মা তিনিই কি স্বয়ং এই মোক্ষাবস্থার জীবাত্মা? ইহার উত্তর এই যে যেমন স্থূল সূক্ষ্ম কারণাবস্থায় তিনি জীবাত্মার অন্তরাত্মা সেইরূপ মোক্ষাব-

স্থাতেও তিনি জীবাত্মার আত্মাস্বরূপ। সে অবস্থায় জীবাত্মা স্পষ্টরূপে তাঁহাতেই আপনার সত্তা দর্শন করায় এবং সেই আত্ম-বুদ্ধি-প্রকাশক মুখ্য আত্মার প্রতি জীবাত্মার অক্ষুব্ধ মমতা-বুদ্ধির উদয় হওয়ায়, আদরবতী শ্রুতি তাঁহাকেই একমাত্র আত্মারূপ কহিয়াছেন। বিশেষতঃ যখন কিছুই ছিল না, কেবল সেই আত্মাই ছিলেন, এবং সেই আত্মা হইতেই জীবাত্মা সকল উৎপন্ন হইয়াছে, তখন তাঁহাকেই মুখ্য আত্মারূপে হৃদয়ঙ্গম করা জীবের চরম জ্ঞান। মোক্ষাবস্থায় সেই জ্ঞানটী উদিত হয় বলিয়া ব্রহ্মগুণকীর্ত্তনকারিণী শ্রুতিগণ পরমাদর পূর্ব্বক ন্যায্যরূপে তাঁহাকেই আত্মা বলিয়া প্রচার করিয়াছেন যিনি প্রাণের প্রাণ, মনের মন, চক্ষুর চক্ষু এবং আত্মার আত্মা।

এস্থলে জ্ঞাপনীয় এই যে এই আত্মার চতুর্থ পাদটীই ছান্দো-গ্যের 'সৎ' পদবাচ্য আত্মা। তিনিই একমাত্র অদ্বিতীয় জগৎবীজ। তিনি স্বীয় আত্মা স্বরূপ হইতে অসংখ্য জীবাত্মা উৎপন্ন করিয়াছেন। স্বীয় অনির্ব্বচনীয় শক্তিদ্বারা কারণাবস্থাবধি স্থূলাবস্থা পর্য্যন্ত জগৎ উৎপন্ন করিয়াছেন। জীবাত্মাতে ও সর্ব্ব জগতে প্রবেশ পূর্ব্বক স্বীয় সত্তারূপ জ্যোতি দ্বারা তৎসমুদয়কে প্রকাশ করিয়াছেন। এইরূপে যিনি স্বরূপতঃ এক হইয়াও অনেকের ন্যায় হইয়াছেন * তিনিই 'সৎ' এবং আত্মা। এই কারণে 'সর্ব্বং হ্যেতৎ ব্রহ্ম' এই সমস্ত জগৎ ব্রহ্ম, 'অয়মাত্মা ব্রহ্ম' এই আত্মাই ব্রহ্ম এই প্রকার শ্রুতি বাক্যের প্রেরণা হইয়াছে। এই জন্যই উক্ত হইয়াছে যে সেই মূল ও বীজকে জানিলে সব জানা যায়। নতুবা, স্বরূপতঃ তিনি একমাত্র অদ্বিতীয়, 'নেহ নানাস্তি কিঞ্চন' তাঁহাতে কিছু মাত্র নানাত্ব বা বহুত্ব নাই এবং তিনি স্বয়ং কিছুই হন নাই। তিনিই সর্ব্ব-সৃষ্টির কারণাবস্থায় নিয়ন্তৃ ও অন্তর্যামীরূপে অধিষ্ঠিত থাকেন বলিয়া

* ৩ সংখ্যক অতিরিক্ত পত্র দ্রষ্টব্য।

'সর্ব্বজ্ঞ' ও 'সর্ব্বেশ্বর' শব্দে কথিত হইয়াছেন। 'সৎ' শব্দ এবং চতুর্থপাদ স্বরূপ "আত্মা" শব্দ উভয়ই সৃষ্টি সংসারের অতীত অদ্বিতীয় আত্মাকে প্রতিপাদন করিতেছে। এই কারণে শাস্ত্রে তাঁহার সেই সংসারাতীত পাদের প্রতি 'সর্ব্বজ্ঞ' বিশেষণ দেন নাই; কেবল 'আত্মা' বলিয়াই পর্য্যাপ্ত করিয়াছেন। কেন না, সে অবস্থায় জগৎ কোন রূপে অবস্থিতি না করায় কেবল তিনিই 'একমেবাদ্বিতীয়ং' থাকেন। তখন জগতের অভাব বশতঃ 'সর্ব্ব' শব্দ এবং জ্ঞেয় পদার্থের অসদ্ভাব হেতু "জ্ঞ" শব্দ চলিতে পারে না। কিন্তু শাস্ত্রে যেখানে সৃষ্টির কারণাবস্থাতে ঐ অদ্বিতীয় আত্মার আবির্ভাব বর্ণন করিয়াছেন সেই খানেই তাঁহাকে স্পষ্টবাক্যে 'সর্ব্বজ্ঞ' কহিয়াছেন। যেমন শ্বেতাশ্বতরে সেইরূপ স্পষ্ট শ্রুতি আছে, সেইরূপ মাণ্ডুক্যেও প্রকারান্তরে তাহাই রহিয়াছে।

বেদান্তদর্শনের প্রথমাধ্যায়ে প্রথম পাদে পঞ্চমাধিকরণে
পঞ্চমাবধি একাদশ সূত্রের ব্যাখ্যা সমাপ্ত।

প্রথমখণ্ড সমাপ্ত।

এই খণ্ডের উপসংহার।

এই বেদান্ত দর্শনের সমুদয় ষোড়শ পাদের সূত্র সংখ্যা ৫৫৫। সেই ৫৫৫ টী সূত্র ১৯১ টী অধিকরণে মীমাংসিত হইয়াছে। তাহার মধ্যে প্রথম অধ্যায়ের প্রথম পাদের প্রথমাবধি একাদশসূত্র যাহা পাঁচটী মাত্র অধিকরণে নিবিষ্ট আছে তাহাই এই বেদান্তদর্শনের পূর্ব্ব গ্রন্থ স্বরূপ। এই খণ্ডে সেই একাদশটী মাত্র সূত্রের তাৎপর্য্য দেওয়া গেল। তাহাই বেদান্ত-বিজ্ঞানের মূল ভূমি। তাৎপর্য্যের সহিত এই কয়েকটী সূত্র পাঠ করিলেই বেদান্তদর্শনের প্রধান প্রধান মর্ম্ম সকল অবগত হওয়া যাইবে। ঐ একাদশটী সূত্রের মধ্যে "অথা-তোব্রহ্মজিজ্ঞাসা" সূত্রদ্বারা ব্রহ্মজিজ্ঞাসার কর্ত্তব্যতা প্রথমেই উত্থা-পিত হওয়ায় কর্ম্মীগণ আপত্তি করেন যে কর্ম্মের সহিত সংশ্রব না রাখিয়া স্বতন্ত্র রূপে কোন ব্রহ্মজিজ্ঞাসা হইতে পারে না। অতএব এই বেদান্ত শাস্ত্রকে কর্ম্মমীমাংসার পরিশিষ্ট বলিয়া গ্রহণ করা উচিত। এই কথার উত্তরে পূজ্যপাদ শঙ্করাচার্য্য স্বীয় ভাষ্যে বুঝাইয়া দিয়াছেন যে তাহা হইলে মহর্ষি ব্যাসদেব জৈমিনি-কৃত কর্ম্মমীমাং-সার পরিশিষ্ট বলিয়াই উহা আরম্ভ করিতেন। বিশেষতঃ কর্ম্মাঙ্গ হইতে ভিন্ন ব্রহ্মরূপ পরম বস্তুপ্রতিপাদক শ্রুতির অভাব নাই। সে সকল শ্রুতির মর্ম্ম কেবল জ্ঞানস্বরূপ স্বতঃসিদ্ধ ব্রহ্মপক্ষে গৃহীত হইয়া থাকে। সুতরাং কর্ম্মের সংশ্রব ব্যতীত স্বতন্ত্ররূপে ব্রহ্মজিজ্ঞাসা শাস্ত্রসিদ্ধ।

দ্বিতীয় সূত্রে "জন্মাদ্যস্য যতঃ" বাক্যদ্বারা ব্রহ্মকে জগতের জন্ম স্থিতি ভঙ্গের কারণ বলায় কিজানি যদি অনুমানবাদীগণ এমন বুঝেন যে জগতের জন্ম স্থিতি ভঙ্গরূপ তটস্থ লক্ষণ ব্যতীত ব্রহ্মের বুঝি কোন স্বরূপ লক্ষণ নাই, এজন্য উপনিষদ্-বাক্য- দ্বারা সমাহার করিয়াছেন যে ব্রহ্মবিদ্যা হৃদয়েই প্রতিষ্ঠিত। ব্রহ্ম স্বয়ংপ্রকাশ

আনন্দস্বরূপ, রসস্বরূপ ও সকলেরই অন্তরাত্মা। তাঁহার সেই স্বরূপ-ভাবকে সূর্য্য চন্দ্র তারা প্রকাশ করিতে পারে না এবং তাহা দেহ, প্রাণ ও মনোবুদ্ধির অতীত। বাহ্য এবং মানসিক প্রকৃতির ব্যাপার শান্ত হইলে কেবল আত্মাতে তিনি পরমাত্মা রূপে প্রকাশিত হন। তখন তাঁহাকেই সকল জগতের আত্মা ও প্রকাশক রূপে জানা যায়। এই "জন্মাদ্যস্য যতঃ" সূত্রোপলক্ষে কর্ম্মীগণেরও এক আপত্তি ছিল যে, ব্রহ্ম জগতের জন্ম স্থিতি ভঙ্গের কারণ হইলেও বেদের কারণ হইতে পারেন না, কেন না বেদ অপৌরুষেয় এবং অকৃত। এই আপত্তি যে নিতান্ত অযুক্ত তাহা সূত্রকার ও ভাষ্য-কার তৃতীয় সূত্র অর্থাৎ "শাস্ত্রযোনি" সূত্র দ্বারা বুঝাইয়াছেন এবং "তত্তু সমন্বয়াৎ" নামক চতুর্থ সূত্রের দ্বারা তাহার দৃঢ়তা স্থাপন করিয়াছেন। অতঃপর সাংখ্যবাদীগণ "ব্রহ্ম শব্দে অচেতন প্রকৃতি" এইরূপ আপত্তি করায় "ঈক্ষতে" প্রভৃতি পঞ্চমাবধি একা-দশ সূত্র দ্বারায় মীমাংসিত হইয়াছে যে জড়-প্রকৃতি জগতের কারণ হইতে পারে না। একমাত্র চৈতন্যস্বরূপ ব্রহ্মাই এই জগতের কারণ ও সকল জ্ঞানের আকর।

এই একাদশটী সূত্রে বিচার করিবার জন্য যে সমস্ত বেদান্তবাক্য (উপনিষ্‌দ-বাক্য) গৃহীত হইয়াছে তৎসমস্তের অর্থ এক সর্ব্বজ্ঞ সর্ব্বশক্তি, জগতের জন্মস্থিতি ভঙ্গের কারণ চৈতন্যস্বরূপ রসস্বরূপ, আনন্দস্বরূপ এবং আত্মার অন্তরাত্মাস্বরূপ ব্রহ্মপক্ষে। বিবিধ শাস্ত্রীয় যুক্তিদ্বারা সেই উপাদেয় অর্থকে পরিষ্কার করা গিয়াছে। অধিকন্তু ইহাও প্রতিপাদন করা গিয়াছে যে সৃষ্টির কারণ-নির্দ্দেশ সম্বন্ধে যত বেদান্ত বাক্য আছে তৎসমস্তেরই চৈতন্যস্বরূপ ব্রহ্মপক্ষে সমান তাৎপর্য্য।

এই সমস্ত মীমাংসা দ্বারা কর্ম্মী ও সাংখ্যবাদীগণের ব্রহ্মবিরোধী আপত্তি সকল নিরাকৃত হইয়াছে।

তৎসঙ্গে সঙ্গে অন্যান্যবাদীগণেরও ঈশ্বর সম্বন্ধীয় অনুমান-উপন্যাস সকল হেয় পূর্ব্বক, বেদান্তের—স্বতঃসিদ্ধ-ব্রহ্মপরতা, ব্রহ্মের প্রসিদ্ধ-আত্মস্বরূপত্ব, বেদ্য ও জ্ঞেয়স্বরূপত্ব, বুদ্ধি বিদ্যা উপাসনা ও ধ্যানাদির অগম্যত্ব এবং মোক্ষ ও ব্রহ্মের অভেদত্ব সংস্থাপিত হইয়াছে।

এইক্ষণে পাঠকদিগের জানিবার ইচ্ছা হইতে পারে যে এখনও যে বিস্তীর্ণ সূত্র সংখ্যা অবশিষ্ট আছে তৎসমূহের মধ্যে কোন বিষয়ের বিচার আছে? এই কৌতূহল চরিতার্থের নিমিত্তে আমি পূজ্যপাদ শঙ্করাচার্য্যের নিম্নস্থ উক্তি গ্রহণ করিলাম।

"একমপি ব্রহ্মোঽপেক্ষিতোপাধিসম্বন্ধং নিরস্তোপাধিসম্বন্ধঞ্চ উপাস্যত্বেন জ্ঞেয়ত্বেনচ বেদান্তেষূপদিশ্যতে ইতি প্রদর্শয়িতুংপরোগ্রন্থ আরভ্যতে।"

একমাত্র পর ব্রহ্ম সোপাধিক ও নিরুপাধিক রূপে, অর্থাৎ উপাস্য ও জ্ঞেয়ভাবে বেদান্তে উপদিষ্ট হন। তাহার সামঞ্জস্য করিবার নিমিত্ত উত্তর-গ্রন্থ অর্থাৎ ইহার পরের সূত্র সকল অবতারিত হইয়াছে। তাৎপর্য্য এই যে শ্রুতিতে যেখানে ব্রহ্ম নিরুপাধিক ও জ্ঞেয়মাত্র রূপে উপদিষ্ট হইয়াছেন সেখানে ব্রহ্মজ্ঞানের বিশুদ্ধতা সম্বন্ধে কোন সন্দেহ হইতে পারে না। কিন্তু উপাসনার সুবিধার জন্য শ্রুতিতে যেখানে তিনি কোন উপাধিযোগে উপদিষ্ট হইয়াছেন তাদৃশ অনেক স্থলে উপাধিকেই ব্রহ্ম বলিয়া আশঙ্কা হইতে পারে, এবং তাহাতে ব্রহ্মজ্ঞানের ব্যাঘাত সম্ভব। ভগবান্ ব্যাসদেব উত্তর-গ্রন্থে অর্থাৎ ইহার পরের সূত্র সমূহে সেই সমস্ত কল্পিত উপাধি ভেদ পূর্ব্বক প্রতিপাদন করিয়াছেন যে একমাত্র ব্রহ্মজ্ঞানেই সেই সমস্ত শ্রুতির প্রধান উদ্দেশ্য এবং কেবল ব্রহ্মেরই উপাসনার সুবিধা জন্য সেই সমস্ত উপাধির কল্পনা। যথা—"প্রাণ" শব্দে "শরীরস্থ প্রাণ বায়ু"। কিন্তু উপাসনার অনুরোধে যেখানে ব্রহ্ম "প্রাণ" বলিয়া সোপাধিকরূপে উক্ত হইয়াছেন সেখানে কি জানি

যদি কোন মুর্খ-উপাসক শরীরস্থ প্রাণ-বায়ুকেই ব্রহ্ম বলিয়া মনে করে এই জন্য ভগবান ব্যাসদেব (শারীরকে ১। ১। ২৩) সিদ্ধান্ত করিয়াছেন যে ব্রহ্ম "প্রাণ বায়ু" রূপ উপাধি নহেন কিন্তু তিনি সকলের জীবন বিধায় "প্রাণ" বলিয়া উক্ত হইয়াছেন।—

উত্তর-গ্রন্থীয় সূত্র সমূহের তাৎপর্য্য লিখিয়া গ্রন্থাকারে প্রকাশ করিতে আমার সাবকাশ হইবে কি না বলিতে পারি না। কিন্তু জ্ঞাতব্য এই যে সেই সমস্ত সূত্রের মধ্যে বিদ্যা ও অবিদ্যাবস্থা ভেদে উপাসনা, সৃষ্টি, প্রলয়, পরলোক, ব্রহ্মজ্ঞান ও মোক্ষ সম্বন্ধে বিচারই অধিকাংশ। তাহাতে তাদৃশ যত বিচার আছে তাহা আমার প্রণীত বেদান্তপ্রবেশ, সৃষ্টি প্রলয়তত্ত্ব, পরলোকতত্ত্ব ও হিন্দু ধর্ম্মের উপদেশ নামক গ্রন্থ সমূহে অধিকার ও আবশ্যক মত ভূরি পরিমাণে উদ্ধৃত হইয়াছে। পাঠকগণ যদি শ্রদ্ধা পূর্ব্বক সেই সকল গ্রন্থ পাঠ করেন তবে তাঁহারা নিশ্চয়ই সমগ্র বেদান্তদর্শনের এবং বিস্তীর্ণ হিন্দুশাস্ত্রের সারমর্ম্ম অবগত হইতে পারিবেন এবং ভরসা করি তদ্দ্বারা অনেকের হৃদয় ব্রহ্মজ্ঞানে আলোকিত হইয়া উঠিবে। ইতি—

অতিরিক্ত পত্র।

সংখ্যা ১।

কূটস্থ চৈতন্য ও আভাস চৈতন্য।

৫ ও ৫৫ ক্রম দ্রষ্টব্য।

১। বেদান্তশাস্ত্র জীবাত্মার মধ্যে পরমাত্মাকে যেরূপ উচ্চ-ভাবে দৃষ্টি করেন তাহা পরম মুক্তির ভাব। জীব যদি নিমেষার্দ্ধ-কাল সে ভাবের ধ্যান ও ধারণা করিতে পারেন তবে এইখানেই ব্রহ্মলাভে সক্ষম হন। বেদান্তের বিচার এই যে, যেমন নেত্রের সহিত জ্যোতির নিকট সম্বন্ধ না থাকিলে নেত্রে দর্শন-শক্তি প্রস্ফু-টিত হইত না, সেইরূপ জীব-চৈতন্যের সহিত ব্রহ্ম-চৈতন্যরূপ পরজ্যোতির নিকট-সম্বন্ধ না থাকিলে জীবাত্মাতে আত্মবুদ্ধির উদয় হইত না। জীবের বাসনা-নিহিত এবং সন্নিধিবর্ত্তী প্রকৃতি হইতে যেরূপ জীবেতে ইদং ও অহং ভাব উদিত হয়, সেইরূপ জীবা-ত্মাতে পরমাত্মার অধিষ্ঠান জন্য জীবের আত্মবুদ্ধি প্রকাশ পায়। ঐ আত্মবুদ্ধি পরমাত্মনিষ্ঠ বিধায় মোক্ষের হেতু, এবং ইদং ও অহং বুদ্ধি প্রকৃতি-নিষ্ঠ বিধায় ভব-বন্ধনের কারণ।

২। মানবগণের কল্যাণকামী শাস্ত্র ইহাই চান যে, জীব, প্রকৃ-তির অনুগত ইদং ও অহংবোধরূপ অকিঞ্চিৎকর সম্পৎ পরিত্যাগ পূর্ব্বক ব্রহ্মচৈতন্যানুগত আত্ম-বোধের অনুরাগী হন। কেননা প্রকৃতি মায়ামাত্র। প্রকৃতির পরিণাম-স্বরূপ বাহ্যবস্তু ও মানসিক বৃত্তি সমুদয়ই মায়া, সমস্তই অসার। সে সমস্ত বস্তু ও বৃত্তিকে এখন যেমন দৃষ্টানুভব হইতেছে বস্তুতঃ তাহা তাহাদের স্বরূপ নহে। সে সমস্ত আবির্ভাবই পরিবর্ত্তনশীল এবং তেজঃ ও কাচে বারি-বুদ্ধির ন্যায় ব্রাহ্মী-শক্তি-স্বরূপিণী প্রকৃতির বিকার মাত্র।

কিন্তু যে ব্রহ্মচৈতন্য আত্মবুদ্ধির প্রকাশক, তিনিই আবার ঐ সমস্ত প্রাকৃতিক ভাগেরও মূল আশ্রয়। অতএব যে অহং ও ইদং বুদ্ধি পরিবর্ত্তনশীলা প্রকৃতির অচিরস্থায়ী ভাব বা আবির্ভাব মাত্র, তাহাকে জীবনের সার না করিয়া অপরিবর্ত্তনীয় ব্রহ্মচৈতন্যাশ্রিত আত্ম-বুদ্ধিকে ধারণ করিতে হইবেক।

৩। এই প্রকার সাধন দ্বারা "ব্রহ্ম-চৈতন্যই আত্মার আত্মা" এই অদ্বয় ব্রহ্মজ্ঞান জীবাত্মাতে জাজ্জ্বল্যমান প্রকাশিত হইয়া উঠিবে এবং তদিতর রাজ্যধন, পরিবার, বিদ্যানৈপুণ্য প্রভৃতি সম্বন্ধাধীন যে আমিত্ব, মমত্ব ও অন্যত্ব-বোধ যাহাকে শাস্ত্রে দ্বৈত জগৎ কহে তাহার মায়িকত্ব অনুভূত হইবেক। জীব যতই প্রকৃতির সেবা করেন ততই তাঁহার জীবত্ব প্রকৃতি কর্ত্তৃক বিরচিত হইয়া উঠে, এবং ততই তিনি প্রকৃতিরই পরিণাম-বিশেষকে আমি ও আমার বলিয়া অভিমান করেন। কিন্তু ব্রহ্মচৈতন্যধ্যানে, এবং ব্রহ্মজ্ঞানে, জীবের ব্রহ্মরূপ পরম ধাতু প্রকাশ পায় এবং তখন জীব ব্রহ্মেতেই আপ-নার স্বরূপত্ব ও মমত্ব দৃষ্টি করিয়া থাকেন।

৪। আলোক ও দৃশ্য বস্তু এই দুইটি পদার্থের মধ্যে আলো-কই যেমন নেত্রের অধিষ্ঠাত্রী দেবতা, সেইরূপ ব্রহ্মচৈতন্য-জ্যোতিঃ ও প্রকৃতি এই উভয় তত্ত্বের মধ্যে ব্রহ্মচৈতন্য-জ্যোতিই জীব-চৈতন্যের অধিষ্ঠাত্রী দেবতা। এই ব্রহ্মচৈতন্য-জ্যোতিকে শাস্ত্রে দুইভাগে দৃষ্টি করেন। জ্যোতিঃ যেমন একভাগে স্বয়ম্প্রকাশ, ব্রহ্মচৈতন্যও সেইরূপ একভাগে স্বয়ম্প্রকাশ। আবার জ্যোতিঃ যেমন আর একভাগে প্রত্যেক আকৃতিতে তদাকারাকারিত হইয়া তাহার প্রকাশক হয় ব্রহ্মচৈতন্যও সেইরূপ আর একভাগে প্রত্যেক পদার্থে, প্রত্যেক ইন্দ্রিয়ে এবং প্রত্যেক মনোবৃত্তিতে তদাকারা-কারিত হইয়া সেই সমস্ত আবির্ভাবের প্রকাশক হন।

৫। যদি নেত্র সম্মুখে থাকে তবে জ্যোতিঃ তাহাতে তদাকা-

রাকারিত হইয়া তাহাকে প্রকাশ করিবেই করিবে। যদি নেত্র না থাকে, তবে জ্যোতিঃ স্বয়ম্প্রকাশমাত্র থাকিবে। জ্যোতির যে নেত্র-প্রকাশকাংশ তাহা নেত্রের আকারাকারিত বিধায় বিকৃত, কিন্তু জ্যোতির স্বয়ম্প্রকাশাংশ বিশুদ্ধ ও অবিকৃত। সেইরূপ জীব-চৈতন্যের সদ্ভাবে ব্রহ্মচৈতন্য তাঁহাতে অধিষ্ঠিত ও তাঁহার প্রকাশক; কিন্তু জীবের অসদ্ভাব কল্পনা করিয়া দেখ তদবস্থায় ব্রহ্মচৈতন্যকে স্বয়ম্প্রকাশ মাত্র দেখিবে। ব্রহ্মচৈতন্যের জীবাত্ম-বুদ্ধি-প্রকাশক যে অংশ তাহা জীবাকারাকারিত সুতরাং বিকৃত এবং নানা। কিন্তু স্বয়ংপ্রকাশাংশই তাঁহার নির্ম্মল স্বরূপ, একমাত্র, রূঢ়, বিশুদ্ধ, ও অবিকৃত।

৬। ব্রহ্মচৈতন্যের ঐ স্বয়ম্প্রকাশাংশের নাম কূটস্থ-চৈতন্য এবং প্রত্যেক জীবচৈতন্যে তাঁহার জীবাকারাকারিত ও জীবের আত্মবুদ্ধিপ্রকাশক অংশের নাম আভাসচৈতন্য। এই আভাস-চৈতন্যরূপ সর্ব্বভুবন-প্রকাশক পরম জ্যোতিঃ কর্ত্তৃক পরব্রহ্মের স্বীয় শক্তির প্রভাবরূপ জীব ও জড় জগৎ সত্তারূপে প্রকাশ পাই-তেছে। এই সকল সত্তা সদাকাল একরূপী নহে। জীব সকল ধর্ম্মাধর্ম্মরূপ অদৃষ্ট জন্য ইহকাল পরকালে এবং জাগ্রৎস্বপ্নাদি নানা অবস্থায় নীয়মান হইতেছেন এবং বাহ্য জগৎ কালসহকারে নানা-প্রকারে রূপান্তরিত হইতেছে। এই সর্ব্বাবস্থায় ব্রহ্মচৈতন্য আভাস-রূপে তাহাদিগের প্রকাশক হইয়া আছেন। কিন্তু সর্ব্বাবস্থাতেই তিনি আবার স্বয়ম্প্রকাশ ও অপরিবর্ত্তনীয়রূপে স্বয়ং তাহাদের অতীত রহিয়াছেন। যেমন কর্ম্মকারশালায় একমাত্র নাভি-লৌহের আশ্রয়ে সকল লৌহ রূপান্তর লাভ করে, কিন্তু সেই নাভি স্বয়ং একরূপেই সদা স্থিতি করে, সেইরূপ একরূপে সদাস্থিত অবিকৃত ব্রহ্মচৈতন্যের আশ্রয়ে নামরূপ অবস্থাদি বিকারের সহিত এই জীব ও জড় জগৎ প্রকাশ পাইতেছে। ঐ নাভি লৌহের নামান্তর কূট।

তদনুসারে ব্রহ্মচৈতন্যের ঐ একরূপে সদাস্থিত, অপরিচ্ছিন্ন, অবিকৃত এবং আভাসাতীত অংশের নাম কূটস্থ চৈতন্য। আর আভাসচৈতন্য সেই কূটস্থের পরিচ্ছেদ মাত্র।

৭। অন্তঃকরণে যত বৃত্তি আছে তাহাতে আভাসচৈতন্য দর্শনেন্দ্রিয়ব্যাপী জ্যোতির ন্যায় মিশ্রিত হইয়া আছেন। আভাসমিশ্রিত সেই বৃত্তি সকল আভাসচৈতন্যের গুণে কেবল আপনারাই অনুপ্রকাশিত হয়। তাহারা অন্যের সত্তাকে প্রকাশ করে না। অখিল-সত্তাকে এককালীন সামান্যতঃ প্রকাশ করা কেবল কূটস্থ চৈতন্যের ধর্ম্ম। কূটস্থ চৈতন্য জীবকে ও তদীয় অন্তঃকরণবৃত্তি সমূহকে প্রকাশ করণার্থ যখন বিশেষ বিশেষ জীবে ও তাহাদের সেই সমস্ত বৃত্তিতে আভাসরূপে প্রতিফলিত হন তখনই জীবাত্মবুদ্ধির অথবা অহংভাবের উদয় হয়।

৮। পূর্ব্বে উক্ত হইয়াছে যে ব্রহ্মচৈতন্যের দুই ভাগ। এক কূটস্থ এবং দ্বিতীয় আভাসচৈতন্য। এখন বলা যাইতেছে যে জীবচৈতন্যেরও দুই ভাগ। এক মৌলিক জীব, দ্বিতীয় আভাসচৈতন্যমিশ্রিত জীব। তন্মধ্যে মৌলিক জীবাংশে জীবচৈতন্য নিষ্ক্রিয়, কিন্তু আভাসচৈতন্য দ্বারা অনুভাসিত জীবচৈতন্যেই ব্যবহারিক জীব-শব্দের বাচ্য। এই ব্যবহারিক জীবটী মৌলিক জীবত্ব ও আভাসচৈতন্যযুক্ত দ্বিগুণীকৃত চৈতন্যমাত্র। ইনিই লোকান্তরগামী ও সুকৃতি দুষ্কৃতির ফলভাগী। কিন্তু তাঁহাতে যে কূটস্থ চৈতন্যের পরিচ্ছেদরূপী আভাসচৈতন্য আছেন তাহা প্রকাশকমাত্র। ফলভোক্তা নহেন। ফলতঃ জীব তাঁহাকে ব্যবহার দ্বারা আত্মারূপে প্রকাশ পান। আর স্বয়ং কূটস্থ চৈতন্য অব্যবহার্য্য ও অবিকারী।

৯। উক্ত আভাসমিশ্রিত হইয়া কেবল জীবেরই জীবত্ব হয়। নতুবা কূটের পরিচ্ছেদ মাত্রেই যে জীবত্ব উৎপন্ন করে এমত নহে।

ঘটাদির দ্বারা অবচ্ছিন্ন বা বুদ্ধ্যাদির দ্বারা অবচ্ছিন্ন আভাসরূপী কূট-পরিচ্ছেদের জীবত্ব হয় না।০ কেবল জীবাবচ্ছিন্ন আভাসই আত্মা-রূপে প্রকাশ পান। সেই আভাসের সহিত বা তদীয় অপরিচ্ছিন্ন সমষ্টি-ভাবস্বরূপ কূটস্থ চৈতন্যের সহিত জীবের তাদাত্ম্য-সম্বন্ধ নাই। কেবল আভাসের সহিত জীবের সামানাধিকরণ্য-সম্বন্ধ আছে। এই সামানাধিকরণ্য-সম্বন্ধই, মৌলিক জীব ও ব্রহ্ম উভয়ের মধ্যে সম্পূর্ণ ভেদজ্ঞাপন করিতেছে।

১০। জীব আর ব্রহ্মে এতই ভেদ। জীব ছায়া-স্বরূপ, ব্রহ্ম আতপ-স্বরূপ ; জীব নয়ন-স্বরূপ, ব্রহ্ম জ্যোতিঃ-স্বরূপ ; জীব ভোক্তা-স্বরূপ, ব্রহ্ম সাক্ষী-স্বরূপ। প্রকৃতি ও ধর্ম্মাধর্ম্মের অধি-কারে জীব কূট-পিষ্ট লৌহের ন্যায় নানা আকার ধারণ করিতেছেন কিন্তু ব্রহ্ম চৈতন্য আভাসরূপে তাঁহার সঙ্গে সঙ্গে থাকিয়াও স্বয়ং অবিকৃত রহিয়াছেন। এত যে ভেদ তথাপি তাঁহারা উভয়ে অভেদ বলিয়া কতই কোলাহল হইতেছে। শাস্ত্রে, চতুষ্পাঠীতে, পরম-হংসাশ্রমে এবং শাস্ত্রজ্ঞ জ্ঞানীদিগের গৃহে সর্ব্বত্রই ঐ কোলাহল শ্রুত হয়।

১১। ব্রহ্মের আভাস ও জীব উভয়ে মিশ্রিত থাকাতে দ্রষ্টা তাহার একে অন্যের অধ্যাস করেন। যাঁহার দৃষ্টি পারমার্থিক তিনি কেবল আভাসরূপী ব্রহ্মই দর্শন করেন এবং জীবেতে ব্রহ্মের অধ্যাসপূর্ব্বক জীবকে ব্রহ্মরূপেই গ্রহণ করিয়া থাকেন। তাঁহার দৃষ্টিতে জীব কিছুই নহে। ব্রহ্মের আভাসরূপ জ্যোতিঃ ব্যতীত জীবাত্মবুদ্ধির উদয়ই হয় না। সুতরাং সেই ব্রহ্মবাদী বলেন যে জীব ব্রহ্মই। পুনশ্চ যাঁহার দৃষ্টি সাংসারিক এবং যাঁহার প্রকৃতি-সম্বন্ধাধীন জীবত্ব-ব্যবহার নিবৃত্ত হয় নাই, উক্ত আভাসরূপী ব্রহ্ম, চৈতন্যের প্রতি তাঁহার কোন নিষ্ঠাই নাই। যদিও আভাসচৈতন্য দ্বারা জীব প্রতিভাসিত হইতেছেন তথাপি তিনি মনে করেন

জীবই সর্ব্বেসর্ব্বা। সুতরাং তাঁহার দৃষ্টিতে আভাসও জীবরূপে গণ্য হইয়া যায়। প্রকৃত পক্ষে জীবও আভাস নহেন, আভাসও জীব নহেন। আভাস কেবল জীবের অধিষ্ঠাত্রী দেবতামাত্র। জ্যোতিঃ যেমন নেত্রের অধিষ্ঠাত্রী দেবতা ইহা সেই রূপই।

১২। প্রকৃত প্রস্তাবে জীব ব্রহ্ম উভয়ে "সযুজা" ও সখা-স্বরূপ। তাঁহাদের পরস্পর ভেদই তত্ত্বজ্ঞান। পারমার্থিক দৃষ্টিতে এবং ধ্যান সমাধিতে জীবত্ববোধের তিরস্কার ও কেবল ব্রহ্মজ্ঞানেরই প্রতিষ্ঠা। সে অবস্থায় কেবল অদ্বয় ব্রহ্মই প্রতীয়মান হয়েন। কিন্তু সাংসারিক দৃষ্টিতে জীব, ব্রহ্ম-বোধবিহীন হইয়া আপনাকে কেবল ধর্ম্মাধর্ম্মের ভাগী ও প্রকৃতির বিকারস্বরূপ অহঙ্কাররূপেই দর্শন করেন। এতাদৃশ মূঢ়দিগের দৃষ্টিকে অপকৃষ্ট দর্শন হইতে উৎকৃষ্ট দর্শনের যোগ্য করিবার জন্য বেদান্তই একমাত্র অঞ্জন-শলাকা।

১৩। বেদান্তের উপদেশ এই যে, আভাস চৈতন্যই যখন জীবের জীবন, জ্যোতিঃ ও সত্তাপ্রকাশক তখন আভাসই মুখ্য জীব অথবা বিশুদ্ধ আত্মা। সামবেদীয় ছান্দোগ্য উপনিষদে স্বীয় পুত্র শ্বেতকেতুর প্রতি উদ্দালক যে "তত্ত্বমসি" মহাবাক্য প্রয়োগ করিয়াছেন তাহাতে আভাস চৈতন্যই যে পরিশোধিত জীবাত্মা এই অর্থই স্ফূর্ত্তি পাইতেছে। উক্ত মহাবাক্যের দ্বারা উদ্দালক শ্বেতকেতুকে কহিতেছেন—"হে শ্বেতকেতো! তুমি ব্রহ্ম।" এই উক্তি পারমার্থিক। এস্থলে "তুমি" শব্দ, শ্বেতকেতুর জীবাত্মাতে জীবন ও আলোক-স্বরূপ যে আভাস চৈতন্য বিরাজ করিতেছেন, তাঁহাকেই নির্দ্দেশ করিতেছে। মৌলিক জীবকে নহে। ঐ আভাস চৈতন্য কূটস্থ ব্রহ্ম-চৈতন্যের পরিচ্ছেদমাত্র। প্রকৃতপ্রস্তাবে তাঁহার সহিত ব্রহ্ম-চৈতন্যের ভেদ নাই। ব্রহ্মনিষ্ঠা বলবতী হইয়া উঠিলে সংসারক্ষেত্রে বিচরণশীল অন্তঃকরণ-বৃত্তির সহিত যখন জীবত্ব ব্যবহার নিবৃত্তি লাভ করে তখন তাদৃশ ব্যবহারের অভাব বশতঃ

আভাসরূপী ব্রহ্ম-প্রতিবিম্ব ব্রহ্মমাত্রই থাকেন। ঠিক সেই প্রকার যেমন দর্পণের অভাবে মুখপ্রতিবিম্ব মুখ মাত্রই থাকে। এইরূপ পারমার্থিক দৃষ্টিতে জীবের জীবত্ব-ব্যবহার ও আভাসের তদাকারা-কারিত ভাব বিগত হয়। সুতরাং স্বীয় পুত্রের প্রতি উদ্দালকের পারমার্থিক সম্বোধনে "তুমি ব্রহ্ম" উক্তিতে দোষ হয় নাই। এতদনুসারে ব্রহ্মজ্ঞদিগের মধ্যে "জীব ব্রহ্মে এক" এই বিশুদ্ধ ভাব চিরকাল চলিয়া আসিতেছে।

১৪। আভাস চৈতন্য হইতে জীবকে ব্যতিরেক করিয়া দৃষ্টি করিলে যে মৌলিক জীব অবশিষ্ট থাকেন তাঁহার নিজের চেতন যে কিরূপ তাহা শাস্ত্রেও বর্ণিত হয় নাই এবং ধ্যানদ্বারাও অনুভব করা যায় না। কেন না তিনি সর্ব্বতোভাবে আভাসের সহিত অন্বিত রহিয়াছেন এবং তাঁহার সর্ব্বভাগেই আভাসের মুখ্যত্ব অনুভূত হয়। সংসারাবস্থায় কেবল প্রকৃতিসম্বন্ধাধীন কর্ত্তৃত্ব ও ভোক্তৃত্ব উপলক্ষ করিয়া তাঁহার পরিচয় পাওয়া যায়। ফলতঃ তাঁহাকে চিদাভাস-বিহীন করিয়া দেখিতে গেলে তাঁহার সেই দুরবস্থা উপস্থিত হয়, যেমন জ্যোতিঃ-বিহীন হইলে চক্ষুর হইয়া থাকে।

১৫। তার্কিকেরা পূর্ব্বপক্ষ করিতে পারেন যে কূটস্থ চৈতন্যের আভাস জীবেতে মিশ্রিত হইয়া জীবেতে যে প্রকার জীবাত্মরূপ চৈতন্য উদয় করে, জীব, রূঢ়রূপে তাদৃশ চৈতন্যযুক্ত হইয়া পরমেশ্বর কর্ত্তৃক সৃষ্ট হইয়াছেন এবং সে সম্পূর্ণ চৈতন্য জীবের নিজের, একথা বলিলে কি দোষ হয়? ইহার উত্তর এই যে—

১৬। প্রথমতঃ অন্ধকারস্বরূপ জীবেতে জ্যোতিঃস্বরূপ ব্রহ্মের এতাদৃশ নিগূঢ়াবস্থান এবং শাস্ত্রে সেই সামানাধিকরণ্য সম্বন্ধের যেরূপ নিত্যতা স্বীকার করেন, তাহাতে এমত কথা অবশ্যই বলা যাইতে পারে যে উক্ত চিদাভাস জীবের সহিত একই এবং জীবের স্বীয় সম্পদ্‌স্বরূপ। তথাপি শাস্ত্রে কহেন যে সৃষ্টি করিয়া ব্রহ্ম

সৃষ্টিতে সাক্ষী এবং অন্তর্যামিরূপে বর্ত্তমান আছেন। যেমন সর্ব্বত্রে সেইরূপ জীবেতেও। তিনি জীবেতে সখা, অন্তর্যামী, ও অন্ত-র্জ্যোতিরূপে বিরাজমান। যদি এইরূপে বর্ত্তমান না থাকিয়া তিনি কোন দূরস্থ স্বর্গলোকে বাস করিতেন তাহা হইলে তাঁহার সত্তা ও স্বরূপে ক্ষুদ্রত্ব ও ব্যক্তিধর্ম্ম অর্পিত। অতএব তাঁহার সর্ব্বত্র বর্ত্তমান থাকাই সঙ্গত।

১৭। দ্বিতীয়তঃ যদি এমত বল যে তাঁহার সর্ব্বত্রাবস্থান স্বীকার করি, কিন্তু তাঁহার আভাস, জীবেতে কেন মানিব? জীবকে যথাবৎ পূর্ণ বলিয়া কেন স্বীকার না করি? ইহার উত্তর এই যে, চক্ষুর যথা-বৎ পূর্ণতা যেমন জ্যোতির অধিষ্ঠানে সম্পাদিত হয়, জীবেরও পূর্ণতা সেইরূপ চিদাভাস জন্য হইয়া থাকে। জ্যোতির সম্মুখে যেরূপ পদার্থ মাত্রের রূপ প্রকাশ পায় এবং আধারগুণে জ্যোতিঃ যেমন নানা বর্ণের রূপ প্রকাশ করে, আভাসরূপী কূটস্থ চৈতন্যের অধি-ষ্ঠানে তদ্রূপ যে যেমন পদার্থ সে তেমনি প্রকাশ পায়। সেই আভাস কর্ত্তৃক জড় বস্তু সত্তারূপে এবং জীব আত্মারূপে বিকশিত হইয়া উঠে।

১৮। তৃতীয়তঃ পুনশ্চ জিজ্ঞাসা করিতে পার যে যদি আভাস-রূপী কূটস্থ চৈতন্যের অধিষ্ঠাতৃত্ব ও সাক্ষিত্ব জন্যই অচেতন পদা-র্থের বর্ত্তমানতা ও জীবের চৈতন্যোদয় স্বীকার করা যায় তবে ঐ কূটস্থ চৈতন্যের ও তদীয় আভাসের অতিরিক্ত আবার সৃষ্টিকল্পনা কি নিমিত্ত? এ প্রশ্নের উত্তর এই যে কেবল সাক্ষিত্ব, অধিষ্ঠাতৃত্ব, অন্তর্যামিত্ব, অস্তিত্ব ও বিদ্যমানত্বই ব্রহ্মের সম্পূর্ণস্বরূপ নহে।— তাঁহার ইচ্ছা, শক্তি, জ্ঞানক্রিয়া, বলক্রিয়া, সৃজন প্রভৃতি বিস্তর ধর্ম্ম তাঁহাতে বিরাজ করে। তাঁহার সেই সকল ধর্ম্মাধীন সৃষ্টি হইয়াছে। এবং তাঁহার অন্তর্য্যাম্যাদি ধর্ম্মাধীন তিনি সর্ব্বত্র ব্যাপ্ত হইয়া আছেন।

১৯। চতুর্থ, যদি তিনি সৃষ্টিকালেই জীবকে আভাস-নিরপেক্ষ-

ভাবে একেবারে সম্পূর্ণ করিয়া দিতেন তাহা হইলে জীব তাঁহার সত্তাকে আর ভোগ করিতে পারিতেন না। অনন্ত কাল যাবৎ তদ্-বস্থায় থাকিয়া যাইতেন। কিন্তু জীবেতে ব্রহ্মের চিদাভাস বর্ত্তমান থাকায় জীবের ব্রহ্মনিষ্ঠা জন্মে, এবং উত্তরোত্তর সেই ভাবের ধ্যান-দ্বারা ব্রহ্মেতেই অনুরাগ হয়। ব্রহ্মেতে যত অনুরাগের বৃদ্ধি হয় ততই প্রকৃতি-জনিত অহঙ্কার নষ্ট হয়। ততই ক্রমে জীবেতে ব্রহ্মত্ব বিকশিত হয়।

২০। অতএব জীবেতে পরমেশ্বরের চিদাভাসরূপে অধিষ্ঠান কেবল সৃষ্টি-প্রকাশের নিমিত্তে নহে, কিন্তু জীবের পরমোপকারের নিমিত্তে। বাহ্য জ্যোতি লাভ করিয়া চক্ষু যেরূপ শক্তিসম্পন্ন হয়, চক্ষু যদি একেবারে সেই শক্তি-বিশিষ্ট হইয়া সৃষ্ট হইত তবে জ্যোতির প্রয়োজন থাকিত না। তদ্রূপ জীব স্বয়ংসিদ্ধরূপে সৃষ্ট হইলে ব্রহ্মজ্যোতির আবশ্যক হইত না। সে অবস্থায় স্বয়ংসিদ্ধ জীব আপনাকে ছাড়িয়া ব্রহ্মকে স্বীয় সখাপদে বরণ করিতে অক্ষম হইত।

২১। অতএব আত্মাস্বরূপ সেই সখাকে লইয়াই আমাদের আমিত্ব। তাঁহাকে লইয়াই আমরা জীব। তাঁহাকে দেখিয়াই আমরা প্রকৃতিকে ত্যাগ করিতে পারি। তিনি মাতা, পিতা, সখা, প্রহরীর ন্যায় আমাদের সঙ্গে সঙ্গে রহিয়াছেন, তাঁহা হইতে বিযুক্ত হইয়া জীব যদি সর্ব্বাবয়বসম্পন্নও হইতেন তথাপি তাঁহার সেই মহিমা হইত না যাহা তাঁহার সংস্পর্শে হইয়াছে।

২২। এই সব কারণে বেদান্ত শাস্ত্রে যুক্তিযুক্তরূপেই জীব-হৃদয়ে ব্রহ্ম-চৈতন্যনিষ্পাদিত চিদাভাসের জাজ্বল্যমান অধিষ্ঠান দৃষ্ট করিয়াছেন। জীবব্রহ্মের এই সামানাধিকরণ্য-সম্বন্ধ-জ্ঞান এবং সেই অমৃতায়মান সম্বন্ধ মধ্যে চিদাভাসরূপী হৃদয়নাথের পরমমুখ্য আত্মতত্ত্বজ্ঞান জন্মিলে জীবেতে ব্রহ্মাত্মভাব উপার্জ্জিত হয়, ব্রহ্মবোধ-

বিহীন সংসার বাসনা ও প্রকৃতির বন্ধন নিবৃত্ত হয় এবং শুক্তিস্বরূপ অমুখ্য জীবত্ব প্রকৃতির মায়াময় অন্ধকারাগৃহ হইতে নিস্তার পাইয়া রত্নকল্প ব্রহ্মজ্যোতি লাভ করিয়া থাকে।

সংখ্যা ২।

অবিদ্যা ভেদ।

১৯ ও ৮৪ ক্রম দ্রষ্টব্য।

"একবিজ্ঞানেন সর্ব্ববিজ্ঞানং প্রতিপদ্যতে"।

১। মোক্ষাভিলাষী সাধু ব্যক্তি মনঃকল্পিত ঈশ্বর, জীব ও ব্রহ্মাণ্ড ভেদ পূর্ব্বক একমাত্র ব্রহ্মজ্ঞান দ্বারা প্রকৃত ঈশ্বর, জীব ও জগৎদর্শনরূপ তত্ত্বজ্ঞান উপার্জ্জন করিবেন। একমাত্র ব্রহ্মবিজ্ঞানে সকল জ্ঞান লাভ হয়।

২। এই বিশ্বসংসারের প্রাণস্বরূপ একজন কর্ত্তা আছেন এই বোধ সামান্য ভাবে সকল ব্যক্তিরই হৃদয়ে অবস্থিতি করে। কিন্তু অধিকাংশ ব্যক্তিই তাঁহার বিশেষ জ্ঞানে বঞ্চিত আছেন।

৩। তাঁহার নিমিত্ত হৃদয়ে জ্বালা না ধরিলে এবং তাঁহাকে পাইবার জন্য অচলা ভক্তির উদয় না হইলে তাঁহাকে বিশেষরূপে জানা যায় না।

৪। প্রেম মানবহৃদয়ের একটী উপাদেয় ভাব। যিনি কখন পুত্র ভার্য্যা, পিতা মাতা, ভ্রাতা ভগিনীকে প্রেম করিয়াছেন তিনিই পরীক্ষা দ্বারা অবগত আছেন যে, প্রেম হৃদয়কে কেমন উচ্ছ্বসিত করে।

৫। প্রেমের আকার নাই, তথাপি প্রেম করিবার কালে প্রেমকে এত স্পষ্ট হৃদয়ঙ্গম করা যায় যে, তেমন ভাবে কোন বাহ্য বস্তুকে জানা যায় না। প্রেমের সেই হৃদয়গত জ্ঞানের সঙ্গে ইন্দ্রিয়-গ্রাহ্য বস্তুর জ্ঞানের তুলনা হয় না।

৬। যিনি প্রেম না করিয়া প্রেমের জ্ঞান অন্বেষণ করেন তিনি

প্রেমের যথার্থ জ্ঞানে বঞ্চিত হন। তিনি হয় অপর কোন ভাবকে প্রেম বলিয়া কল্পনা করিবেন, নয় প্রেম নাই বলিয়া সিদ্ধান্ত করিয়া বসিবেন।

৭। ঐ সিদ্ধান্ত ভ্রমযুক্ত। প্রেম না করাই সে অজ্ঞানতার কারণ। সেইরূপ পরমেশ্বরকে হৃদয়ে অনুভব না করিয়া তাঁহার জ্ঞান লাভ বাহ্য জ্ঞান মাত্র। তাহা পরমেশ্বরীয় তত্ত্বজ্ঞান নহে তাহা কেবল অজ্ঞানের কর্ম্ম।

৮। অজ্ঞান কোন অলৌকিক দেবতা নহেন। জগদ্ব্যাপিনী প্রকৃতিই অজ্ঞান শব্দের বাচ্য। হৃদয়কে ত্যাগ পূর্ব্বক বাহ্য প্রকৃতির মধ্যে পরমেশ্বরের যে জ্ঞান পাওয়া যায় তাহা ব্রহ্মবিষয়ক পরোক্ষ জ্ঞানমাত্র, তত্ত্বজ্ঞান নহে। সুতরাং তাহা 'অজ্ঞান।' ঐ অজ্ঞানকেই বেদান্তশাস্ত্র 'অবিদ্যা' বলেন।

৯। ব্রহ্মকে ভক্তি পূর্ব্বক হৃদয়ঙ্গম না করিয়া অথবা প্রেমানুভবের ন্যায় হৃদয়ে তাঁহার জ্বলন্ত সত্তার উত্তাপ অনুভব না করিয়া, অধিকাংশ মানব তাঁহাকে অন্য প্রকারে বুঝিতে চেষ্টা করেন। এজন্য হিন্দুশাস্ত্র কহেন যে, অধিকাংশ মানবই সেই 'অবিদ্যা' অর্থাৎ অজ্ঞানে আচ্ছন্ন আছেন।

১০। ব্রহ্মকে তত্ত্বজ্ঞানে হৃদয়ে উপলব্ধি না করিয়া, লোকে বুদ্ধি, যুক্তি, কল্পনা দ্বারা বা লোকের কথা ও শাস্ত্রের অসিদ্ধান্ত ভাগ শ্রবণের দ্বারা তাঁহাকে যেরূপ করিয়া অনুমান করে তাহা প্রকৃত ব্রহ্ম নহে।

১১। ভক্তি ও প্রীতি-সংযুক্ত হৃদয়-মধ্যে যাঁহার জ্বলন্ত ভাব উপলব্ধি হয় এবং যাঁহার তাদৃশ তত্ত্বজ্ঞান জন্য যোগীদিগের হৃদয় কোটিকল্প স্বর্গ-সুখ-বিনিন্দিত আনন্দে প্লাবিত হয় তিনিই ব্রহ্ম। 'রসোবৈ সঃ' তিনিই রসস্বরূপ।

১২। আর অজ্ঞান-বশে যাঁহাকে বুদ্ধি, যুক্তি, তর্ক ও কল্পনা

দ্বারা রচনা করা যায়—হৃদয় যাঁহার ভাবে উন্মত্ত হয় না, তিনি ব্রহ্ম নহেন। শাস্ত্র সেই মনঃকল্পিত ভাবটিকে অনুমিত ঈশ্বর কহেন।

১৩। ফলতঃ এই জগতের কারণ-স্বরূপ এক ব্রহ্মাত্মা আছেন এই বোধ সামান্য ও পরোক্ষ ভাবে সকলেরই আত্মাতে নিহিত থাকাতে সেই স্বাভাবিক অথচ পরোক্ষ বোধের অবলম্বনেই ভক্তি-যোগে অপরোক্ষ ব্রহ্মজ্ঞান লাভ হয়। পক্ষান্তরে সেই পরোক্ষ বোধেরই অবলম্বনে যুক্তি তর্ক প্রভৃতি মনোবৃত্তিরা তাঁহাকে অপ্রকৃত রূপে গঠন ও অলঙ্কৃত করিয়া থাকে।

১৪। অতএব স্বাভাবিক অথচ পরোক্ষ-বোধ-গ্রাহ্য ব্রহ্মকে অবলম্বন করিয়াই ঐ অনুমিত ও কল্পিত ঈশ্বরকে লোকে রচনা করে, কিন্তু তাহাদের অজ্ঞাতসারে তাহাদের উদ্দেশ্য প্রকৃত ব্রহ্মেতেই থাকে। সেই অজ্ঞাত উদ্দেশ্য তাহাদের পক্ষে ব্রহ্মজ্ঞান নহে কিন্তু জ্ঞানীর পক্ষে তাহার স্মরণ ও ভাব গ্রহণ ব্রহ্মজ্ঞানের পোষকতা করে।

১৫। ব্রহ্মরূপ মূল-ভূমির উপরেই অপরোক্ষ ব্রহ্মজ্ঞানের অভাবে লোকে অজ্ঞানতা বশতঃ অর্থাৎ অবিদ্যাতে আচ্ছন্ন হইয়া ব্রহ্মকে অন্যরূপে অনুমান করে।

১৬। অপরঞ্চ, জীবের স্বরূপ ও বাহ্য জগতের যথার্থ তত্ত্বও লোকে লাভ করিতে পারে না, কিন্তু তদুভয়কে আর এক প্রকারে দেখে। ইহাও অজ্ঞানের কার্য্য। মানসিক প্রকৃতি ও বহির্ব্ব্যাপ্ত প্রকৃতির পরস্পর সম্বন্ধাধীন জীবেতে যে স্বার্থ, অভিমান ও বাসনা জন্মে তাহারই বশতাপন্ন হইয়া লোকে দেহ প্রাণাদির সমষ্টিকে জীব বলিয়া মনে করে এবং ঈশ্বর-সৃষ্ট পবিত্র জগতে স্বীয় স্বীয় স্বত্বলভ্য দৃষ্টি করিয়া থাকে। সুতরাং প্রকৃত জীব ও প্রকৃত জগতের তত্ত্বলাভে বঞ্চিত হয়। এরূপ ভ্রম অজ্ঞানেরই কার্য্য।

১৭। যেমন মনুষ্যের নয়নাবরণকারী অল্পস্থানব্যাপী মেঘ-

মণ্ডলকে অধিকতর বিস্তীর্ণ সূর্য্যমণ্ডলের আচ্ছাদক বলা যায় তদ্রূপ অবিবেকী মনুষ্যের স্বার্থ, অভিমান, যুক্তি, তর্ক প্রভৃতি অর্থাৎ 'অজ্ঞান' সর্ব্বব্যাপী পরব্রহ্মের এবং প্রকৃত জীব ও জগতের আচ্ছাদক হয়।

১৮। উক্ত অজ্ঞান কেবল ব্রহ্ম ও চিৎজড়াত্মক প্রকৃত সংসারকে মানবের দৃষ্টি হইতে আবরণ করিয়া ক্ষান্ত হয় না, কিন্তু উক্ত তত্ত্বত্রয়কে আর এক প্রকার করিয়া দেখায়। অর্থাৎ যেমন নীলবর্ণ চসমা চক্ষুতে দিলে সমস্ত জগৎ নীলবর্ণ দেখায় অথবা ঈষৎ-অন্ধকার ও অস্পষ্ট দৃষ্টিবশত রজ্জুকে সর্প বলিয়া মনে হয় সেইরূপ যথোক্ত-লক্ষণ অজ্ঞানই ব্রহ্ম, জীব, ও জগৎকে অপ্রকৃতরূপে দর্শন করায়।

১৯। কিন্তু তাদৃশ নীল বর্ণও যেমন মিথ্যা, ও সর্পও যেমন মিথ্যা, কিন্তু তাহাদের আশ্রয়ীভূত প্রকৃত বর্ণও যেমন সত্য এবং রজ্জুও যেমন সত্য, অর্থাৎ সত্য-পদার্থের আশ্রয়েই ব্যক্তির যেমন মিথ্যা বস্তুর ভ্রম জন্মে; সেইরূপ ঐ বুদ্ধি, যুক্তি, তর্ক, স্বার্থ এবং অভিমানাত্মিকা প্রকৃতি-স্বরূপিণী অবিদ্যাতে প্রতিফলিত ঐ ঈশ্বরও মিথ্যা, মনঃকল্পিত জীবও মিথ্যা, অভিমান ও স্বার্থ দৃষ্টির জগতও মিথ্যা; কিন্তু তাদৃশ ঈশ্বরের আশ্রয়ীভূত অনাদি অনন্ত যে ধ্রুব পরব্রহ্ম তিনি সত্য, ঐরূপ মনোকল্পিত জীবের আশ্র ীভূত বিশুদ্ধ যে জীব তিনি সত্য এবং স্বার্থ-দৃষ্টির জগতের আশ্রয়রূপ যে ঈশ্বর সৃষ্ট বিশুদ্ধ বিশ্বব্যাপার তাহাও সত্য।

২০। যদি ঐ 'অবিদ্যা' অর্থাৎ 'অজ্ঞান' না থাকে তবে ঐ কল্পিত ঈশ্বর, আরোপিত জীব ও বাসনা-পটস্থ চিত্রিত জগৎ ইন্দ্রজালবৎ তিরোহিত হয়, এবং তৎপরিবর্ত্তে পরব্রহ্ম, বিশুদ্ধ জীব ও পবিত্র জগতের ভাব পাওয়া যায়। যুক্তি তর্ক, দেহ প্রাণাদির অভিমান, স্বার্থ ও বাসনা পলায়ন করে।

২১। তখন পরব্রহ্ম, বুদ্ধ্যাদির বিরচিত না হইয়া হৃদয়ের ধনরূপে ; জীব, দেহ প্রাণাদির সমষ্টি না হইয়া ব্রহ্মানন্দে প্রতিষ্ঠিত মুক্ত আত্মারূপে এবং জগৎ, স্বার্থ-বিরচিত নরস্বত্ব বা নরাধিকৃতরূপে দৃষ্ট না হইয়া ঐশীশক্তির আবির্ভাব রূপে দৃষ্ট হয়েন। "অজ্ঞান" তিরোহিত হয়।

২২। যেরূপ রজ্জুর তত্ত্বজ্ঞান জন্মিলে তদাশ্রিত ভ্রমাত্মক সর্পের মিথ্যাত্ব প্রকাশ পায় এবং বিচার পূর্ব্বক দেখিলে প্রতিপন্ন হয় যে, সে তত্ত্বজ্ঞান জন্মিবার পূর্ব্বেও ঐ সর্প মিথ্যা ছিল, তদ্রূপ অপরোক্ষানুভূতিসিদ্ধ সত্য-স্বরূপ ব্রহ্মের জ্ঞানোদয়ে জানা যায় যে এতদিন আমি ঈশ্বরকে যেরূপ জানিয়া রাখিয়া ছিলাম তাহা ভ্রম ও কল্পনামাত্র। জীব ও জগৎ সম্বন্ধেও ঐরূপ।

২৩। ঈশ্বর, জীব ও জগৎ-সম্বন্ধে তত্ত্বজ্ঞান উদয় হইলে পর যদি তর্ক বিচার ও পদার্থ বিদ্যার আলোচনা প্রয়োজন হয় তাহা ভগবৎ-জ্ঞানের আনুষঙ্গিক বলিয়া সংসাধিত হইয়া থাকে, কিন্তু ব্রহ্ম-বিহীন জ্ঞানের বা স্বার্থের অনুরোধে নহে।

২৪। হৃদয়গত দৃষ্টিতে ব্রহ্ম, জীব ও জগতের যে প্রকৃত ভাব লাভ হয় জ্ঞানীরা তাহারই অনুসরণ করেন এবং সেই সত্যের আশ্রয়ে অজ্ঞানীরা যে ঈশ্বর, জীব, ও জগৎ কল্পনা করেন তাহা তাদৃশ অজ্ঞানীদিগের পক্ষে সত্য-জ্ঞানের সোপান বলিয়া কথিত হয়। কেন না, তাহার আলোচনাতেই ক্রমে জিজ্ঞাসার উদয় হইয়া মূল-তত্ত্বের জ্ঞানে আরোহণ করা যায়।

২৫। কিন্তু যদি কেহ সেই সোপানের মর্য্যাদা না রাখেন অর্থাৎ ক্রমে তাহা ভেদ পূর্ব্বক তত্ত্বজ্ঞানে আরোহণ না করেন তবে অবিদ্যা ভেদ হয় না। সোপানেই থাকিয়া যান।

২৬। এতাবতা হৃদয়ের দৃষ্টিই অবিদ্যার নাশক। তাহাই

সরলতার নামান্তর, মুক্তির সোপান। তর্কযুক্তি ও আড়ম্বর কেবল অবিদ্যার কার্য্য এবং বন্ধনের হেতু।

২৭। ভাগবতে আছে 'মায়াকে আত্মানুভবে হোম করিবেক' অর্থাৎ যাহার আত্মানুভবরূপ হোমকুণ্ডে শ্রদ্ধাগ্নি জ্বলিয়া উঠে তাহার অজ্ঞান অর্থাৎ মনোবুদ্ধি যুক্তি প্রভৃতির মিথ্যা সিদ্ধান্ত সকল সেই অগ্নিতে দগ্ধ হইয়া যায়।

২৮। এইরূপে অবিদ্যা ভেদ পূর্ব্বক জীব ও জগতের দ্রষ্টা ব্রহ্মকে দর্শন করিবেক এবং একমাত্র ব্রহ্মজ্ঞান দ্বারা জীব ও জগতের প্রকৃত তত্ত্বলাভ করিবে। যুক্তি, তর্ক, স্বার্থ, অভিমান প্রভৃতির বশতাপন্ন হইয়া ঈশ্বরকে রচনা করিবে না, দেহাদিতে জীব-বুদ্ধি করিবে না এবং স্বার্থ মাখিয়া জগতকে বিকৃত করিবে না। সেই একের বিজ্ঞান-দ্বারা জীব ও জগতের যথার্থ তত্ত্ব গ্রহণ পূর্ব্বক ক্রমে ক্রমে তদুভয়ের সর্ব্বভাগে অথবা অতীত দেশে ব্রহ্মানন্দে প্রতিষ্ঠিত হইবেক।

২৯। এই সকল উপদেশ বেদান্তের ছায়া মাত্র, ইহা মনোযোগ পূর্ব্বক অধ্যয়ন ও চিন্তা করিলে বেদান্ত-পাঠে মতি হয়, বিবেক বৈরাগ্য উপার্জ্জিত হয়, ব্রহ্মজ্ঞান স্থির হয়, তর্ক-তরঙ্গ, থামিয়া যায় এবং ব্রহ্মোপাসনা সিদ্ধ হয়। ইতি।

সংখ্যা ৩।

পরমেশ্বর এক হইয়া অনেক।

৯৪ ক্রম দ্রষ্টব্য।

"তৎসৃষ্ট্বা তদেবানুপ্রাবিশৎ"

পরমেশ্বর স্বীয় শক্তি হইতে কারণ শরীরাবধি জগৎ সৃষ্টি করিয়া তন্মধ্যে অনুপ্রবেশ করিয়াছেন। তিনি যদি জগৎসৃষ্টি করত তাহাকে আপনা হইতে দূরে রাখিতেন, যদি তিনি জড় ও জীবের সঙ্গে সঙ্গে নিয়ন্তা ও সখারূপে বর্ত্তমান না থাকিতেন, যদি আপনাকে উহাদের আশ্রয় ও জীবন, ভূতাত্মা ও অন্তরাত্মারূপে প্রতিষ্ঠা না করিতেন তবে "কোহ্যেবান্যাৎ কঃ প্রাণ্যাৎ" কেবা শরীরচেষ্টা করিত, কেবা জীবিত থাকিত। অতএব বেদের সিদ্ধান্ত বাক্য এই যে, তিনি সমস্ত ব্রহ্মাণ্ডে—কি জড়ে কি জীবে ওতপ্রোতরূপে ব্যাপ্ত হইয়া আছেন। তিনিই জড়ে সত্তারূপে, প্রাণে প্রাণরূপে, শক্তিতে মূল শক্তিরূপে, জীবাত্মাতে অন্তরাত্মারূপে, ইন্দ্রিয়ের ভাসকরূপে, জ্ঞানে পরমজ্ঞান রূপে, আনন্দে আধারানন্দরূপে সর্ব্বত্র ব্যাপ্ত হইয়া আছেন। তাঁহার এই সকল আবির্ভাবকে তাঁহার বিভূতি কহা যায়। শান্তস্বভাব ব্রহ্মর্ষিগণ সমস্ত নাম-রূপের মধ্য হইতে সেই পরম পবিত্র বিভূতিকে নির্ব্বাচন করিয়া লইতেন। শ্রুতিতে আছে "তে যদন্তরা তদ্ব্রহ্ম তদমৃতং" সেই নামরূপ বা উপাধি যাঁহা হইতে বিলক্ষণ তিনি ব্রহ্ম, তিনি অমৃত। পরম ঋষিগণ তাঁহাকে সর্ব্বভূতের সাররূপে দর্শন পূর্ব্বক তাঁহার বিভূতি সমূহের উপাধি-স্বরূপ ভূত, প্রাণ, ইন্দ্রিয়, মন, বুদ্ধি এবং ক্ষুদ্রানন্দকে হেয় করিয়াছেন। তাঁহারা সেই সকল বিভূতির গ্রাহক

হইয়া কহিয়াছেন "সর্ব্বং হ্যেতৎব্রহ্ম সর্ব্বংখল্বিদংব্রহ্ম" এই জগতের সমুদয় বস্তুই ব্রহ্ম। এবং উক্ত বিভূতি সকলের উপাধি ত্যাগ পূর্ব্বক কহিয়াছিলেন "পূর্ণমেবাবশিষ্যতে (কেবলং ব্রহ্ম অবশিষ্যতে) অর্থাৎ ভূতেন্দ্রিয়াদি উপাধিকে তিরস্কার পূর্ব্বক পূর্ণস্বরূপ ব্রহ্ম দর্শন করিলে জগতের অসদ্ভাব উপস্থিত হয়। তাদৃশ জ্ঞান-যোগে দেখিলে এই জগৎকে বাস্তবিকই কদলি-গর্ব্ভবৎ অসার, জলবুদ্বুদফেণ-সমান প্রতিক্ষণ প্রধ্বংসমান, মনোবিলাস-কল্পিত ইন্দ্রজালবৎ বোধ হইয়া থাকে। পরমেশ্বর সৃষ্টির পূর্ব্বে এক ছিলেন। সৃষ্টির সঙ্গে সঙ্গে স্বীয় বিভূতি দ্বারা নানা ঘটে নানারূপে প্রকাশ পাইয়াছেন। অতএব যিনি স্বরূপে এক তিনি জগতের পৃথক্ পৃথক্ অংশ-সংসর্গে বহুরূপে অবতীর্ণ হইয়াছেন। ঘটে ঘটে বহু বিভূতিতে যিনি তাঁহাকে দেখেন তিনি স্বরূপতঃ সেই এককেই দেখেন। শাস্ত্রে কহেন সৃষ্টি করিবার সময় পরমেশ্বর সঙ্কল্প করিয়াছিলেন "বহুস্যাম" আমি বহু হইব। ইহার তাৎপর্য্য এই যে তিনি জগতের সর্ব্বভাগে ওতপ্রোত হওয়ায় বহু হইলেন নতুবা স্বরূপতঃ বহু হন নাই। এই বিশ্বভুবনে তিনি ভিন্ন ভিন্ন নামরূপের মধ্যে ভিন্ন ভিন্ন গুণ ধর্ম্মে প্রকাশ পাইলেন। তিনিই শশীসূর্য্যের বরণীয় স্বরূপ, তিনিই নেত্রের জ্যোতি, তিনিই জীবের আত্মা, তিনিই জলে রস-স্বরূপ, পুষ্পে কান্তি ও গন্ধস্বরূপ, বাদ্য ও সঙ্গীতে মোহন রস এবং সকলেরই সার তত্ত্ব। পদার্থতত্ত্ববিৎ পণ্ডিতেরা ভৌতিক পদার্থের যে সকল তত্ত্ব আবিষ্কার করেন তিনি তথায় নিগূঢ় ও সার তত্ত্ব। সর্গবিসর্গবাদীরা উর্দ্ধ উর্দ্ধরূপে, ষট্চক্রবাদীরা পরপররূপে, পঞ্চকোষবাদীরা অন্তরান্তররূপে যে তত্ত্বকে সর্ব্বোর্দ্ধে, সকলের প্রধান পদে বা আত্মার গুহাতে স্থাপন করেন একই পরমেশ্বর সেই সকল তত্ত্বের প্রতিপাদ্য, পরাৎপর এবং সারাৎসার। এইরূপে তিনি সর্ব্বত্রে নানাভাবে অবস্থিতি করিয়াও স্বরূপতঃ একই হয়েন। কিন্তু

যিনি স্বরূপতঃ তাঁহাকে এক না জানিয়া নানা করিয়া জানেন তাঁহার তাদৃশ বিক্ষেপ-যুক্ত জ্ঞান দ্বারা নিবৃত্তিরূপ মুক্তি লাভ হয় না। যথার্থ জ্ঞানী ও যথার্থ প্রেমিক তাঁহার বিভূতির অনুগত হইয়া তাঁহাকে সর্ব্বঘট বা বহুঘট হইতে চয়ন পূর্ব্বক যখন সংগ্রহ করেন তখন তাঁহার "অন্যযোগব্যবচ্ছেদক" পরমাত্মীয় একত্বকেই বরণ করিয়া থাকেন। সেই একই ভগবান নানারসযুত। "নানা-শব্দাদিভেদাৎ" নরনারী সকল নানাবিধ সুকৃতির ফলস্বরূপে ভিন্ন ভিন্ন রুচি অনুসারে তাঁহার বিচিত্র প্রেম-সুধার ভিন্ন ভিন্ন রস গ্রহণ করেন। কেহ বা "তদেতৎ প্রেয়ঃ পুত্রাৎ' তাঁহাকে সামান্য পুত্র হইতে অধিক বাৎসল্য ভাবে, কেহবা "একাত্মনঃ শরীরেভাবাৎ" তরুলতার আশ্রয়-আশ্রিত-ন্যায়ে মধুরভাবে, কেহবা "অনুবন্ধ" ও "তাদ্বিধ্য" অর্থাৎ সখ্য ও দাস্যভাবে এবং কেহ বা "অবিভাগেন দৃষ্টত্বাৎ" বিষয়ানন্দ ও স্বীয় সত্তা বিস্মৃত হইয়া অবিভাগে প্রজ্ঞানৈক-রসে তাঁহার পূজায় নিযুক্ত রহিয়াছেন। ফলতঃ ঈশ্বর বিভিন্নচেতা ভক্তদিগের উপভোগার্থে নানারসযুত হইয়াও স্বরূপতঃ এক অনি-র্ব্বচনীয় রসই হয়েন। তিনি সমস্ত জগৎ ও জীবরূপ উপাধিতে প্রবেশ করিয়াও স্বয়ং কোন উপাধিতে পরিণত বা উপাধির দোষ-গুণ ও ক্রিয়ায় লিপ্ত নহেন। কবিগণ তাঁহার জগতে প্রবেশকে তাঁহার জন্ম বলিয়া কল্পনা করিলেও এবং জগতের সহিত তাঁহার সামানাধিকরণ্য বশতঃ তাঁহাকে বিশ্বরূপে বরণ করিলেও প্রকৃত প্রস্তাবে তাঁহার জন্মও নাই, পরিণামও নাই।

ন জায়তে ম্রিয়তে বা বিপশ্চিন্নায়ং কুতশ্চিন্ন বভূব কশ্চিৎ।

এই শ্রুতি দ্বারা তাঁহার জন্ম মৃত্যু ও বিকারের প্রতিষেধ করি-য়াছেন। আর কহিয়াছেন যে, তিনি কোন কারণ হইতে উৎপন্ন হয়েন নাই এবং আপনিও কোন বস্তু বা জীব হন নাই। অতএব

তিনি জগন্ময় হইয়াও জগৎ নহেন। জীবের জীবন হইয়াও জীব-রূপ উপাধি নহেন এবং বহু হইয়াও একই হয়েন। এইরূপ অদ্বয় তত্ত্ব যাঁহারা হৃদয়ে ধারণ পূর্ব্বক সর্ব্বত্রে তাঁহাকে নমস্কার করেন তাঁহারা আধি ব্যাধি জন্মমৃত্যু হইতে বিমুক্ত হইয়া অমৃতত্ব লাভ করেন।

সংখ্যা ৪।

পরমেশ্বর জীবকৃত শুভাশুভের কর্ত্তা বা ভোক্তা নহেন।

৫৯ ক্রম দ্রষ্টব্য।

শাস্ত্র যেমন একদিকে পরমেশ্বরকে জগতে অনুপ্রবিষ্ট বলিয়াছেন, সেইরূপ অন্যদিকে ঘোষণা করিয়াছেন যে, তিনি কিছুতেই লিপ্ত নহেন। কঠোপনিষদে আছে,

"বায়ুর্যথৈকোভুবনং প্রবিষ্টো রূপংরূপং প্রতিরূপোবভূব।
একস্তথা সর্ব্বভূতান্তরাত্মা রূপংরূপং প্রতিরূপো বহিশ্চ ॥

একই বায়ু ভুবনে প্রবিষ্ট হইয়া যেমন নানারূপ আধারে নানারূপ ধারণ করে, কিন্তু স্বয়ং তাদৃশ আধারে পরিণত হয় না, সেইরূপ সর্ব্বভুতের অন্তরাত্মা এক হইয়াও ঘটে ঘটে ভিন্ন ভিন্ন রূপ হইয়াছেন, কিন্তু স্বয়ং সেই সকল ঘটরূপে পরিণত হন নাই, অবিকৃতই আছেন।

"ন লিপ্যতে লোকদুঃখেন বাহ্যঃ" (কাঠকে)

তিনি লোকদিগের সুখ দুঃখে লিপ্ত হন না কিন্তু পূর্ণ ও অবিকৃতই থাকেন।

"অঙ্গুষ্ঠমাত্রঃ পুরুষোঽন্তরাত্মা সদা জনানাং হৃদয়ে সন্নিবিষ্টঃ।
তং স্বাচ্ছরীরাৎ প্রবৃহেন্মুঞ্জাদিবেষীকাং ধৈর্য্যেন ॥" (কাঠকে)

'হৃদ্যাপেক্ষয়াতু মনুষ্যাধিকারত্বাৎ' (শারীরকে)

নরহৃদয়ের ক্ষুদ্রতানুসারে বেদে সেই পরম পুরুষকে অঙ্গুষ্ঠমাত্র বামনরূপ অর্থাৎ সম্ভজনীয়রূপ কহিয়াছেন। সেই পুরুষ সর্ব্বদা সকল মানবের হৃদয়ে সন্নিবিষ্ট আছেন। মুঞ্জাতৃণ হইতে যেমন

ঈষীকা গ্রহণ করে, সেইরূপ আপনার জীবভাব হইতে তাঁহাকে ধৈর্য্য পূর্ব্বক পৃথক করিবেক। তিনি জীবহৃদয়ের আয়তন ব্যাপিয়া অন্তরাত্মারূপে প্রকাশ পান কিন্তু তাঁহাতে জীবের ক্ষুদ্রত্ব বা সুখ দুঃখ, কর্ত্তৃত্ব বা ভোক্তৃত্ব অর্শে না।

"অর্ভকৌকস্ত্বাত্তদ্ব্যপদেশাচ্চ নেতিচেন্ননিচায্যত্বাদেবং ব্যোমবচ্চ।"
(শারীরকে ১২।৭)

এই বচনে মীমাংসা করিলেন যে, সূত্র প্রবেশ করণার্থ লোকে যেমন সূচীর ছিদ্রে আকাশ দর্শন করে পরাৎপর পূর্ণ পুরুষকে সেই-রূপ উপাসনার সুবিধার নিমিত্ত হৃদয়মধ্যে দর্শন পাওয়া যায়। অভিব্যক্তেরিত্যাশ্মরথ্যঃ' আশ্মরথ্য কহেন, উপলব্ধি নিমিত্ত পর-মাত্মাকে প্রাদেশমাত্র কহা যায়। 'অনুস্মৃতের্বাদরিঃ' পরমাত্মাকে প্রাদেশমাত্র কথন অনুস্মৃতি অর্থাৎ ধ্যান-নিমিত্ত, ইহা বাদরি কহি-য়াছেন। 'সম্পত্তেরিতি জৈমিনিস্তথাহি দর্শয়তি' শ্রুতি ও জৈমিনী উভয়েই কহেন যে উপাসনার নিমিত্ত পরমাত্মাকে প্রাদেশ-পরিমিত কহা সুসিদ্ধ। এই তাৎপর্য্যে পরমাত্মা নরহৃদয়ে বামনরূপে আসীন। এই সকল ব্রহ্মসূত্রীয় সিদ্ধান্ত অনুসারে বুঝা যাইতেছে যে এই রূপ হৃদয়নাথ-স্বরূপে যিনি উপাস্য তিনি ব্রহ্মই। তিনি জীব বা অন্তঃ-করণ নহেন। কেন না ঐ শারীরকাখ্য ব্রহ্মসূত্রে (১।২।৩) সিদ্ধান্ত করিয়াছেন "অনুপপত্তেস্ত ন শারীরঃ" শারীর অর্থাৎ জীব উপাস্য নহেন, যেহেতু সত্যসঙ্কল্প প্রভৃতি গুণ ব্রহ্মেতেই সিদ্ধ আছে, জীবেতে নাই। বিশেষতঃ ব্রহ্মসূত্রে (১।১।২১) নিয়ম করিয়াছেন 'ভেদব্যপদেশাৎ চান্যঃ' যে যাহার অন্তর্যামী সে তাহা হইতে ভিন্ন। সুতরাং জীবের অন্তর্যামী যে ঈশ্বর তিনি জীব নহেন। অন্তর্যামী-রূপে জীবেতে তিনি লবণ-মিশ্রিত জলের ন্যায় অথবা দগ্ধ লৌহ-পিণ্ডস্থ অনলের ন্যায় ওতপ্রোত থাকিলেও জীবের কর্ত্তৃত্ব ভোক্তৃত্বে

লিপ্ত নহেন। তিনি কেবল জীবের শক্তিদাতা, প্রকাশক এবং সাক্ষীস্বরূপে অধিষ্ঠিত আছেন। যথা কাঠকে,

> "দ্বা সুপর্ণা সযুজা সখায়া সমানং বৃক্ষং পরিষস্বজাতে।
> তয়োরন্যঃ পিপ্পলং স্বাদ্বত্ত্যনশ্নন্নন্যোঽভিচাকশীতি॥"

দুই পক্ষী অর্থাৎ পরমাত্মা ও জীব একই শরীররূপ বৃক্ষে একত্রে ও পরস্পর সখ্যভাবে কালযাপন করেন। পরমাত্মা সর্ব্বজ্ঞ ও অসীম হইয়াও অল্পজ্ঞ ও সসীম জীবকে অস্তিত্বে কর্ত্তৃত্বে ও ভোক্তৃত্বে প্রকাশ করিবার নিমিত্তে অল্পের ন্যায় হইয়া তাঁহার হৃদয়ে বাস করেন। তিনি জীবের অস্তিত্বে কর্ত্তৃত্বে ও ভোক্তৃত্বে এতাদৃশ নিগূঢ় ভাবে যুক্ত হইয়া আছেন যে, তাঁহা হইতে জীবকে স্বতন্ত্র করিলে জীবের কোন আদর থাকে না। বাহ্য জ্যোতিঃ না থাকিলে নেত্র, রস অভাবে রসনা, প্রাণাভাবে ইন্দ্রিয় যেমন অব্যবহার্য্য হইত সেইরূপ পরমাত্মার যুক্ততা ও সখ্যতা বিহীন হইলে জীব অকর্ম্মণ্য হইয়া পড়িতেন, অতএব ব্রহ্ম-সাহায্য ব্যতীত জীব স্বয়ং কিছুই করিতে পারেন না। কেবল পরমাত্মার অধিষ্ঠান ও নিয়োগ বশতঃ তাঁহাতে কর্ত্তৃত্ব ভোক্তৃত্বের উদয় হয়। সেই কর্ত্তৃত্বের নিমিত্তে পরমাত্মা দায়ী নহেন, ঠিক তদ্রূপ যেমন নয়নের দর্শনরূপ কার্য্যের ভাল মন্দের নিমিত্ত জ্যোতি দায়ী নহে। দেহরূপ বৃক্ষের ও সংসাররূপ কর্ম্মভূমির ফল-শস্য উৎকৃষ্টাপকৃষ্ট-ভেদে জীবেরই সুকৃতি-দুষ্কৃতি-নিষ্পন্ন। সেই আত্মকৃত শুভাশুভ জীবই ভোগ করেন। ব্রহ্ম সেই ভোক্তৃত্বের প্রকাশক এবং সেই ফলের বিধাতা মাত্র। 'অনশ্নন্নন্যোঽভিচাকশীতি' তিনি নিরশন থাকিয়া সাক্ষীরূপে অধিষ্ঠিত থাকেন মাত্র। গীতাস্মৃতিতে (৫।১৩) উক্ত হইয়াছে,

> "ন কর্ত্তৃত্বং ন কর্ম্মাণি লোকস্য সৃজতি প্রভুঃ।
> ন কর্ম্মফলসংযোগং স্বভাবস্তু প্রবর্ত্ততে॥

নাদত্তে কস্যচিৎ পাপং নচৈব সুকৃতং বিভুঃ।
অজ্ঞানেনাবৃতং জ্ঞানং তেন মুহ্যন্তি জন্তবঃ॥"

প্রভু ভগবান মানবগণের কর্ত্তৃত্ব বা কর্ম্ম সৃজন করেন না, তাঁহাদের স্বাভাবিক কর্ম্ম-বীজ-স্বরূপিণী বাসনাই কর্ম্মের প্রসূতি। ঈশ্বর তাদৃশ বাসনা অনুসারেই তাদৃশ কর্ত্তৃত্বকে প্রকাশ ও কৃত কর্ম্মের ফল বিধান করিয়া থাকেন। নতুবা স্বার্থপর প্রভুর ন্যায় তিনি আপনার ইষ্টসাধন জন্য লোককে কর্ম্মে নিয়োগ করেন না। সুতরাং লোকদিগের কর্ম্ম সৃজন বা ফল বিধানের দোষগুণ তাঁহাতে অর্শে না। তিনি কাহারো পাপ বা সুকৃতির ভাগী নহেন, কেননা তিনি স্বার্থ-কামনা দ্বারা কাহাকেও কর্ম্ম করান না এবং স্বয়ং পূর্ণ-কাম। তথাপি যদি কেহ এমন আশঙ্কা করেন যে, তিনি স্বীয় ভক্ত সকলকে অনুগ্রহ এবং অপর জীবদিগকে কর্ম্ম-বন্ধন রূপ নিগ্রহ বিধান করায় কিরূপে তাঁহাকে স্বার্থশূন্য ও পূর্ণকাম বলা যায়? তাহার উত্তর দিতেছেন যে 'নিগ্রহোঽপি দণ্ডরূপোঽনুগ্রহঃ' (স্বামী ৫।১৪) পরমেশ্বর পূর্ব্বোক্ত নিয়মানুসারে যে নিগ্রহের প্রকাশক হন তাহাও তাঁহার দণ্ডরূপ অনুগ্রহ অর্থাৎ দণ্ড হওয়াতেই পাপীর পাপ-ক্ষয় হয়। এইরূপ ঈশ্বরীয় পূর্ণ মঙ্গল ভাবের মর্ম্ম না জানারূপ যে অজ্ঞান এবং জীবের অবিদ্যা-জনিত অপার বাসনাই পরমেশ্বর-বিষয়ক বিশুদ্ধ জ্ঞানকে আবৃত করিয়া রাখিয়াছে। তজ্জন্য মানবগণ মোহযুক্ত হইয়া কখন ঈশ্বরে বৈষম্য দৃষ্টি করে কখন বা আপনাদের শুভাশুভ কর্ম্মের নিমিত্তে তাঁহাকে দায়ী করিতে যায়। এই দেহ ত্যাগ করিয়া জীব যে লোকেই গমন করুন, আর যেরূপ দেহ ধারণই করুন, ঈশ্বর সদাকালই তাঁহার হৃদয়-বাসী থাকিবেন। সকল লোকেই তাঁহার কর্ত্তৃত্ব ভোক্তৃত্ব ও করণ সমূহের প্রকাশক রহিবেন। যাঁহারা জীবকে স্বরূপতঃ ব্রহ্ম বলেন তাঁহারা এইরূপ বুঝিয়াছেন যে, জীব আপনি যে ব্রহ্ম তাহা যতদিন

জানিতে না পারেন ততদিন কর্ম্মসাধন ও কর্ম্মফল ভোগ করেন। তিনি স্বয়ং কর্ম্ম ভোগ করেন না, কিন্তু তাঁহার মন বুদ্ধি, ইন্দ্রিয় প্রভৃতি প্রকৃতির সংসর্গাধীন অর্থাৎ অনাদি কর্ম্মসূত্রে বদ্ধ হইয়া কর্ম্ম করে। তিনি অবিদ্যাবচ্ছিন্ন হইয়া সেই মনাদিকে আত্মা জ্ঞান করিয়া আমি সুখী, আমি দুঃখী, আমি কর্ত্তা, আমি ভোক্তা, ইত্যাকার মিথ্যা জ্ঞানে বিমোহিত হইয়া জন্মজন্মান্তরব্যাপী কর্ম্ম-ফল-ভোগে রত থাকেন। ফলতঃ সাংখ্যমতেও জীবাত্মা স্বরূপতঃ সে সকল কর্ত্তৃত্ব ভোক্তৃত্বে লিপ্ত নহেন, কেননা প্রকৃতি পুরুষের পরস্পর ভেদজ্ঞান জন্মিলে পুরুষ অর্থাৎ আত্মা স্বকীয় মূলীভূত শুদ্ধ ও মুক্তভাব লাভ করেন। যাঁহারা জীবকে ব্রহ্মই বলেন তাঁহাদের মতে আত্ম-দৃষ্টি দ্বারা কামকর্ম্মবীজস্বরূপিণী মায়ার অর্থাৎ উক্ত প্রকৃতির সংশ্রব ত্যাগ হইলে ঐ আত্মা স্বীয় মুক্ত স্বভাবে অবস্থিতি করেন অর্থাৎ যে ব্রহ্ম সেই ব্রহ্মই থাকেন। গূঢ় তত্ত্বের মধ্যে প্রবেশ না করিয়া যাঁহারা হিন্দুশাস্ত্রের তাৎপর্য্য এইরূপে বুঝিয়াছেন তাঁহাদের সহিত বিচার করা এক্ষেত্রের উদ্দেশ্য নহে। কেবল এইমাত্র বলিলেই এখন পর্য্যাপ্ত হইবে যে, যৎপরিমাণে জীবের ব্রহ্মদর্শন হইবে তৎপরিমাণে মায়া বা প্রকৃতি-জনিত বাসনাদি রূপ বন্ধন এবং সর্ব্বপ্রকার কর্ম্মফল বিনাশকে পাইবে এবং তৎপরিমাণে জীব আপনি স্বরূপতঃ বিনষ্ট না হইয়া লক্ষ্যে শর-প্রবেশের ন্যায় ব্রহ্মানন্দে প্রবেশ করিবেক। তবে একথা অবশ্য স্বীকার করিতে প্রস্তুত আছি যে, যদি কর্ম্মজন্য দেহ, অন্তঃকরণ ও প্রকৃতি সম্মুখে না থাকিত, তবে জীবের কর্ত্তৃত্ব ভোক্তৃত্বের উদয়ই হইত না। সেরূপ দৃষ্টিতে জীবকে অকর্ত্তা বা ভোগ-রহিত বলায় আমাদের আপত্তিই নাই। স্বকৃত কর্ম্মের ফলভোগী যে জীব ইহাই শাস্ত্র ও যুক্তিসম্মত। সে জীব ব্রহ্ম নহেন এবং ব্রহ্ম সদা কাল তাঁহার সামানাধিকরণ্যে অবস্থিতি করিয়াও তাঁহার কৃত কর্ম্মের

স্বভাবাধীন তন্নিষ্ঠ থাকাতে জীবের ভোগাদি উপস্থিত হয়, কিন্তু পরমেশ্বরের পক্ষে কিছুই স্বতন্ত্র শক্তি-বিশিষ্ট নহে এবং কিছুরই নূতনত্ব, মোহজনকত্ব, মায়িকত্ব বা আকর্ষণ নাই। যে শক্তি হইতে জগৎ হইয়াছে, যাহার দ্বারা পালিত হইতেছে, যাহাতে গিয়া অন্তে লয় পাইবে এবং যাহা হইতে পুনঃপ্রকটিত হইবে তাহা তাঁহার নিজেরই শক্তি। সেই শক্তির কার্য্যে মোহিত হইয়া সুরাসুর নর ভোগে উন্মত্ত আছে, কিন্তু তাঁহার পক্ষে সেই পুরাতন শক্তির কিছুমাত্র মোহকারিতা নাই, এবং ভোগ করিবার করণ-স্বরূপ তাঁহার মন অথবা ইন্দ্রিয়াদিও নাই। সুতরাং স্বীয় ইষ্ট-সাধন সম্বন্ধে তিনি সম্পূর্ণ নিরপেক্ষ হইয়া সৃষ্টি করিয়া থাকেন। কিন্তু সর্ব্বভূত স্বীয় স্বীয় স্বতন্ত্র শক্তির অভাবে কেবল ব্রহ্মশক্তিরই সাপেক্ষ হইয়া আছে। সেই সাপেক্ষত্বই তাহাদের ভোগাদির হেতু। গীতা স্মৃতিতে (৪। ১৩—১৪) কহিয়াছেন,

"চাতুর্ব্বর্ণং ময়া সৃষ্টং গুণকর্ম্মবিভাগশঃ।
তস্য কর্ত্তারমপি মাং বিদ্ধ্যকর্ত্তারমব্যয়ং ॥
ন মাং কর্ম্মাণি লিম্পন্তি ন মে কর্ম্মফলে স্পৃহা।
ইতি মাং যো২ভিজানাতি কর্ম্মভির্ন স বধ্যতে ॥

গুণকর্ম্ম সকলের বিভাগ দ্বারা চারি প্রকার বর্ণবিশিষ্ট মনুষ্য-লোক আমারই সৃজন করা যথার্থ বটে, তাহাতে আমাকে সৃষ্টিকর্ত্তা বলিতে পার সত্য, কিন্তু প্রকৃত প্রস্তাবে আমাকে অকর্ত্তাই জানিবে, কেননা আমি অব্যয় ও আসক্তি-রহিত। বিশ্বসৃজনাদি কর্ম্ম সকল আমাকে আসক্ত করিতে পারে না, যেহেতু আমি পূর্ণকাম ও ভোগেচ্ছারহিত। এই প্রযুক্ত আমার কর্ম্মফলে স্পৃহা নাই। আমাকে এই তাৎপর্য্যে অকর্ত্তা বলিয়া যে জানে সে ব্যক্তি কর্ম্মে বদ্ধ হয় না। কেন না ঐরূপ জ্ঞান দ্বারা তাহার অহঙ্কারাদির শৈথিল্য হয়। পরমেশ্বর ব্রহ্মাণ্ড সৃষ্টি করিয়াও যেমন সেই সৃষ্টি-

ক্রিয়ার ফলভোগী কর্ত্তা নহেন সেইরূপ এই জগৎকে এবং ইহার ব্রাহ্মণ ক্ষত্রিয় প্রভৃতি সমস্ত জীবকে তিনি স্বীয় শক্তিতে পুনঃ-সংহরণ করিয়াও তৎসমুদয় সম্ভোগ করিবেন না। কারণ কোনরূপ ইষ্টসাধনতার বশবর্ত্তী হইয়া তাদৃশ সংহার করা তাঁহার স্বভাব নহে। বেদে আছে।

"যস্য ব্রহ্মচ ক্ষত্রঞ্চ উভে ভবত ওদনং।
মৃত্যুর্যস্যোপসেচনঙ্কইত্থাবেদ যত্রসঃ॥ (কাঠকে ২। ২৫)

'ব্রহ্ম' অর্থাৎ এই জগতের প্রথমজাত সমষ্টি-পুরুষ-ব্রহ্মা ও তাঁহার মানস-ধাতু-বিরচিত ব্রাহ্মণ বর্ণ, অতঃপর 'ক্ষত্র' অর্থাৎ ব্রহ্মার স্থূলদেহ রূপ এই জগতের উপাদান কারণ স্বরূপিণী প্রকৃতি-শক্তি ও তাঁহার ধাতু দ্বারা পালিত অর্থাৎ ক্ষত্রধাতু-প্রধান ক্ষত্রিয়-বর্ণ, ইহাঁরা সকলেই সেই পরমেশ্বরের ভক্ষ্যদ্রব্য এবং মৃত্যু অর্থাৎ কাল তাঁহার উপসেচন অর্থাৎ উপকরণ-সামগ্রী। পূর্ব্বকালে আশঙ্কা হইয়াছিল যে 'তয়োরন্যঃ পিপ্পলং স্বাদ্বত্তি' কঠবল্লীর এই বচনে যখন পরমেশ্বরের ভোগরাহিত্য এবং কেবল সাক্ষিত্ব ও প্রকাশকত্ব প্রতিপাদিত হইয়াছে তখন তিনি কি প্রকারে এই ব্রহ্মা প্রকৃতি ও কাল-প্রতিপালিত ব্রাহ্মণক্ষত্রিয়পরিপূর্ণ সংসারকে এবং সেই সংসারের সংযমনকর্ত্তা স্বরূপ কালকে ভক্ষণ করিবেন? সুতরাং এই পূর্ব্বপক্ষ হয় যে উক্ত প্রকার ভোজনক্রিয়া ব্রহ্মকে নির্দ্দেশ করে না। হয় উহা সংসারক্ষেত্রের ফলশস্যভোগী জীবকে, নয় সর্ব্বদহনকারী অগ্নিকে প্রতিপন্ন করে। এই পূর্ব্বপক্ষের নিরাস করণার্থ মহর্ষি ব্যাসদেব বেদান্তদর্শনে (১।২।৯—১০) নিম্নস্থ দুইটী সূত্র গ্রথিত করিয়াছেন। যথা—

"অত্তা চরাচরগ্রহণাৎ।"
"প্রকরণাচ্চ"।

উপরি উক্ত শ্রুতিতে ভক্ষণের অর্থ সংহার। অর্থাৎ জগতের সংহার-কর্ত্তা পরমেশ্বর। চরাচর এবং মৃত্যু পর্য্যন্তকে গ্রাসকরা জীব অথবা অগ্নির ক্ষমতা নহে। বিশেষতঃ ঐ শ্রুতি ব্রহ্ম-প্রকরণে সন্নিবেশিত আছে। সুতরাং ব্রহ্ম ভিন্ন জীবাদির ভোক্তৃত্ব প্রতিপাদক নহে।

"নহি তাদৃশস্য ভোজ্যস্য ঈশ্বরাদন্যঃ অত্তা সম্ভবতি"।

সেই ভোজ্যের ভোক্তা ঈশ্বর ভিন্ন অন্য কেহ নহে।

"তস্মাদীশ্বরোঽত্র প্রতিপাদ্যঃ"।

অতএব এস্থলে ঈশ্বরই প্রতিপাদ্য।

"অনশ্নন্নন্যোঽভিচাকসীতীশ্বরস্য ভোক্তৃত্বং নিষিদ্ধমিতিচেৎ তর্হ্যকর্ত্তৃত্বং নাম সংহর্ত্তৃত্বং ভবিষ্যতি।" (অধিঃ মালা)

"অনশ্নন্" ইত্যাদি শ্রুতি বাক্যে পরমেশ্বরের ভোক্তৃত্ব নিষেধ থাকিলেও এস্থলে তাঁহার ভোজনের নাম সংহার বুঝিতে হইবে। এতাদৃশ সংহারে তাঁহার ভোগাভিলাষ নাই। যেমন জাগ্রদবস্থার ভোগক্ষয়ে নিদ্রা উপস্থিত হয় এবং নিদ্রাভোগাবসানে জাগ্রদবস্থার পুনরুদয় হয় সেইরূপ ঐশী নিয়ম অনুসারে এই ব্রহ্মাণ্ডের জাগ্রদ্দশার ভোগক্ষয় হইলে ইহা তাঁহার শক্তিতে পুনঃ প্রবেশ করিবে এবং ঐশী নিয়ম অনুসারে সেই বিরাম কালের অবসানে আবার প্রকটিত হইবেক। এইরূপ সৃষ্টি ও সংহারের নিয়ম পরমেশ্বরের স্বার্থ ও সম্ভোগার্থ নহে। সুতরাং তিনি কর্ত্তা হর্ত্তা হইয়াও "স্বকৃত সৃষ্টি ও সংহাররূপ কর্ম্মের ফলভোক্তা নহেন।"

সম্পূর্ণ।

আরব্ধ পৌষ ১৭৯৯ শক,

সমাপ্ত মাঘ ১৮০৫ শক।

শুদ্ধি পত্র।

পৃংক্তি	অশুদ্ধ	শুদ্ধ
(৫৩ ক্রম)	থালিৃদং	খলিৃদং
১২	লাভে	ভাবে
২২	গীতা, স্মৃতি	গীতাস্মৃতি
১৭	যুক্তি নিশ্চয়	যুক্তি নিশ্চয়ে
১৩	এরূপ	ঐরূপ
৮	উপাস্থিতৌ	উপাশ্রিতৌ
১৪	তাহারই	তাঁহারই
১৫	স্তম্ভ	স্তম্ব
১১	বেদব্যাকের	বেদবাক্যের
২৩	স্বপীত	স্বমপীতো
২০	১	১০
১৭	জীব চৈতন্যোই	জীব চৈতন্যই